অ জা ত শ ত্রু

অপরিচিত অন্ধকারে

প্রথম পর্ব

নবপত্র প্রকাশন । ৫৯ পটুয়াটোলা লেন । কলি-৯

প্রথম প্রকাশ ১লা আশ্বিন, ১৩৫৯

প্রকাশক । প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৫৯ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

মুদ্রক । নিউ এজ প্রিন্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ
সুবোধ দাশগুপ্ত

সাত টাকা

For the lips of a strange woman drop as a honeycomb, and her mouth is smoother than oil · But her end is bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword. Her feet go down to death , her steps take hold on hell.

OLD TESTAMENT : V.

APARICHITA ANDHAKARE
BY AJATASATRU
PART ONE

দূর যেন দূরদেশী কোন রাখাল ছেলে। বাঁশিতে পথিককে টানে। অজানা সেই বাঁশি। মনের যাযাবর আর কি ঘরে থাকতে পারে!

রুপোলি জলের অনবাহিকায় সোনালি ইতিহাসের অবশেষে সাদা-কালো বাদামি মানুষের অপরিচয়ে তনুলিপ্ত তরুলতাদেশ তাম্রলিপ্ত আকাশের বেলায় আমি নিজেকে তাই ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। ঘরে থাকতে পারিনি।

কিন্তু পথ চলতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হয়েছে। সভ্যতার মুখের ওপর ক্ষত দেখে। মানুষের আত্মা নিয়ে যে বেসাতি চলছে তার দিকে তাকিয়ে মুখ নামিয়ে নিতে হয়।

অথচ যেদিন বন্দরের ডাক এল সেদিন কি এসব ভাবনা ছিল! গুন গুন করে উঠলাম: আমি চঞ্চল হে সুদূরের পিয়াসী! ছোট বেলায় যা পড়েছি ভূগোলে, বড়ো হয়ে ভ্রমণবৃত্তান্তে, চোখের আলোয় চোখের বাইরে তাই দেখব। সেই আনন্দে জীবনকে ঠেলে দিলাম দূরদেশে। সুদূর বিদেশে। অনুল্লেখ্য জীবিকার বলয়ে।

সেখানে দেখেছি সভ্যতার নিওন আলোর তলায় অসহায় মানবীর অপমানের বেদনা। সে আফ্রিকার বার্বারি উপকূলেই হোক—সভ্যতার পীঠ প্যারিসেই হোক—সাদা কালো সব রঙের মুখে একই ছবি। বেদনায় তো কোন পার্থক্য নেই!

সেই মেয়েটির কথা বারবার মনে পড়ছে ভারতবর্ষের মাটি থেকে যাকে লুঠ করে মুবদের যৌথ-নরকে বিক্রি করা হয়েছে। যার চোখে এখনো ভারতবর্ষের প্রতীক্ষা। রোগে বেদনায় ক্রমশ মৃত্যুর নিঃশ্বাস যার মুখের কাছে নেকড়ের মতো হানা দিচ্ছে। কি আশ্বাস তাকে দিতে পেরেছিলাম!

ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন! চরণতলে শূন্যমরু দিগন্তে বিলীন। কৈশোরে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পড়া আরবদেশের সেই মোহিনী মায়া অনেকখানি বিনষ্ট হয়ে গেছিল।

ক্যাসাব্লাঙ্কায় যে ন্নবিয়ান মেয়েটি আমার হাত ধরেছিল কি ছিল তার চোখে! বেদনা—হতাশা—নিঃসঙ্গ মৃত্যুর ছবি? তার কথাও কি ভুলতে পেরেছি! ঘরে অসুস্থ মা। পথ্য চাই! কোন মানুষের প্রতি তার বিশ্বাস নেই। অনুগ্রহ সে চায় না। রুগ্ন দেহ নিঙড়ে নিয়ে কেউ যদি কিছু দেয়। সেইটুকু তার প্রত্যাশা।

আমার যাযাবরী ইতিহাসে এমনি কতো মুখ, আলো-অন্ধকারে মিনে করা কতো চোখ দেখেছি। সবার কথা বলা হল না। মনে গভীরে রইল কেউ। যা রইল হারালো না।

যা বলছিলাম। ভেসে তো পড়লাম। সিংহল নয়। সিঙ্গাপুর নয়। সোজা প্যারিস। কলাবিলাসিনী প্যারিস! আঁতেলেক্‌চুয়ালদের প্যারিস!

চাকরিই বা এমন কি! দিশি কাগজের প্রতিনিধি। এখন বিশেষ সুবিধে না হলেও আখেরে কিছু নাকি হবার সম্ভাবনা আছে। মালিক থেকে মালিকের মোসাহেব পর্যন্ত এই আশ্বাস দিয়েছিলেন। আমি অবশ্য এসব কিছু ভাবিনি কেননা চাকরি যখন করতে হবে দেশ আর বিদেশ

মূল ঘাঁটি হল প্যারিস। আশেপাশে বন বার্লিন প্রাগ সবগুলোই সারতে হবে। ফরেন সার্ভিসের মোগলাই পোষ্ট না হলেও বন্ধুরা ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। আর কিছু না হোক প্যারিসে তো থাকবো। দেশ বিদেশের স্বপ্নের প্যারিস!

নতুন অফিস। কাজ আর কাজ। কাগজের অফিসের আবার ঝামেলা অনেক। অনেকদিন পর্যন্ত তাই প্যারিস চোখের সামনে থেকেও নেপথ্যে রয়ে গেল।

তারপর আলাপ পরিচয়ের খাত বেয়ে নিজেকে ছড়িয়ে দিলাম। একটু গুছিয়ে বসতে দম ফেলবার অবসর হল। কাফে রেস্তোরাঁয় চা-কফির সময় হাতে এল। সন্ধ্যের পার্টির। প্যারিস-এর স্বাদ পেলাম।

যখন এসেছিলাম তখন শীতের ঘোমটাটানা মুখ। তারপর আর একটা শীত পার হয়ে বসন্ত এসে হাজির। সেই সময়ের কথা বলছি যখন সময়টা বসন্ত এবং নির্জনতা কুমারী মেয়ের মতো সুন্দর ; চেরির রক্তাক্ত চীনাংশুকে প্যারিস ঢাকা, আলোয় বাতাসে মাখামাখি সময়ের মুখ !

প্যারিসকে যারা ভালোবাসে এ সময়টা তাদের আনাগোনা বেড়ে যায়। রাজা-উজীর-নবাবজাদা হলে কথা নেই—দেশবিদেশের বেনে নন্দনরাও কম যায় না। পথেও তাই লোকের অবিচ্ছেদ প্রবাহ—বুলভার উপর নানা রঙের দিনের মতো নানারঙের মানুষের মিছিল।

কাঁচের জানালার ভেতর থেকে দেখছিলাম। দলবেঁধে পথে নেমেছে মানুষ। মহিলারা কোটের খোলস ছেড়ে হালকা কাপড়ের নতুন ফ্যাশান গায়ে চড়িয়েছেন। বসন্তের আনন্দে তাদের মুখের পরিলিখন তন্দ্রাতুর।

ম'াদেলিন-এর কোণ থেকে রুদ্য রিচল্যু পর্যন্ত সমস্ত ফুটপাথ জুড়ে মানুষের ভীড়। আশ্চর্য সময়। আশ্চর্য প্রহর। বসন্তের এই প্যারিসকে কেউ ভালো না বেসে পারে !

অনেকক্ষণ থেকেই কাফেতে বসে আছি। সিন্ধুপারের সুন্দরীদের প্রতীক্ষায় নয়। হলে অবশ্য বসন্তসন্ধ্যার রোমান্স জমতো। কপাল আমার, বান্ধবী নয় বন্ধুর প্রতীক্ষায় বসে আছি। ভদ্রলোক ফরাসি রিপাবলিকের একজন জাঁদরেল ব্যক্তি। অপরিচিত অন্ধকারে তার কাজকারবার। রাত্রির যে ব্যবসায় রূপসী প্যারিসের খ্যাতি, সেই

ব্যবসার যাঁরা পণ্য তাদের সম্পর্কে সরকারি আইনের প্রয়োগবিধি পর্যবেক্ষণ তাঁর কাজ। এখনো এসে পৌছোন নি। হয়তো এখনি এসে পড়বেন। পরিচিত মুখে হাসি টেনে সামনে এসে দাঁড়াবেন। একটু নত হয়ে বলবেন, শুভ সন্ধ্যা মনামি। তারপর নীলচে ধূসর্ধ টুপিটা টেবিলে রেখে শব্দ করবেন, আঃ—

সুগন্ধি কফির পাত্রে চুমুক দিয়ে ফরাসি সংবাদপত্রের সান্ধ্যসংস্করণে চোখ বোলাতে থাকি। যুরোপের বিশেষ একটি রাজপরিবারের কেচ্ছা ফলাও করে ছেপেছে। সত্যিমিথ্যে বোনা ঘটনার মায়াজাল। আমাদের বিকেলের চায়ের সংগে চানাচুরেব মতো ফরাসিদের পক্ষে বিশেষ রুচিকর।

এরি সংগে চমৎকার একটি প্রবন্ধ আছে লালমদের ওপর লেখা। মব, মদালসা এবং মদির রাত্রি এই তিন সমীকরণেব ফলাফল।

কাগজের ওপব থেকে যখন চোখ তুললাম নিওনেব বিজ্ঞাপন রূপকথা হয়ে উড়েছে। একটু পবেই বুলভাব ওপব চাঁদের আলো এসে পড়ল। গাছেব নতুন পাতা চিকচিক কবছে। ফোয়ারার উর্ধমুখে উচ্ছৃত জল রঙীন হয়ে ঝবছে।

সন্ধ্যেবেলায় মানুষের চলাচলে যে জোয়াব নেমেছিল তা' ক্রমশ ক্ষীয়মান হয়ে আসাব কোন চিহ্ন নেই। মঁাদেলিন ও বাস্তিল-এর যাত্রী বোঝাই বাস যাওয়া-আসা করছে। অন্ধকার থেকে সেই মেয়েগুলো বেরিয়ে এসেছে। ব্ল্যাক প্যান্থারের চোখেব আলোর নীল আঁচড় ধকধক কবছে তাদের চোখে। পেভমেণ্ট-রোমিওদের অনেকেই সাড়া দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের ঠোঁটে হালফিল ফরাসি গানের গুঞ্জন—কখনো এঁবাহুরদের বিলম্বিত লয়ের বিরহ সঙ্গীত। মধুর সময়! মধুব বাতাস! বসুন্ধবা ও মধুক্ষরা!

রাত্রির প্যারিস জাগছে। দিনের মৃত্যু থেকে রাত্রির জীবনে তার উত্তবণ। রাত্রির প্যারিস যৌবনবতী নারীর রহস্য—দিনের চেয়ে গ্লামারাস। রাতকে ভালোবাসা ফরাসি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

বসে থেকে অধৈর্য হয়ে পড়েছি। খবরেব কাগজের ওপর আর চোখ বোলান যায়! এমন কপাল চেনা পরিচিতদের কেউ একপাত্র পানীয় কি অমৃত তৃষায় এই মরুদ্যানে এসে থামছে না। বন্ধুটি কখন আসবেন কে জানে! ঘড়ির কাঁটা দৌড়ে চলেছে।

আজকে বোধহয় কোন কাজে আটকে পড়েছেন। হয়তো এসে উঠতে পারবেন না। আশাভঙ্গের খেদ নিয়ে উঠবো এমন সময় কাফের দরজায় সেই পরিচিত মুখের স্মিতহাসি দেখে খুশি হলাম। আমাকে দেখে হাসলেন তিনি।

প্যাসেজের দু'পাশের টেবিলে অনেকেই ওর পরিচিত। করমর্দন ও কুশল প্রশ্নাদি সেরে আসতে একটু দেরি হল। পরিচিতদের অনেকেই মহিলা। আর স্যাম্পেনেব মতো মেয়েবাও তাব প্রিয়।

চেয়ার টেনে বসলেন তিনি। আমার সামনে। মুখোমুখি। মঁসিয়ে লঁা। সংগত কারণেই নামটি বলছি না।

অত্যন্ত দুঃখিত। মঁসিয়ে লঁা প্যাকেট থেকে সিগারেট তুলে নিলেন, আপনি জানেন মনামি আমাদেব যা কাজ তার কোন বাঁধাধরা সময় নেই। অসময় আছে। সব সময় ছুটি। সব সময় কাজ। তেমনি একটা কাজের বেড়াজালে জড়িয়ে দেরি হয়ে গেল। সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলেন মঁসিয়ে লঁা, অবশ্য বুঝতে পারছিলাম ফরাসি জাতির সময়জ্ঞান এবং সৌজন্যতা বিপন্ন হয়ে পড়ছিল। মৃদু হাসছিলেন মঁসিয়ে লঁা।

আমি মঁসিয়ে লঁার কথায় কোন উত্তব না-দিয়ে বললাম, কফি আর ব্রিয়স্-এর অর্ডার দি?

মাথা নাড়লেন তিনি! ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। রুমাল দিয়ে মুখটা একটু মুছে নিলেন। সৈলভা পুষ্পসারের মৃদুগন্ধ। মানুষটি সৌখিন। পোষাক পরিচ্ছদ থেকে টাইগাবমথ প্রজাপতিব শুঁড়ের মতো গোঁফের রেখায় নিখুঁত পারিপাট্যের পরিচয়।

মঁসিয়ে লঁা হাসলেন, শুধু প্যারিসে ওদের সংখ্যা আট-দশ হাজার।

আমি অবশ্য যারা নাম রেজেষ্ট্রী করেছে তাদের কথাই বলছি। একুশ বছরের কম বিদেশিনীদের নাম রেজেষ্ট্রি হয় না। তিন শ' ম্যানসনে খোলাখুলি ব্যবসা চলে, গোটা আশি বাড়িতে চলে রেখে-ঢেকে। এ ছাড়া প্রায় হাজার যাটেক মহিলা রাস্তা থেকে লোক ধরে ব্যবসা চালায়। এদের মধ্যে কেউ ছলনায় গৃহস্থ বধূ, কেউ রেস্পেকটেবল গার্ল, কেউ অভিজাত পরিবারের বিত্তশালিনী, এঁদের ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা চালু রাখতে হলে কি রকম খাটতে হয় বুঝুন। মঁসিয়ে লাঁ কফি পাত্র টেনে নিলেন!

আমি চামচে দিয়ে ব্রিয়স্-এর টুকবো গলায় ফেলে বললাম, প্যারিস পৃথিবীকে আলো দিয়েছে আর নিজে এখন অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে।

নম্র হেসে মঁসিয়ে লাঁ জিজ্ঞেস কবলেন, কেমন?

অনেকদিন প্যাবিসে আছি স্বীকাব কববেন, একটা জিনিস দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছি মঁসিয়ে, এখানে অনেকেই মেয়েদের অবৈধ রোজগারে বেঁচে থাকাকে অসম্মান মনে কবে না। অনেক দেশবিদেশ ঘুরেছি এমনটা কোথাও দেখিনি।

শুধু আলোব খবর রাখেন—অন্ধকারপরিচয় থাকলে দেখতেন আধুনিক যে কোন সহবে এ ধরণের ঘটনাব অনটন নেই। সরকাবের আইন যেখানে যতো কড়া সেখানে এ ধরণের ব্যাপারগুলো তত চাপা। সভ্যতাই বোধহয় মানুষের এই সামাজিক দৃষ্টিকে সহজ করে এনেছে।

তবু যদি কিছু মনে না করেন। একটু সমীহ করে বলি, আপনাদের রাষ্ট্রের এ ধরণের ব্যাপারের পেছনে সমর্থন আছে বলেই মনে হয়। সোজা করেই বলি আপনাদের সমাজ এ ব্যাপারে সহানুভূতি রাখে।

মঁসিয়ে লাঁ নতুন সিগারেট ধরালেন—কি রকম?

এ ধরণের মেয়েরা শিকারের জন্য নির্বিবাদে পথে ঘাটে ঘোরাফেরা করে। অনেক সময় কাফে রেঁস্তোরা থেকেও শিকার টেনে নিয়ে যায়। পুলিশের-চোখের সামনেই ব্যাপারগুলো ঘটে অথচ পুলিশকে

নির্বিকার থাকতে দেখেছি, অবশ্য এ ব্যাপারে বোধহয় একটা অলিখিত নিয়মও আছে।

এতে আপনি খুব আশ্চর্য হয়ে গেছেন! ম'সিয়ে ল'। এ্যাসট্রের মধ্যে ছাই ঝাড়লেন তারপর কাঁধটা একটু ঝাঁকিয়ে সোজা হয়ে বললেন, একটি বিলোল কটাক্ষের রুচিত চকিত আহ্বান যেখানে উভয়পক্ষের বোঝাপড়ার সেতু। সেখানে পুলিশের কিছুই করবার থাকে না।

আইবিস পাখির ঠোঁটের সামনে মাছেরা যদি ভেসে উঠতে থাকে তবে তৃতীয় পক্ষের বাধা দেবার সার্থকতা কোথায়? উভয় পক্ষই যেখানে ফরাসি রিপাবলিকের নাগরিক এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা স্বীকৃত সেখানে অভিযোগ না থাকলে পুলিশের পক্ষে কিছুই করার থাকে না। দুঃখের বিষয় অভিযোগ কদাচিৎ আসে।

তবু মনে হয় এই সামাজিক দুর্নীতি দূর করবার কোন দৃঢ় চেষ্টা নেই।

হয়তো তাই মনামি। তবে এটা জানবেন রোগের মূলটা মনের গভীরে—মনের বিচিত্র ইচ্ছার কোন সমাকরণ হয় না। আর অবয়বে এ রোগ থাকলে পারদের মতো ফুটে বেরুবেই।

আমি এ কথার উত্তর দেবার আগেই আমাদের পরিচিত একজন মহিলা সামনে এসে দাঁড়ালেন।

বসুন। তাঁর সম্মানার্থে উঠে দাঁড়াই। অনেকদিন বাদে দেশে ফিরেছেন। তাকে বান্ধবী বলে ভাববার মধ্যে একটা গর্ব আছে।

প্রথম বসন্তের প্রথম ফুলের মতো। ম'শিয়ে ল'। মন্তব্য করলেন।

কি? ভদ্রমহিলা বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলেন।

আপনার আবির্ভাব। আমি যোগ করে দিলাম, অনেকটা, সবটুকু বলে শেষ করবার আগেই দেখি ভদ্রমহিলা লজ্জারুণা হয়ে উঠেছেন। আবার পানীয়ের অর্ডার গেল। আলোচনা জমে উঠল আলফাঁস দোঁদের একটা বইকে উপলক্ষ্য করে। তারপর সেই আলোচনার রূপবিস্তার বিষয় ও বিষয়ান্তরের প্রান্তর পেরিয়ে হলিউডে গিয়ে ঠেকল।

কাফে প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে। রাত্রির অন্য অর্ধের অতিথিরা এসে পৌঁছয়নি। তারা আসবে শেষ যামে। ভদ্রমহিলা দেরি করলেন না। ওকে বিদায় দিয়ে চারদিকে তাকালাম। আলোর অনেক কুঁড়ি নিভে গেছে। তখনো পথ প্রবাহে মানুষের অশেষ ধারা।

একটা ট্যাকসি ডাকা গেল। ট্যাকসিতে উঠে ম'সিয়ে লাঁ বললেন, প্লেস পিগ্‌লে—

ম'সিয়ে লাঁ-র সংগে আমার কথা ছিল রাত্রিব রূপসী প্যাবিস দেখাবেন। সেই পর্বেরই যাত্রা সুরু।

প্লেস পিগলের বাড়িটাকে দেখলে মনে হয় আলোর অপ্সরী। হাওয়ায় তার ঘাঘরা উড়ছে।

অর্কেষ্ট্রার ঐক্যতানে সমস্ত আবহাওয়া যেন জমাট বেঁধে গেছে।

ভেতরের হলঘরে ঢুকে একটা টেবিলে চেয়াব টেনে দুজনে বসলাম। আমার দিকে চেয়ে ম'সিয়ে লাঁ বললেন, আমরা প্যাবিসেব সেরা ক্যাবারেতে উপস্থিত হয়েছি। ককেট আব সাঁতেনিয়রদের নিবাপদ নীড়।

যাদেব ঘবসংসার আছে অথচ প্রাত্যহিক জীবনেব বৈচিত্র্যহীন শৃংখলার থেকে বেরিয়ে অবৈধ প্রণয়ে মন সঁপে দিতে চায়, তাদের পক্ষে গার্ডেন অব ইডেন। একটুখানি রোমান্টিক ব্যাকগ্রাউণ্ড এখানকার ব্যবসা ভালো জমিয়ে দিয়েছে। এটা আগে একজন শিল্পীর ষ্টুডিও ছিল। ঐতিহাসিক এবং বাস্তব বিষয় ছিল তাঁর ছবির উপাদান। এখনো অনেকের বাড়িতে তাঁর ছবি দেখা যায়।

এই বাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে যে মেয়েটির সঙ্গে প্রথম দেখা শিল্পীর চোখে সে ছিল ক্রিসেণ্ট মুন। একজন ফরাসি মেজরের বিবাহিতা স্ত্রী। চোখের দেখা প্রেমের রঙে ঘন হয়ে উঠল। দুজনে দূর থেকে এই বিবহের বেলা আকাশকুসুম রচনা করে কাটিয়ে দেয়। আর ফাঁক পেলেই মেজরকে ফাঁকি দিয়ে প্রেমের লুকোচুরি খেলে। মেজর ছিলেন নিরীহ ভালো মানুষ। সামাজিক জীবনে অত্যন্ত শান্তশিষ্ট। প্রৌঢ়

বয়সে বিয়ে করে সংসার পেতেছিলেন। সামরিক জীবন তাঁর রসটুকু শুষে নিলেও বোধহয় দেহের জন্যে বিয়ের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। এদিকে তাঁর স্ত্রীর অবস্থা শৈবলিনীর মতো—যুবতী, সুন্দরী এবং চঞ্চলা।

শিল্পী এবং মেজরের স্ত্রীর প্রেম এত জমে উঠল কিংবা দুজনে এত বাড়াবাড়ি সুরু করলো যে শেষকালে সামান্য সাবধানতাটুকু নিত না। আর্টিষ্ট প্রায় রাত্রেই মেয়েটির ঘরে উপস্থিত হত। কখনো মেয়েটি আর্টিষ্টের ঘরে। এ সব স্বামীর অনুপস্থিতিতে। দু'একবার ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে যায়। শেষে সাহস আরো বেড়ে গেল।

এপ্রিল মাসের এক বসন্তের রাত্রিতে মেজরের অনুপস্থিতিতে শিল্পী তাঁর ফিঁয়াসের ঘরে বাসর সাজালো। বাসর বলছি এই জন্যে যে সেই শেষ।

মেজর সামরিক প্রয়োজনে প্যারিস ছেড়ে বাইরে কোথায় গেছিলেন। তিন-চার দিনের মধ্যে ফিরবেন না। এই রকমই তাদের জানা ছিল।

বিহ্বল বসন্তের ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা আকণ্ঠ পান করে এত প্রমত্ত হয়ে পড়েছিল যে দরজাটা পর্যন্ত টেনে দেবার খেয়াল ছিল না কারো।

যখন খেয়াল হল দেখে মেজর তলোয়ার হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। ভয়ে আতঙ্কে শিল্পী তিনতলা থেকে লাফ দিয়ে পড়ল। তারপর আর না বললেও চলে—' মঁসিয়ে লাঁ একদমে গল্পটা শেষ করে থামলেন। কয়েক মিনিট চুপচাপ চোখ বুঁজে বসে সিগারেট টেনে চললেন। বোধহয় পুরোন কাহিনীর রোমান্সের উত্তাপটুকু মনে মনে উপভোগ করছিলেন। ওয়েটার পানীয় দিয়ে গেল। তৃষ্ণার চোখে সেদিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

তারপর এক হোটেলওয়ালা বাড়িটাকে হাতিয়ে নিল, মঁসিয়ে লাঁ নতুন উদ্যমে তাঁর কাহিনী সুরু করলেন, লোকটা ছিল ঘুঘু এবং ঘাগি। এসব ব্যবসায় পাকানো-হাত। বাড়িটাকে একটুও পালটালো না বরং

শিল্পীর আর তার ফিঁয়াসেকে নিয়ে যে রূপকথা গড়ে উঠেছিল তাকে মূলধন করে তোফা ব্যবসা চালালো। অনেকেই রূপকথার আর অবৈধ প্রণয়ের স্বাদ নেবার জন্যে এখানে রাত্রির অন্ধকারে ভীড় জমায়। বাড়িটাকে বাইরে থেকে না পালটালেও ভেতরে সম্পূর্ণ পালটে একটা গোলকধাঁধা সৃষ্টি করা হয়েছে। এই হলঘরের বাইরে অচিরকালের প্রমোদ নীড় সাজানো। সেখানে যে কেউ, পয়সার বিনিময়ে বাসর সাজাতে পারে। কপোতী আপনি নিজে নিয়ে আসতে পারেন কিংবা এখান থেকে পেতেও পারেন।

মঁসিয়ে লাঁর গল্প এতক্ষণে শেষ হ'ল। চারদিকে চোখ ফেলার অবকাশ পেলাম। লাল কোটওয়ালা হাঙ্গেরিয়ান বাঁশিওয়ালারা তাদের চকচকে চুল আর রেশমের মত মসৃণ গোঁফ নাড়িয়ে অদ্ভুত একটা জিপসি সুর ধরেছে। নাচের সুরশ আমার মত আনাড়ির পা দু'টোও ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল হয়ে উঠছে।

একটা মেয়েকে অনেকক্ষণ ধরে দেখছিলাম। মসিয়ে লাঁর গল্পের ফাঁকে চোখ অকারণ তার মুখের ওপর গিয়ে পড়ছিল। মুখটা অত্যন্ত সুশ্রী; নেবু পাতার মতো কচি। আর চকচকে। চমৎকার গ্রাসিয়ান নাক। মাথার ওপর ভেঙেপড়া চুলের বিশৃংখল আর দেহের সাবলীল বিন্যাস আকর্ষণ করার মতো বটে!

মেয়েটি তার বন্ধুকে নিয়ে কাছাকাছি এগিয়ে এল, নাম শুনলাম, পিপি। সঙ্গী যুবক একজন নৃত্যশিল্পী। পাশের টেবিলে পাশাপাশি বসল। আজ রাত্রের জাজসঙ্গীত সম্রাটের দরবারে সে একজন বিশিষ্ট আগন্তুক। প্যারিস-ইন-নাইটে নাম-ডাক আছে।

মাথার চুলগুলো আঠারো শতকের মেয়েদের কেশপরিচর্যার অনুরূপ ফ্যাশনের বিস্তার রেখেছে। গায়ের সিল্কের পোষাকটা গোলাপি, নীল আর সোনালি লতাপাতার ফুলকাটা। রাজপুত্রসুলভ এই পোষাকের মহার্ঘতা বজায় রাখতে পিপিকে প্রত্যেকদিন কতোজনের মনোরঞ্জন করতে হয় সে কথা ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়।

কথাটা একটু খুলে বলা দরকার। পিপিরা যে ধরনের সিক-তাদের পেশা পয়সার বিমিময়ে যে কোন লোকের শয্যাসঙ্গিনী হওয়া —অথচ মনটা তাদের অদেয় থেকে যায়। মনের মানুষ তো একজন চাই। আর সেই মনের মানুষের সব খরচা বহন করতে হয়। আর সোজা বাংলায় বলতে গেলে এরা হচ্ছে নিষ্ঠাব বক্ষিত। হয়তো তার থেকেও কিছু বেশি।

আর এই ধরণের মানুষরা যেমন বাবু তেমনি সৌখিন। এদের খরচার কোন সীমা নাই। ভালো পোষাক সুস্বাদু পানীয় নইলে চলে না। ফলে যে মেয়েরা এদের ভরণপোষনের দায়িত্ব নেয় তার শ্রম অশেষ হয়ে ওঠে। অবশ্য কুকুরের মতো আদর আর পদাঘাত দুই এদের ভাগ্যে জোটে।

জায়গার রঙ রূপ আর রেখা পালটে যাচ্ছে। স্যাম্পেন বার্গাণ্ডির গ্লাসে রঙীন বুদ্বুদ উঠতে সুরু করেছে। কাটা-কাচের পানপাত্রে ফেনিলোচ্ছল দ্রাক্ষাসব।

মঁসিয়ে লঁ। ফিসফিস করে বললেন, ছোকরাটি আশপাশের কোন বাজার ভাগনে।

উপস্থিত সজ্জন ভদ্রমহোদয়দের পেটে যত বারুণী নিষিক্ত হতে লাগল, বাইরের আবরণ ততো মোমের মতো গলে যেতে লাগলো। নকল প্রেমের একঘেয়ে শব্দসমষ্টি টেবিল ঘিরে গুনগুনিয়ে উঠল। কখনো নগ্ন ও নির্লজ চুম্বনের শব্দ হাওয়ার নিরালোকে ফুলঝুরি ঝরালো।

নিষ্প্রভ অথচ উজ্জ্বল আলো—মৃদু হাঙ্গেরিয়ান র‍্যাপসোডি, ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে থাকা মেয়েদের রঙ-করা-মুখ সমস্ত মিলে একটা কবোষ্ণ তন্দ্রা ঘনিয়ে এলো।

আমি নিজেও খানিকটা তন্দ্রাতুর হয়ে পড়েছিলাম মোহিনী আলো অন্ধকারের মায়া পরিবেশে।

হঠাৎ মঁসিয়ে লঁর আহ্বানে সচকিত হয়ে উঠলাম। মঁসিয়ে লঁ।

শিল্পীর আর মূলধন ক'

'ন নবাগতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। দীর্ঘকায়। শিষ্ট মাঝ বয়সী একটি মানুষ। কালো চুলে খুব বেশি এখনো পাক ধরেনি। চোখ দুটো তীক্ষ্ণ এবং অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। একটু যেন শ্বাপদ-স্বাদ সেই চোখে।

পৃথিবীতে নারীদেহ ব্যবসার যে গোপনসংস্থা আছে—লা মিল্যু, মঁসিয়ে আলবেঁয়া তার প্রধান সংগঠক। পাশ্চাত্ত্য গোলার্ধের প্রধান। প্যারিস-এব সদব কার্যালয়, প্রধান কেন্দ্র ব্রিটিশশাসিত হংকং। এ্যাংলো-চৈনিক রক্তজাত চুংশি তার প্রধান। লোকটা ডিকন নামেই সাধারণে পরিচিত, লা মিল্যু সংস্থাব শাখা পৃথিবীব সর্বত্র ছড়ানো: প্রত্যেক বন্দরে এই দলের ঘাঁটি। লা মিল্যুব সদস্যেরা দাবী করে—এটা পুলিশ ও পাবলিকের লীগ। উদাব দৃষ্টিতে লীগ অব নেশান্স—জাতি সমবায়।

ওয়েটার আবার গ্লাস পূর্ণ করে দিল।

লা মিল্যুর সদস্যবা সমাজেব বাইবে এক ধবণেব জীব। সব রকমের সামাজিক দুর্নীতিতে এবা অভ্যস্ত। দিনেব বেলা আত্মগোপন কবে থাকে—ইদুরের মতো বাত্রেই এদেব বিহাব। এদেব পেছনে আছে সমাজের অনেক প্রতিপত্তিশালী। তাদেব প্রচুব টাকা এই ব্যবসায় খাটে।

সারা প্যাবিসেই জালপাতা। শিকাব এদেব হাত থেকে কদাচিৎ পালাতে পাবে। যে ধরণের ব্যবসা এরা করে—তাতে অনেক ব'ম কৌশল রপ্ত করে নিতে হয়। প্রণয়তত্ত্ব থেকে যৌন-স্বাস্থ্য-সুকুমার সবরকম চারু কলা এদেব অধিগত। কাজ তো খুব সোজা নয়।

খনি থেকে কাঁচা ধাতু যেমন ভিন্নতর প্রক্রিয়াব মাঝ দিয়ে ব্যবহার-যোগ্য করে তোলা হয়—এবাও তেমনি নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিষ্পাপ মেয়েদের ব্যবহারযোগ্য করে তোলে। কাঁচা মালকে ব্যবহার পণ্যে পরিণত করাই এদের আর্ট। আয়রণ ওর থেকে টেমপার্ড স্টীল।

কি করে পোশাকে পরিচ্ছদে অসামান্য হয়ে উঠতে হয়—ঋতু ভেদে
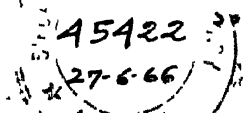
রঙের ব্যবহার—কথা বলার আর্ট--গ্রীক-রোমান কেশবিন্যাসের ক্লাসিক-কৌশল থেকে হালফিল হাতছাঁটা বগলকাটা সব রকম আর্টেই এরা রপ্ত করিয়ে দেয়।

অনেক সময় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক বিদেশ যাত্রার সময় এদের মোটা টাকায় ভাড়া নিয়ে যান। সেখানে গিয়ে ভদ্রলোকের অর্ধাঙ্গিনী হিসাবে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করতে হয়। কাজেই সামাজিক জীবনের সহজ ও নিখুঁত অভিনয় এরা করতে পারে। সমস্ত রকম শিক্ষা রপ্ত হয়ে গেলে ঠিক হয় কোনদেশে কোন পণ্য রপ্তানী হবে।

স্থূলকায়া উন্নতস্তনায়ুধা অলসগমনা যদি হয় তবে নির্দ্বিধায় পাঠিয়ে দেয় লাতিন আমেরিকায়—আর্জেন্টিনা ব্রেজিল পেরু কি চিলিতে।

এ ধরণের মেয়েরাই সেখানকার পছন্দ।

লিথ আর বাক্সাম্ মিলিয়ে লিসম যাদেব দেহ সৌষ্ঠব ইউরোপে তাদের চাহিদা প্রচুর।

আর যে কোন ধরণেব সাদা মেয়েব চাহিদা প্রাচ্যেই বেশি। কথা বলতে বলতে থেমে গেলেন মঁসিয়ে লা। ফিসফিস করলেন, এই দিকেই আসছে। ভাগ্য ভালো আমাদের। রোজ এখানে পাওয়া যায় না।

মঁসিয়ে আলবেঁয়াকে দামী স্যুটে ভালো মানিয়েছিল। মঁসিয়ে লাঁর পাশেই বসলেন তিনি। মাত্রামিত সৌজন্য এবং স্মিতহাসি তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ঠ্য। মঁসিয়ে আলবেঁয়াব গল্প শোনার জন্যে আমি ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলাম। অথচ তাঁর মাত্রাতিরিক্ত গাম্ভীর্য এবং সদা সচেতন সংলাপ আমার আকাঙ্খাপূরণের সবিশেষ অন্তরায় ছিল। এ ছাড়া নীল আলোকে ডোবা একটি রহস্যময়ী নারীর তীব্র ও ঝাঁঝালো কণ্ঠের গান যে-কোন রকমের আলোচনাকে প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে।

অন্যদিকে চেয়ে সিগারেট টেনে যাচ্ছেন মঁসিয়ে লাঁ। আমি এক-দৃষ্টিতে চেয়ে আছি মঁসিয়ে আলবেঁয়ার দিকে ; মঁসিয়ে আলবেঁয়া আমার বিদেশি মুখের দিকে একবার তাকিয়ে অন্যদিকে মন দিলেন।

এতক্ষণ পরে মঁসিয়ে লাঁ মঁসিয়ে আলবেঁয়ার দিকে মুখ ফেরালেন,

শুভ সন্ধ্যা মঃ আলবেঁয়া।

একটু চমকে উঠেছিলেন বোধ হয় আলবেঁয়া এবং ক্ষণকালের জন্যেই। তারপরই মঁসিয়ে লাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

অনেকদিন বাদে আপনার সঙ্গে দেখা—যেন কয়েকটা ঋতু!

গালে একবার হাত বুলিয়ে মঁসিয়ে আলবেঁয়া জানালেন, হবে বোধ হয়। একটু হাসিও মুখে ছড়িয়ে দিলেন তিনি, খুব আনন্দিত হলাম আপনার সঙ্গে মিলিত হয়ে, সৌভাগ্য বলেই মানছি। মঁসিয়ে আল-বেঁয়ার গলার স্বরে অকৃত্রিমতার পরিচয়।

মঁসিয়ে আলবেঁয়া। একটু যেন থেমে গেলেন মঁসিয়ে লাঁ, ভাগ্য-দেবী আপনাকে যথেষ্ট কৃপা করেছেন আশা করি—

কি যে বলেন মঁসিয়ে, তবে দু'চার পয়সা হচ্ছে—স্তিমিত এবং শ্লথকণ্ঠ মঁসিয়ে আলবেঁয়া বললেন, তাঁর ফলে একটু দাঁড়িয়ে গেছি। তা' তেমন কিছু নয়—

তবে আমাদের পক্ষে আশ্চর্য হবার মতো মঁসিয়ে আলবেঁয়া!

কেন? মঁসিয়ে আলবেঁয়া পরিপূর্ণ পানীয়ের গ্লাসে তাঁর ঠোঁট ছোঁয়ালেন। আঙ্গুলে সুপুরির মতো আংটির সবুজ পাথর বিড়ালের চোখের মতো ঝকঝক্ করছে।

আপনার বুদ্ধি এবং অর্থ এমন একটা দুরূহ এবং গোপন ব্যবসায় নিযুক্ত আছে যার স্বরূপ জানিনে তবে আন্দাজে বুঝি। মঁসিলে লাঁ আমার দিকে তাকালেন, অনেক সময় আমাদের ঈর্ষা ওঁকে সংকটের মধ্যে ফেলে দেয়। বুঝতে পারলাম না মঁসিয়ে লাঁর কথায় ব্যঙ্গ না অন্যকিছু।

এ মহাদেশে উনি সবচেয়ে বেশি বিবাহিত পুরুষ—মঁসিয়ে লা অব্যর্থ শরনিক্ষেপ করে চলেছেন, আর মেয়েরা ওকে দেখলেই প্রেমে পড়ে।

মসিয়ে আলবেঁয়া মসিয়ে লাঁর দিকে সহজ চোখে তাকিয়ে আছেন। মাঝে মাঝে চোখ দুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

আচ্ছা মসিয়ে আলবেঁয়া, আপনার প্রথম শিকার কে? হ্যাঁ—বোধ হয়, একটু থামেন মসিয়ে ল'। কণ্ঠে ইতস্তত ভাব, যতদূর মনে হচ্ছে আলজিয়ার্সের সেই মহিলা—কি যেন নামটা—সোনালি চুল—এখন তো নিজেই একটা ব্রথেল চালাচ্ছে। তাই না?

পাগলের মতো বাজে বকে চলেছেন। শান্ত ও নিরুত্তাপ গলা মসিয়ে আলবেঁয়ার—ভেতরে ক্ষুব্ধ আলোড়ন হলেও বোঝার উপায় নাই।

বেশ লাভজনক ব্যবসা কি বলেন?

আপনাকে আর বিশদ ব্যাখ্যা করতে হবে না। মুখের অপ্রসন্নতা নিয়েই বসে থাকেন মসিয়ে আলবেঁয়া।

তবে বিপজ্জনক, কি বলেন?

ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ। মাপ করবেন উঠছি। উঠে পড়লেন মসিয়ে আলবেঁয়া। আঙ্গুলের পাথরটা বেড়ালের চোখের মতো ঝকঝক করছে। অলৌকিক। কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন মসিয়ে ল'। নতুন করে খেলা শুরু করলেন।

আমরাও উঠবো মসিয়ে। অনুগ্রহ করে আর একটা রাউণ্ড হয়ে যাক। বিদেশি ভদ্রলোক সঙ্গে রয়েছেন। ফরাসি সৌজন্য সম্পর্কে যেন বিরূপ মনোভাব না নিয়ে যান। অনুগ্রহ করে আর একটু বসুন।

ওয়েটার আবার পাত্র পূর্ণ করে দিয়ে গেল।

মসিয়ে আলবেঁয়া, একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি মাপ করবেন? একটা খাপসুরৎ মেয়েকে আপনার সঙ্গে দেখছি। কতোদিন আছে?

মাস দুই হবে।

কেমন কাজ করছে?

ভালো। অন্তত আমার তাই মনে হয়।

ভালো কাজ করলে আপনার কাছে ভালো ব্যবহার পাবে। আপনি উদার দৃষ্টিভঙ্গীর লোক—নিজে বাঁচো এবং অপরকে বাচাও অর্থনীতির এই সূত্রের ওপর বিশেষ প্রত্যয় রাখেন মেয়েটি দিনে কতোজনের মনোরঞ্জন করছে?

মসিয়ে আলবেঁয়াকে একটু ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল মনে হল। ওঠবার কথাই বোধ হয় ভাবছিলেন তিনি। সুচতুর মঁসিয়ে লঁা সিগারেট নিবেদন করলেন। ওয়েটার পাত্র পূর্ণ করে দিল। মসিয়ে আলবেঁয়া পানপাত্রের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

মঁসিয়ে লঁা একটু হেসে কাঁধ ঝাকিয়ে শুরু করলেন, সেই মেয়েটার কি হল? যাকে আপনি সিনেমা হল থেকে...

ঘুরে বসলেন মসিয়ে আলাবেঁয়া, কার কথা বলছেন আপনি?

আবে সেই যে যাকে আপনার সাকরেদ—আমার মনে হয় আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন কাব কথা আমি বলতে চাইছি।

মসিয়ে আলবেঁয়া চুপ করে রইলেন।

আর মসিয়ে লঁা মসিয়ে আলবেঁয়ার দিকে অলপক চেয়ে সিগারেটে লাইটার ছোঁয়ালেন।

যদি না আপনাব বিস্মরণ শক্তি খুব প্রবল হয়। মসিয়ে লঁা যেন নিজের মনে স্বগতোক্তি করলেন, আপনার এক বন্ধুর কাছে অঙ্গীকাব করেছিলেন তাকে একটি সোনালি চুলের ব্লণ্ড না হয় কালো চুলের ব্রুনেট জোগাড় করে দেবেন। আর বন্ধুটিও আপনাকে চার হাজার ফ্রাঙ্ক অগ্রিম দিয়ে দিলেন। কাজে নেমে পড়লেন আপনি। মাইনে-করা কোন প্রৌঢ়া মহিলা একবার সিনেমা হলে একটি মেয়ের পাশে বসল। মেয়েটি একলাই এসেছিল। নিখুঁত সুন্দরী বলা যায় তাকে। শো শুরু হবার আগেই মহিলা মেয়েটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ জমিয়ে নিয়েছিল।

কোথায় থাকো?

সাবার্বে।

একলা এসেছ বুঝি?

হাঁ।

দেবি হয়ে গেলে বা ট্রেন মিস হয় যদি?

সত্যি খুব মুস্কিল হবে।

পড়াশুনো করো তো ?

না, দোকানে কাজ করি। মেয়েটি বিষণ্ন মুখ তুলে তাকালে'

বাড়িতে কে কে আছেন ?

শুধু মা।

তোমার বাবা ?

তিনি অনেকদিন আগেই মারা গেছেন।

তোমার মা কি কোথাও কাজ করেন ?

না, তিনি অন্ধ।

তা' হলে তোমাকে তো সংসার দেখতে হয়।

মাথা নেড়ে সমর্থন করে মেয়েটি।

কতো মাইনে পাও ?

খুব সামান্য। কোন রকমে স স'ব চলে

প্যাবিসে ... কবি কবলে ? ভালো মাষ্টা

কৃতজ্ঞ মেয়েটি নম্র চোখে চেয়ে থাকে

আমার ভাইপোর একটা ডিপা'র্টমেন্ট

করে দেন।

খুব ভালো হয় তা হলে।

আমাকে পিসিমা বলে ডে

ছিল।

ছবি সুরু হবার কিছুক্ষণের

হাইপোডারমিক স্ুঁচ বের করে মে

টোকা কামড়েছে বা পিনটিন ফুটে ...

না মেয়েটি। শো শেষ হয়ে যাবার

না!

কি হোল তোমার ?

আমি উঠতে পারছি না।

কেন ?

কি জানি! পা যেন অবশ হয়ে গেছে। কোন সাড় নেই।
'ফ্লকেছে মেয়েটি, মা পথ চেয়ে বসে থাকবে—
' তুমি কি জলে পড়ে গেছ বাছা?
উত্তর দেয় না মেয়েটি। অঝোরে কাঁদে।
অপেক্ষা করো। এক্ষুনি আমার ভাইপো আসবে। না হয়
' আমার ওখানে।
সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে মেয়েটি।
পনার রাজকীয় আবির্ভাব। মেয়েটির আত্মীয় সেজে
সাহায্যে তাকে ট্যাক্সিতে তুলে নিলেন। তারপরের
। সরল পথ নরকের দিকে সোজা চলে গেছে।
মেয়েটিকে আপনার বন্ধুর কাছে ডেলিভারি দেওয়া
ব .নিজে তৈরি ক'রে দিয়েছিলেন। ব্যাপারটা
এর কাছে না-দিয়ে নিজেই তৈরি করার দায়িত্ব

লজ্জাকর ব্যাপার ঘটেছিল তাতে তার মতো
উপায় ছিল না। সুযোগ পেলে সে
' দেশে পাড়ি দিত।
মলা নেই মঁসিয়ে। ক্যাপিটেলের
—এন্টারপ্রেনিয়রের ঝুঁকি নেই।
৷ নেই'। আছে শুধু প্রফিট এবং

কাজকর্ম করছে। মঁসিয়ে মনার্দ-এর
।পনি তো সেখানে প্রায়ই যান—যান না?
।দে নামিয়ে নিয়ে এলেন মঁসিয়ে লাঁ, গল্পটা
বলতে পারেন মঁসিয়ে আলবেঁয়া, তবে আপনার
।গ আছে, এসব গল্প আপনি নিজে কখনো
। কষ্ট ক'রে জেনে নিতে হয়। আশ্চর্য আপনার

জীবন। মহৎ। দান্তের নাইন্‌থ সার্কেল-এর কল্পনাকে আপনি রূপ দিচ্ছেন। তবে দেখতেই পাচ্ছেন আপনার কর্মজীবন সম্পর্কে আমাদের হালফিল ওয়াকেবহাল থাকতে হয়।

যদি অনুমতি করেন মঁসিয়ে আলবেঁয়া। আবেদন জানালেন মঁসিয়ে লাঁ, আমি এই ভদ্রলোকের কাছে আর একটি উপাখ্যানের অভিজ্ঞতা শোনাতে পারি যার সংগে আপনিও বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। আর যার [illegible] হোটেলের (জেল) বাসিন্দা হ'তে হয়েছিল আর কি!

হ্যাঁ, ভালো কথা, মঁসিয়ে লাঁ আমার দিকে ফিরলেন, এই অপহরণের কাজে হালফিল কৌশলকে কাজে লাগিয়েছিলেন মঁসিয়ে আলবেঁয়া।

আমি স্বীকার করি মঁসিয়ে আলবেঁয়া, কোন মেয়ের ক্ষমতা নেই যে আপনার জাল ছিঁড়ে বের হ'য়ে যায়।

• গল্পের সুরুটা বেশ চমকপ্রদ!

নির্জন রাত। প্যারিসের পথে-ঘাটে শীতের আমেজ এসেছে। উত্তরের বাতাস সহরের কড়া নাড়ছে।

হঠাৎ পথের পুলিশ পাহারা একটা চকিতআর্তনাদে সচকিত হ'য়ে উঠল। তারপরই চুপচাপ। যে ট্যাকসি থেকে আওয়াজটা এসেছিল ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল সেই ট্যাকসি। গাছের পাতা শিরশির ক'রে উঠল।

একটা পুলিশভ্যান সেই মুহূর্তে বিটের পুলিশ পাহারা বদল দিতে এসেছিল—অনুসরণ করল ট্যাকসিটাকে।

ছুটো ঝড়—ঝড় উড়িয়ে চলল—সামনে পিছনে, লনরাই-লেনের বিসর্পিল পথে—

গ্যারে সঁত ল্যাজারে ষ্টেশনের গায় যে সব ট্যাকসি ভাড়ার জন্যে অপেক্ষা করে তাদের অনেককেই আপনা দাদন দেওয়া থাকে।

অন্যান্য দিনের মতো সেই সব ঘুঘুদের কেউ কেউ শকুনের চোখ

মেলে বসেছেল ক্যাবের গর্তের ভেতর—শিকারের আশায়।

মেয়েটাকে তাদের কেউ দেখেছিল প্রথম—ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে পেভমেন্ট পৌঁছতে ইতস্তত করেছে। রাত তখন বারোটা-একটা। তাদের অভিজ্ঞের চোখ বলে দিল মেয়েটি রাতের প্যারিসে অপরিচিতা।

ট্যাকসি এগিয়ে গেল, তখনো সন্দেহ আছে।

গাড়িতে উঠে মেয়েটি বলল, প্লেস নিকা—

গাড়ি মুখ ঘুরিয়ে উলটোদিকে চলতে সুরু করল। মেয়েটির দিক থেকে কোন প্রতিবাদ এলো না। তখন ড্রাইভার আশ্বস্ত হ'ল। জালে যে মাছিটা পড়েছে তাকে সোজা ডেরায় নিয়ে হাজির করা যাবে। ঝামেলার সম্ভাবনা নাই।

মেয়েটি রাত্রির নিষিদ্ধ নগরীতে হারিয়ে গেল। যা বলছি ঠিক বলছি তো মঁসিয়ে আলবেঁয়া ?

মঁসিয়ে আলবেঁয়া বিষণ্ণ, না ঠিক বিষণ্ণ নয়, একটা নির্লিপ্ত উদাসীনতার মুখোস এঁটে বসে রইলেন।

যাকগে। একটু অনুকম্পা বোধ করলেন মঁসিয়ে লাঁ মঁসিয়ে আলবেঁয়ার ওপর, ছোট করে দিচ্ছি গল্পটা'কে—ট্যাকসিটা নির্জন রাস্তা খুঁজে ছুটতে লাগল—একটু পরেই বিরলবসতি নির্জন এলাকায় গিয়ে পৌঁছল। মেয়েটি ততক্ষণে ব্যাপারটা অনেকখানি আঁচ করে ফেলেছে বোধ হয়। সে দরজা খুলে চেঁচাতে থাকে। ড্রাইভার তাকে বোঝাতে থাকে ভয় পাবার কিছু নাই। তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেবার জন্যেই সর্ট-কাটে যাবছে। মাদার মেরির নামে বারবার শপথ করে সে।

গাড়ির কাঁটা স্পীডোমিটারের শেষ অঙ্কে গিয়ে ঝুলে পড়েছে। পেছনে পুলিশের গাড়ি।

হঠাৎ একটা অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে গাড়িটা। দু'পাশের বাড়িগুলো দানবপ্রকৃতির নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ভৌতিক অস্তিত্ব কেমন একটা শিহরণ আনে। গাড়ির ভিতরে বসে জালে পড়া পায়রার মত কাঁপে মেয়েটি। বারবার মেরির

নাম স্মরণ করে। এ বিপদ থেকে যেন উদ্ধার পায়।

তারপর হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়িটা বাঁয়ে একটা নীরব অন্ধকার গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ে। চেতনা হারানোর মতো অবস্থা মেয়েটির—চারদিকে তাকিয়ে কিছুই বুঝতে পারে না। সারা শরীরে তার ত্রাস। উদ্‌গাঢ় অন্ধকারে তার চোখের চকিত আলোকে বিপর্যয়ের আভাস।

সেদিন সেখানে হাজির ছিলেন, মঁসিয়ে লাঁ মঁসিয়ে আলবেয়ার দিকে অপাঙ্গ ইঙ্গিত হানলেন, মূল নায়ক।

লাঁ মিল্যার আরেকটি শিকার। এবং এমন শিকার অনেকদিন পাওয়া যায় না। ক্লাসিক গঠন। উন্নত গ্রীবায় ক্লিয়োপেট্রার গর্ব। চোখের আলোয় রুথের বিষণ্ণ বেদনা। সমস্ত অবয়বে গ্রীক উপকথার দেবী ·····। হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন মঁসিয়ে লাঁ. প্যারিসের পুলিশ বাদ সাধল। মাল মার্সেলিসে পাচার হবার আগেই তারা অবরোধ করে বসল। একটা নকল যুদ্ধের মহড়া দিয়ে পালিয়ে গেল সবাই। সেখান থেকেই মেয়েটিকে পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে এলো। আর আমাদের বন্ধুটি। মঁসিয়ে আলবেঁয়ার দিকে আর তাকালেন না। মঁসিয়ে লাঁ, ঠিক সময়মত পুলিশের হাত পিছলে কেটে পড়লেন। ঠিক আগের মতো।

মঁসিয়ে লাঁ গলা ভিজিয়ে নিলেন, শুনছি আপনি আবার বিয়ে করেছেন, মঁসিয়ে আলবেঁয়া?

মঁসিয়ে আলবেঁয়ার দিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। মঁসিয়ে লাঁ যেন সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়েছেন, মেয়েটির নামটি জানতে পারি কি, মঁসিয়ে? পরম সৌভাগ্যবতীর নামটা কি! সে নিশ্চয়ই বিত্ত ও সৌভাগ্যের বরপুত্রের হাতে হৃদয়মন সঁপে দিয়ে ধন্য? মেয়েদের সুবিধে মতো বিয়ে করেন মঁসিয়ে—আমাদের বন্ধু মঁসিয়ে আলবেঁয়া। তারপর তাদের বাজারে ছেড়ে দেন। চরে বেড়াবার জন্য। কোন সামাজিক জীবন বা শৃঙ্খলা কোন কিছু তাদের মানতে হয় না। শুধু রোজগারের

একটা নিয়মিত অংশ আপনাকে দিয়ে যেতে হয়। এই তো ব্যাপার—

কি ভাবছেন? মঁসিয়ে লাঁ সিগারেটের প্যাকেট তুলে ধরলেন মঁসিয়ে আলবেঁয়ার দিকে, কতো ভাগ্যি করে এসেছিলেন। নিজে তোফা আছেন, শেরি ব্যার্গাণ্ডিতে চুমু দিচ্ছেন—ইচ্ছে হলে নিষিদ্ধ ফলের স্বাদ নিচ্ছেন।

মেয়েরা রোদ-ঝড়-বৃষ্টি মাথার ওপর নিয়ে আপনার জন্য খেটে মরছে। আর তাদের সেই রোজগারের বিপুল স্রোত আপনার জন্য হিসাবের হ্রদে গিয়ে জমছে।

মঁসিয়ে লাঁ আর একবার গলা ভিজিয়ে নিলেন, নতুন মেয়েদের কোথায় পাঠাচ্ছেন, পেরু, ব্রেজিল, মেক্সিকো—? বেশ বুঝিয়েছেন ওদের থিয়েটার করতে যেতে হবে! প্রত্যেকটা জাহাজ আপনার জন্য দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলে গিয়ে ভেড়ে আর সেখান থেকে বোঝাই করে আনে সোনার বার। ফ্রান্সের রৌদ্রোজ্জ্বল বন্দর থেকে পুষ্পসার সুরা আর ক্রীতদাসী নিয়ে জাহাজ ভাসে অন্য বন্দর অন্য নগরের উদ্দেশে—

একজন ওয়েটার আমাদের টেবিলে এসে মঁসিয়ে আলবেঁয়াকে অভিবাদন জানিয়ে পিপির কাছে সরে গেল। সেদিকে না তাকিয়েও কান খাড়া করে রইলাম।

ম্যাডামোয়েজেল, সামনের টেবিলে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে এক বোতল স্যাম্পেনের সময় দিতে পারবেন কি? ওয়েটার ফিসফিস করে পিপির কানে।

তাঁকে বলো আমি এখন ব্যস্ত আছি। পাশের টেবিল থেকে মুখ বেঁকালো পিপি।

ওয়েটার সরে এল মঁসিয়ে আলবেঁয়ার কাছে এবং তাকে কিছু নিবেদন করল।

মিস পিপি। মসিয়ে আলবেঁয়া সরে বসলেন পিপির দিকে, ভদ্র লোক একজন ব্রিটিশ লর্ড। পকেটে প্রচুর শেকল্ আছে।

জাহান্নামে যাও তুমি আর তোমার ইংরেজ লর্ড। পিপি বিশ্রীভাবে চেঁচিয়ে উঠল, ইংরেজগুলো একেবারে হাড়কেপ্পন। ওদের চেয়ে আমেরিকানরা ভালো—অনেক ভালো।

একে ছেড়ে দেওয়া তোমার পক্ষে বুদ্ধির কাজ হবে না।

ভালো না লাগলে কি করবো। বুড়োব নাকে দিনরাত সর্দি জমে আছে অথচ এলিসিয়ামেব গন্ধ শোঁখাব সখ!

হুম। ম'সিয়ে আলবেঁয়া কোন কথা না-বলে পিপিব মুখেব দিকে তাকিয়ে রইলেন। কঠিন অনুশাসনের তাম্রলিপি সেই চোখের ফলকে। সিগারেট টানতে গিয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলে পিপি। ভাবলেশহীন মুখ ম'সিয়ে আলবেঁয়ার; মাঝে মাঝে কুটিল নাসারন্ধ্র ঈষৎ স্ফুরিত হচ্ছিল।

সেদিকে চেয়ে হাসতে গিয়ে অপ্রতিভ হল পিপি। সিগারেট এ্যাসট্রেব মধ্যে ডুবিয়ে উঠে পড়ল। তাকে অনুসবণ কবেন ম'সিয়ে আলবেঁয়া। ম'ঃ লাঁ আব-বাধা দিলেন না।

পিপিব সংগী এতক্ষণ চুপচাপ কবে ব্যাপাব লক্ষ্য করছিল। এবার ঋজু হয়ে বসল। তাব মুখ দেখে মনে হল রাগে ফুলছে। একটু সন্ত্রস্ত হলাম। কিছু একটা ব্যাপার না ঘটে যায়।

আপনাদের দেশের সেই মেয়েটির সংগে দেখা করবেন নাকি? ম'সিয়ে লাঁর আহ্বানে মুখ ফেবালাম।

একটু ইতস্তত করি।

আমাব কিছু অসুবিধে নেই।

তাহ'লে ডাকুন।

ম'সিয়ে লাঁ উঠে গেলেন। একটু গিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন· দেবি হবে হয়তো, ধৈর্য হারাবেন না।

কোথায় গেলেন জানিনে। সম্ভব-অসম্ভব অনেক ভাব চকিতে এসে উঁকি দিয়ে গেল। প্যারিসের এই অপরিচিত ক্যাবারের একটি টেবিলে স্থবির হয়ে বসে রইলাম। যে আসছে সে কে—কি কবে প্যারিসে এল—

ল'। মিল্যুর হাতে চোলাই হয়ে বীভৎস দেহবিক্রয়ের পণ্যে পরিণত হল।

হলের এককোণে ফ্লুটে এমন বিষণ্ণ সুর ছড়াচ্ছিল মনের উপকূলে কুয়াশার মতো জমে উঠছিল সেই সুর কিংবা সুরের সুরাসার।

যে আসছে সে কে? সে কি কোন গৃহস্থের বধূ না সোসাইটির উর্বশী। দেউলিয়া জীবনের ভাঙা জাহাজ এসে নোঙর ফেলেছে নিষিদ্ধ নগরীর উপকূলে। যৌবনের বিভ্রান্তি কোথায় ঠেলে দিয়েছে তাকে— দিনরাত্রির নরকের নিষিদ্ধ নগরের প্রেতভূমিতে! এখান থেকে—এই নরক থেকে হয়তো জীবনে তার মুক্তির আকাশকে কোনদিন ছুঁতে পারবে না। হয়তো ব্যর্থতার বিলম্বিত বিলাস মর্মের গূঢ় অন্তঃস্থল থেকে নিদারুণ যন্ত্রনায় বারংবার তাকে পীড়িত করে তুলবে। হয়তো তার অন্য জীবনের যে সহজ আনন্দ—স্বাভাবিক জীবন যাকে অবজ্ঞা করে অস্বীকার করে এসেছে, তারই জন্যে তৃষ্ণার্ত হয়ে মাথা খুঁড়ে মরে থাকবে। জানিনে। হঠাৎ নজরে পড়ল পিপির সেই বন্ধুটি ব্যর্থ লাইটার জ্বালানোর চেষ্টায় বারবার বিরক্ত হয়ে উঠেছে। আমার লাইটার এগিয়ে দিয়ে বললাম, আপনার লাইটারের পেট্রল বোধহয় ফুরিয়ে গেছে ম'সিয়ে।

ধন্যবাদ। হাত বাড়িয়ে দিল সে আমার দিকে।

অসুবিধা না থাকলে আমার টেবিলে আসুন না। আলাপের সুযোগটা অপব্যবহার করতে চাইলাম না।

একটু ইতস্তত করে বলল, অসুবিধে আর কি। তারপরই উঠে এল আমার টেবিলে।

আপনি বোধহয় বিদেশী।

আপনার অনুমান ঠিক।

আপনাকে বলতে বাধা নেই একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। ওই শকুনির বাচ্চাটাকে খুন করবার বাসনা জেগেছিল।

একটু বিস্মিত হয়ে তাকালাম।

খুন করাটা আমার পক্ষে নতুন নয়। আগে দরকারে পড়ে আর

একজনকে খুন করতে হয়েছে।

তাই নাকি।

হ্যাঁ। আপনার দেশ কোথায়?

ভারতবর্ষ।

এই শয়তানটার হাত থেকে পিপিকে উদ্ধার করতে চাই। ভারতবর্ষে এমন জায়গা কি খুঁজে পাওয়া যাবে না সেখানে গেলে শয়তানটার হাত থেকে পিপি বাঁচতে পারে।

তা বোধহয় থাকতে পারে।

আজ রাত্রে। জনহীন মরুভূমি, কোন প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ বা বনস্পতি প্রাকারে ঘেরা যে কোন এলাকা হোক। পিপিকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চাই। দেখলাম লোকটি উত্তেজিত হয়ে উঠছে।

ভারতবর্ষের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। বোধহয় সেখানকার সরকার এ ধরনের অবিচার চলতে দেবে না।

একটু হাসলাম। বোধহয় লোকটির কথা সমর্থন করে।

একটু পানীয়ের অর্ডার দেব কি?

দিন। লোকটা আমার দিকে মুখ করে তাকাল, একলা বসে থাকতে ভালো লাগছে না। পিপিরও আজ শরীরটা ভালো নেই।

কেন আপনার ভালো লাগার মন্দ লাগার কোন দাম নেই।

আপনি বোধহয় জানেন মঁসিয়ে, পিপি আলবেঁয়োর সম্পত্তি। আমি পিপির সঙ্গে থাকি, সেইটুকুই পিপির স্বাধীনতা। অবশ্য কাজ কামাই করে পিপি আমার ভালো লাগা মন্দ লাগার দাম দিতে পারবে না।

কেন?

কেন? একটু বিষণ্ণ হাসি তার ঠোঁটে ছলছলিয়ে উঠে আবার মিলিয়ে গেল। পিপিকে তার রোজগারের একটা নির্দিষ্ট অংশ মঁসিয়ে আলবেঁয়োকে জুগিয়ে যেতে হয়। ঈশ্বরের দোহাই, বিশ্বাস করুন আপনি, কি করে বিংশ শতাব্দীতে এমন করে দাসব্যবসা চলে আমি

বুঝে উঠতে পারিনে। এর জাল যে কোথায় ছড়িয়ে, কোনদিন একটু টান পড়লে বুঝতে পারবেন। দূরে থেকে যাদের ঘৃণা ছাড়া আর কিছু দেওয়া যায় না তাদের পরিচয় পেলে আপনার মন সহানুভূতিতে ভরে যাবে।

লোকটাকে দেখে কেমন মনে হয়। কথাবার্তা শোনার পর কেমন যেন ধারণা পালটে যায়। মনে হয় লোকটার মন আছে। যা আমাদের কাছে অভাবনীয় তাই ওর ভাবনার বিষয়।

আপনাকে পিপির সংগে দেখে খুব আশ্চর্য মনে হয়।

আমি নিজে আজকাল চমকাইনে। এখন আপনি বিশ্বাস করুন, আপনি যা দেখেছেন এই আমার পরিচয়ের শেষ কথা নয়।

আপনাদের যোগাযোগটা নিশ্চয়ই নাটকীয়?

না, তেমন কিছু নয়।

একটু যেন রহস্যের ইঙ্গিত পেলাম তার নেতিবাচক কথার মধ্যে। শুনেছি আপনি কোথাকার রাজার আত্মীয়।

ভুল শুনেছেন মঁসিয়ে। তবে একটু থেমে নিজের কথাকেই প্রতিবাদ করে বলল, সম্পর্ক অবশ্য ছিল। খুব দূরেরও নয়। সে কথা আজ ভুলে যাওয়াই ভালো।

লোকটি এমন করে ধোঁয়া ছাড়ল যেন অতীতকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে চায়।

আপনার সম্পর্কে জানতে খুব উৎসুক হয়ে উঠেছি।

লোক আমাকে ঘৃণা করে। তা' ছাড়া আমার মানসিক অবস্থাও খুব সুস্থ নয়। মানুষের জীবনের এক বীভৎস ভূমিতে আমার চলাফেরা। প্রচলিত বিশ্বাস সমাজশৃংখলাহীন নির্বিচার নীতি বিচারের পথ আমার সামনে দিয়ে ঘুরে গেছে। আমার জীবনের অনেকখানি নরকের রূপকথা। মঁসিয়ে কি তাই শুনতে খুব উৎসুক?

—নিশ্চয়ই। আমার হাতের সিগারেট পুড়ে যাচ্ছে। টেবিল ও ফাঁকা।

বাজনাটা অনেকখানি স্তিমিত হয়ে এসেছে। যে প্রয়োজনে যন্ত্রের ঐকতান, মধ্যরাত্রির সীমানা পার হয়ে এসে সেই প্রয়োজন ফিকে হয়ে এসেছে।

যারা সঙ্গী খুঁজে নিতে এসেছিল তারা হল ছেড়ে মৌচাকের গর্তে ঢুকে পড়েছে। হলঘরটা প্রায় ফাঁকা।

লোকটি তার কাহিনী সুরু করল ঃ

আমার নামটা থাক। ওটাকে আমি উচ্চারণ করবো না। মা-ই নামটা রেখেছিলেন। মায়ের স্মৃতি শৈশবের বিনষ্ট রূপকথার মধ্যে লুকিয়ে আছে। সেই স্মৃতিটুকু আমার সারা জীবনের বৃক্ষহীন মরুমায়ার মধ্যে একটুখানি ওয়েসিস। মায়ের মৃত্যুর পর বাবা খুব নিঃসঙ্গ বোধ করতেন। একটু গ্রাম্য ধরনের মানুষ ছিলেন তিনি—সহরকে সভয় ত্রাসের সঙ্গে এড়িয়ে চলতেন। মেশবার মতো লোকেরও অভাব ছিল সেখানে। কালেভদ্রে কখনো দু'একজন ট্যুরিষ্ট আসতেন, তারাও বেশীদিন থাকতেন না।

একবার একজন আমেরিকান ট্যুরিষ্ট বাবার অতিথি হয়ে এলেন। যেমন খোলামেলা তেমনি মিশুক। আমাদের পরিবারিক সম্ভ্রমের কঠিন গাম্ভীর্য কয়েকদিনের মধ্যে ভেঙে টুকরো-টুকরো করে দিলেন। তার সঙ্গ বাবার খুব ভালো লাগল। শিকার কিংবা মাছধরার প্রত্যহ আয়োজন চলত। আমাদের বাড়িতে অনেকদিনকার যে শোকবিষণ্ণ নির্জন সময় জমে ছিল ভদ্রলোকের প্রাণখোলা হাসি আর উচ্চকিত আলাপে সরে গেল। এ ছাড়া আমেরিকান ভদ্রলোকের একটা অভ্যাস ছিল। এইখানে এসে একটু থামলো লোকটি। কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল। বোধহয় পুরোন স্মৃতি তার স্মৃতিকোষে সহসা আলাপচারী হয়ে উঠেছে। তারপর ফিসফিস করে বলল, পুরোন কবর খুঁড়ে স্মৃতির বেদনা কে জাগাতে চায়! তবে খোলাখুলি বলছি বলে মঁসিয়ে আমার গোপনীয়তা রক্ষার অবহেলা দেখে নির্লজ্জ বলে ভাববেন না।

হ্যাঁ, সেই ট্যুরিষ্ট ভদ্রলোকের রোজ রাতে নতুন মেয়ে লাগলো। দূর

থেকে মনে হত গ্রীকদর্শনের স্থূল দিকটা তার মধ্যে অত্যন্ত প্রকট। সারা রাত আলো জ্বলতো তার ঘরে। কোনদিন বাবাও সেই ঘরে থাকতেন। এমন কি অনেক সময় বিদেশী মেয়েদের আমাদের বাড়িতে দেখা যেত।

বাবার মধ্যে একটা নতুন জীবনের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম সেদিন। একদিন হঠাৎ ভদ্রলোক চলে গেলেন। অভ্যেসটা বাবার মধ্যে ততো-দিন বপ্ত হয়ে গেছে। অতিথিশালার বিকৃতি জোগান পেয়ে দৈত্যের আকার ধরেছে।

আপনি জানেন মসিয়ে, মানুষের মধ্যে একটা অসীম আকাংখা আছে —ভালোমন্দ দু'দিকেই তার পথ গেছে। ভোগের পথটা অত্যন্ত পিছল।

ঘোড়ার মতো লাগাম পরাতে না পারলে মানুষকে পথে বিপথে টেনে নিয়ে যায়। বাবাও দ্রুত সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগলেন। প্রভাব প্রতিপত্তি অর্থ-ঐশ্বর্য যখন যেটা প্রয়োজন সেটার ব্যবহার করতে কসুর করতেন না।

আগে সকালবেলায় একটে বসে দুজনে ব্রেকফাস্ট করতাম। শেষ সকালবেলায় তার সঙ্গে দেখা হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। আমি যখন ঘুম থেকে উঠতাম তিনি তখন হয়তো ঘুমুতে যাচ্ছেন। অতবড় প্রাসাদটার দু'কোণে থাকতাম দুজনে। বাবার সংগে দেখা হলে সামান্য দু'একটা কথা হত। তাও সব সময় তাকে অন্যমনস্ক মনে হত কিংবা এও হতে পারে আমাকে তিনি এড়িয়ে চলতে চাইতেন।

বড়ো হয়ে কলেজে গেলাম। বাবা অনেক নিষেধ করলেন। কলেজে পড়াটা আমার উপলক্ষ্য। লক্ষ্য বাবার কাছ থেকে দূরে সরে থাকা। অন্য যে কোন বিষয়ের থেকে দর্শন আমার ভালোই লাগত। বাড়ি থেকে দূরে এসে একরকম ভালোই ছিলাম। বরং বলা চলে বাড়ির কথা একরকম ভুলেই ছিলাম।

হঠাৎ একদিন বাড়ি থেকে তার এল বাড়ি ফিরবার খবর নিয়ে। সে বছর ছুটিতে বাড়ি যাইনি। সুইজারল্যাণ্ডে বেড়াতে গেছিলাম।

বোধহয় বাবার প্রতি একটা অভিমান আমার মনে দানা বেঁধেছিল। আমাকে তিনি যে অবহেলা দিয়েছিলেন সেই অভিমানই বাবার কাছ থেকে দূরে সরে থাকবার প্রেরণা জোগাচ্ছিল। প্রায় বছর দুয়েক তাঁর সঙ্গে দেখা হয় না। জানি না কিভাবে তিনি আমাকে গ্রহন করবেন। নানারকমের ভাবনা আমার মনের মধ্যে চকিতে দেখা দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল।

বাড়ি পৌছে যে খবর শুনলাম তাতে বিহ্বল হয়ে গেলাম। বাবা খুন হয়েছেন। খাবার টেবিলের সামনেই তাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। সামনে ঠাণ্ডা কাছিমের মাংস আর খোলা মদের বোতল পাওয়া গেছিল। বোধহয় সবে তিনি খেতে বসেছিলেন। কে বা কারা এসে খুন করে গেছিল। সে হদিস কেউ পায়নি।

সমস্ত বাড়িটায় একটা ধূসর ভৌতিক ছায়া পুরোন কর্মচারীরা ভিড করে এলো। তারা অনুরোধ করল সহরে না গিয়ে দেশে থেকে যেতে। কয়েকদিন ছিলামও। ভালো লাগলো না। বিরাট বাড়ির জঠরে একটা গুমোট বিষন্নতা কয়েকদিনেই আমাকে বিপর্যস্ত করে ফেলল তারপর একটানা নিঃসঙ্গতা—সেই যেন আমাকে গ্রাস করে ফেলতে চাইল। কিছু টাকাকড়ি নিয়ে পালালাম। সামনে বিশাল পৃথিবী দ্বীপ-মহাদ্বীপ দেশ-মহাদেশ। সভ্যতার প্রক্রিয়ার থেকে অনেক দূরে সুদূর প্যাসিফিকের এক দ্বীপে পাড়ি জমালাম। বেশ লাগল জায়-গাটা। ইচ্ছে হল ওইখানে ঘর বাঁধি। এই অপরিচিত ভূখণ্ডে অপ-রিচিত মানুষের মাঝখানে নতুন আনন্দে বাঁচি। ধরণীর এক কোণে—ধন নয়, মান নয়, শুধু ভালোবাসা। এই শুধু আশা। প্যাসিফিকের বাতাসে সেই দ্বীপে চীরকালের বসন্ত। অধিবাসীরা যৌবনের উপা-সক। আমাদের সভ্যজগতের জটিলতা সেখানে ঢোকেনি। পল্লবঘন ছায়ার নীচে ছোট ছোট ঘর—বসন্তের বিহ্বল আনন্দের সঙ্গীত; সব মিলে সেই অর্ধসভ্য অথচ অতিথিপরায়ণ মানুষগুলোর মধ্যে সুখে দিন কাটছিল।

সেইখানে পরিচিত হলাম এক নাবিকের সঙ্গে—লোকটা কোন দিশি বলতে পারবো না। হয়তো ইণ্ডিয়ান—হয়তো ল্যাটীন আমেরিকান। নাম ডেওনেজ। সারা পৃথিবী ঘুরছে। দেশে দেশে বন্দরে বন্দরে। সে-ই একদিন আমায় খবর জোগালো মন্টিকার্লো'র। বললে, চলো না ঘুরে আসি।

ইচ্ছে ছিল না সেই দ্বীপ থেকে আব কোথাও ফিরে যাই। লোভের লালসার এক মায়াবী ছবি আমাব সম্মুখে তুলে ধরল। জীবন ক'দিনের! যারা নির্বোধ তারাই সরে যাবে ভোগ থেকে। সুখ থেকে। অনিবার্য একটা পরিণতি যখন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে—চলো একবার সেই আনন্দের ঝর্ণায় গা ডুবিয়ে পৃথিবীকে ভোগ করি। সেই আমাকে বললে, তাজ্জব সহর—যেমন রূপ তেমনি রূপেয়া।

মন্টিকার্লো'র নাম জানতাম না এমন নয়। ফ্রান্সের গায়ে বিন্দুব মতো একটা দ্বীপ।

সিগারেট এগিয়ে দিলাম, ওয়েটার পাত্র ভর্তি করে দিল। গলায় পাণীয় ঢেলে সুরু করল সে, বহুত কিসিমের মজা সেখানে—একরাতে কেউ রাজা উজীর কেউ ফকির।

সত্যি, মন্টিকার্লো আশ্চর্য! কন্টিনেন্টের মানুষ তো বটেই—উত্তর দক্ষিণ থেকে নিত্য নতুন মানুষের ভীড় সেখানে জমে। রাত্রে জাগে সেই সহর—আলোর অপ্সরী হয়ে। যদি ভাগ্য প্রসন্ন হয় সলোমনের ঐশ্বর্য নিয়ে ফিরতে পারবো—নসিবের খেল উলটো চাকায় ঘুরতে সুরু করবে। চলো একবার ঘুবে আসি, তারপর যেখানে হোক জমা যাবে। আমার কাছে যাবার মতো রেস্ত নেই—নইলে একলা'ই পাড়ি জমাতাম।

তারই আগ্রহে পাড়ি জমালাম মন্টিকার্লো'তে—লোভে। কৌতূহলে।

মন্টিকার্লো'তে দুটো মেয়ের সংগে পরিচয় হল। একটি ইতালিয়ান। অন্যটি স্প্যানিশ। একজন দীর্ঘকায়, অন্যজনের আকৃতি খব।

ইতালিয়ান মেয়েটি আমার স্বপ্নহরণ করেছিল। সে যেন আমার মনের বরাঙ্গনা—এপ্রিলের অ-জাগর রজনী, অজ্ঞাতনাম পুষ্পের অনিন্দ্যসৌগন্ধ্য, এলিসিয়াম সেঞ্চুরিয়াব পত্রবল্লবসংপৃক্ত পরিণতবায়ু। দূর সমুদ্রের ওপারে বসন্ত প্রাসাদের এমন কেউ যার দর্শন বারবার আমার স্মৃতিচারণাকে ব্যাকুল করে তুলত।

একটু কাব্য হয়ে গেল মঁসিয়ে। তা' হোক। তাকে দেখে আমার যা মনে হত তাই বললাম।

ইতালিয়ান মেয়েটি তার ীরের নেকলেস টেবিলে রেখে খেলতে বসত। পাশে পরিপূর্ণ ওয়াইন গ্লাস আর হাতির দাঁতের বাঁটে বাঁধানো ছুরি। নেকলেসের সবচেয়ে বড় হীরেটি অষ্ট্রীচের ডিমের মত বড়। হীরাটার দাম সাত অঙ্কের একটা কিছু হবে। পয়সা বাজি নিয়ে সে কখনো খেলত না। তার বাজি থাকতো হীরের হার। অনেকেরই লুব্ধ চোখ হারটার ওপর ঘুরত। কেউ কখনো জোর করে বা জিতে নিতে পারে নি। মেয়েটির হাতের তাস যেন জাদু জানতো—দরকার মতো ছোরাটাও বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে উঠতো।

স্প্যানিশ মেয়েটি খেলতো না, শুধু টাকা তুলে নিত বোর্ড থেকে। ওদের দু'জনকার সম্পর্ক কি কেউ জানতো না। আমি মরলাম ইতা-লিয়ান মেয়েটিকে দেখে আর সঙ্গী এবং বিদেশে বন্ধুও বটে, ডেওনেজ মরল নেকলেসটা দেখে। দু'জনে মনে পণ করলাম অলীপ্সকে জিতে নেবো।

পরিচয়টা ঘনিষ্ঠ করে নেবার জন্য দু'দিন তার সঙ্গে খেললাম। এবং ইচ্ছে করেই হারলাম। পরে অবশ্য জেনেছি ইচ্ছে করলেও জিততে পারতাম না।

ডেওনেজ আমাকে বললে, তুমি মরবে।

আমি হাসলাম। ওকে কি করে বোঝাই এতে কতো সুখ?

ডেওনেজের আমি দিশে পাইনে। কোথায় থাকে কি করে কে জানে? সকালে উঠে বের হয়। অনেক রাত্রে ফেরে। বিশেষ কথা

বলে না। মনে হয় কি যেন খুঁজছে।

জিনেত। সেই ইতালিয়ান মেয়েটির নাম। ওর বাড়িতে গেলে কখনো আমকে অভ্যর্থনা করতো না। শুধু খেলার সময়েই ওর মনোযোগ পেতাম। ওর ঘরেই এক-একদিন খেলতে বসে যেতাম। মোমবাতির ছাড়া অন্য আলো জ্বলতো না খেলার সময়। সেই অস্পষ্ট আলোর স্তিমিত রেশের সামনে বসে আমাদের খেলা হত। জিনেত কখনো খুশী থাকলে আমাদের লাল মদ আর গলদা চিংড়ির ঝাল খাওয়াত।

দুদিন ডেগুনেজের দেখা নেই। সকালে আমাকে কিছু না বলে বেরিয়েছিল। সহরটা তন্নতন্ন করে খুঁজেও পেলাম না। দু'তিনদিন পর একদিন সকালে ফিরে বলল, জিনেতকে নেমন্তন্ন করো—

কি হবে ওকে নেমন্তন্ন করে?

ওর সঙ্গে খেলতে চাই। ওর নেকলসটা জিতে নিতে চাই। তোমার অর্ধেক আমারও অর্ধেক।

কিন্তু নেমন্তন্ন করি কি করে। আমার ব্যাগ যে শূন্য!

আমি খরচ করবো। ও বললে, তোমাকে ভাবতে হবে না। বাজির টাকা আমার কাছেই আছে।

আমি নেমন্তন্ন করলাম।

সহর থেকে দূরে সমুদ্রের কাছাকাছি একটা জায়গায় আমরা ঘরভাড়া করেছিলাম। সেখানেই ওদের আসতে বলা হল।

জিনেত তার সঙ্গী মেয়েটিকে নিয়ে এল। হালকা বেগুনি রঙের গাউন। সোনালি চুলের রাশ! নেপলস-এর সমুদ্রের নীল ছোঁয়া তার চোখে।

প্রচুর কাঁকড়া আর লবষ্টারের অর্ডার দিয়েছিলাম। দু'তিন রকমের মদ।

বন্ধু বললে, তোমার খেলার কোন দরকার নেই, বসে দেখ।

মোমবাতি জ্বালিয়ে আমি আর ডেগুনেজ একপাশে বসলাম। অন্য

পাশে ওরা দু'জন। ডেওনেজের আর তর সইছে না। এমনি ওরা রাত পার করে এসেছে।

খেলা সুরু হল। প্রথমবারের খেলায় হেরে গেল জিনেত। তারপর থেকে প্রত্যেকবারের খেলায় হেরে যাচ্ছিল ডেওনেজ। আর খুশিতে ভেঙে পড়ছিল জিনেত।

শেষে জিনেত বলল, এই শেষবার। আর খেলতে পারছি না। আজ খাওয়া একটু বেশী হয়ে পড়েছে।

সত্যি সোজা হয়ে বসতে পারছিল না জিনেত। অথচ হিসাবে ভুল নেই। খেলাটা ওর কাছে যান্ত্রিকতার মতো হয়ে গেছে।

মন্টিকার্লোতে এসে কেউ আমাকে জিতে যেতে পারে নি।

রাত তখন শেষ হয়ে এসেছে। বাইরে খোলা জানালায় বোধহয় তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে কূলে। ফিকে চাঁদের আলো অনেকখানি ছড়িয়ে গেছে। কেমন একটা বিষণ্ণ নির্জনতা রূপকথার মতো পৃথিবীর পরিলিখনকে ধূসর করে তুলেছিল।

ডেওনেজের মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। সমস্ত মুখে পরাজয়ের দারুণ গ্লানি নেমে গেছে। আমি ভাবছিলাম কি হবে এর পর। আমার কাছে যা আছে তাই দিয়ে কোন রকমে সীমান্ত পেরিয়ে যেতে পারবো। আর ও হতভাগ্যের জন্যে আমার আফসোশের অন্ত ছিল না।

এবার হেরে গেলে তোমার শ্লেভ হয়ে থাকবো। ডেওনেজ বললে, আমাকেই বাজী রাখলাম।

কি দাম তোমার? আমি খেলবো না। তাস গুছিয়ে নিচ্ছিল জিনেত।

একটা সারভেণ্টের সত্যি দরকার আমাদের। সঙ্গের মেয়েটি এতক্ষণে কথা বলল।

বলছ? জিনেত ফিরে তাকালো মেয়েটির দিকে।

মেয়েটি নম্র হেসে মুখটা নীচু করল।

বেশ, তাই হোক। তোমার যখন ইচ্ছে। বেয়াদপ হলে মারাকেস-এর ওদিকে চালান দিয়ে দেব।

তোমাকেও বাজি রাখতে হবে।

নিজেকে বাজি রাখো। গলায় মদের বোতলটা নিঃশেষ করে ঢেলে দিল ডেওনেজ।

বেশ, নিজেকেই বাজি রাখলাম আমি।

তোমার নেকলেশ শুদ্ধু।

হ্যাঁ। তাই সই। রহস্যময়ী জিনেত চোখ দুটোকে আরো রহস্যময় করে তুলল। নেকলেসটার ওপর তোমার খুব নজর আছে জানি। আমার দিকে তাকিয়ে জিনেত হাসলো, লোকসান হয়ে গেল। খেলতে বসলে তোমাকেও একসংগে জিতে নিতে পারতাম।

আমি রাত জেগে খেলতে বা খেলা দেখতে অভ্যস্থ নই। স্নায়ুতে অত্যন্ত টান পড়ছে। মাঝে মাঝে তন্দ্রায় বেসামাল হয়ে পড়ছি।

খেলা সুরু হল। একটা দারুণ ত্রাস আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। জয়-পরাজয় সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নেই।

জিনেতও অত্যাধিক পানে দারুমূর্তি। কেবল ঈষৎ চঞ্চলতা সংগী মেয়েটির অবয়বে।

সময়ের দণ্ড পল বিপল গড়িয়ে চলেছে। প্রতিদ্বন্দ্বী দু'জন মৌন এবং সংহত। কিছুই বুঝতে পারছি না খেলার। কোন পক্ষেরই মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই।

হঠাৎ প্রচণ্ড উল্লাসে টেবিলে তাস বিছিয়ে দিল ডেওনেজ। জিনেত-এর দিকে তাকিয়ে দেখলাম ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তার মুখ। অসহায় চোখ দুটো নিষ্পলক চেয়ে আছে ডেওনেজের দিকে—হাত থেকে তাসের গোছা এলিয়ে পড়ল ঝুরঝুর করে। হার হয়েছে তার।

আমার পিঠে একটা চাপড় মেরে ডেওনেজ বললে, শয়তানের দোহাই—তোমাকে বলিনি নসিব উলটে যেতে পারে—

সব ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছিলাম না।

মন্টিকার্লোতে এসে কেউ তোমাকে জিতে যেতে পারেনি—এখন শুধু তোমার নেকলেস নয় তুমিও আমার সম্পত্তি—তোমার স্লেভটাও—শয়তানের দোহাই, কথার খেলাপ হতে দেব না।

নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে জিনেতের পাশে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর তার মাথার চুলে একটা চুমু খেয়ে বলল, দোস্ত —এই খাপসুরৎ জিনিষটা তোমাকে দিলাম। দিনকয়েক ব্যবহার করে দেখতে পারো, বেয়াদপ হলে ক্যাসাব্লাঙ্কায় বেচে দিয়ো, এন্তেকাল পর্যন্ত ভবিষ্যতে চলার মতো ফ্রাঙ্ক পেয়ে যাবে। বিদ্রূপের হাসিতে ঝকঝক করে ডেওনেজের মুখ। হঠাৎ জিনেত তার সংগীর দিকে ফিরে চেঁচিয়ে ওঠে, নিশ্চয়ই তুই?

আর্তনাদ বেরিয়ে আসে মেয়েটির গলা থেকে, না-না বিশ্বাস করো আমি নয়—

দারুণ ক্রন্দন ফুটে ওঠে জিনেতের মুখে। চুপ করে যায় সে।

ডেওনেজ তার হাতের তাস শাপলিং করে যাচ্ছিল, অবশেষে মরুদ্যানের শান্তি—কি বলো?

আমাদের ঘরে আর কোন সাড়া ছিল না। মাঝে মাঝে সমুদ্রের ঢেউভাঙা বিলাপের উচ্ছ্বাস।

সংগী মেয়েটি প্রলাপ বকে যাচ্ছিল, বিশ্বাস করো আমি নয়।

সবটা বুঝতে না পারলেও এ'টুকু বুঝলাম স্প্যানিশ মেয়েটির কাছ থেকে এমন কোন সংকেত ডেওনেজ জেনে নিয়েছে যার মূলে রয়েছে আজকের পরাজয়। যা ভেবেছি এ হতেও পারে—নাও হতে পারে। নতুন একটা বোতল নিয়ে বসে ডেওনেজ। মুখে তার মিষ্টি হাসি। জিনেতের দিকে তাকিয়ে আমি ভাবছিলাম সত্যি যদি ডেওনেজ ওকে আমার কাছে দিয়ে দেয়। জীবনের জন্যে দারুণ তৃষ্ণা আমার মধ্যে জেগে উঠছিল। এই সুন্দর অবয়ব—এই মার্জিত মুখরুচি জীবনে অন্যতর নন্দনস্বাদ এনে দেবে। আর কিছু চাই না, শুধু জিনেতের কোমল করপল্লবের স্পর্শস্বাদ—আমার নির্জন কক্ষের একান্তে ওকে

শান্তির মূর্তি হিসাবে দেখতে চাই। ও হবে আমার গৃহিনী, সন্তানের জননী! কর্মের প্রেরণা—আনন্দের স্বাদ।

অনেকক্ষণ বাদে একটা সিগারেট তুলে সবে লাইটার জ্বালিয়েছি—হঠাৎ জিনেতের হাতের ছুরিটা ডেওনেজের বুকে বিঁধে গেল। এত আচমকা ঘটে গেল ব্যাপারটা যে আমার কিছুই করবার ছিল না।

এমন কি ডেওনেজ নিজেও আর্তনাদ করবার সুযোগ পেল না।

লোকটা তোমার কে? জিনেত উঠে দাঁড়িয়েছে।

কেউ নয়। একটু থেমে বললাম, আমার বন্ধু।

সৎকার করার ব্যবস্থা করো।

তারপর সঙ্গী স্প্যানিশ মেয়েটার হাত ধরে ঝড়ের বেগে বাইরে চলে গেল। ওদের ধাক্কা লেগে মোমবাতি নিবে গেল।

অন্ধকারে আমি একলা চেয়ারে বসে। টেবিলের ওপাশে ডেওনেজের মৃতদেহ। এখনো বোধ হয় তার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। জীবনে হতভাগা কি চেয়েছিল আর কি পেল! আকস্মিক মৃত্যুর পরিণাম জীবনের সব আকাংখার নিবৃত্তি দিয়ে গেল।

দারুণ একটা ত্রাস আমার শরীর শিউরে দিল। যদি···

যদি ওরা পুলিসে খবর দেয়। তারপর আর কল্পনা করতে পারি না! তখন মনে পড়ল আমার গাঁয়ের কথা—ছোটবেলার সেই খেলা-ঘর—সেই গ্রামখানার কথা। তার জন্যে সমস্ত মনপ্রাণ তৃষিত হয়ে উঠলো। মনে হল আর কি সেখানে ফিরে যেতে পারবো। সহরের প্রলোভনের এই বিমূঢ় বিভ্রান্তি থেকে ছায়া-নির্জন গ্রামের সেই পথ-খানিতে—জানিনে। জানিনে।

অথচ ধরা যদি পড়ি চিরজীবনের মতো কোন অন্ধকার কারাকক্ষের মধ্যে একফোঁটা আলোর জন্যে স্বগতোক্তি ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। অথচ কিযে করি বুঝে উঠতে পারলাম না। সামনে ডেওনেজের মৃতদেহ।

মোমবাতিটা জ্বালিয়ে দিলাম।

ডেওনেজের বুকের রক্তে জামার অনেকখানি ভিজে গেছে। চুঁইয়ে রক্ত পড়ে মেজেরও খানিকটা ভিজে গেছে। হয়তো এখনো ওর শরীর উত্তপ্ত আছে। জীবনের তাপ এখনো ঠাণ্ডা হয়ে যায়নি। হয়তো এখনো ওর আত্মা কাছাকাছি আছে। পৃথিবীর আলো-বাতাসের মধ্যে থেকে অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্খায় জ্বলে পুড়ে মরছে। সবটুকু জানিনে। সবটুকু চিনিনে।

পৃথিবীতে একটুখানি সুখে বেঁচে থাকার যে বাসনা ওর মধ্যে অতৃপ্ত হয়ে উঠেছিল তারই উত্তেজনায় একদিন স্বদেশের মাটি-গৃহ-পরিজন ছেড়ে অপরিচিত পথের প্রান্তে পরিণামহীন উদ্‌ভ্রান্ততায় ঘুরে মরেছে।

কখনো কুলি, কখনো শ্রমিক, কখান নাবিক হয়ে এক দেশের উপকুল থেকে অন্যদেশের উপকূলে—জীবনের বৃত্ত থেকে বৃত্তান্তরে ঘুরে ঘুরে নিভে গেল। একটা দারুণ উল্লাসে জ্বলে উঠেছিল। জীবনের এক অতিপ্রার্থিত মুহূর্ত যখন আসন্ন তখনই অন্ধকার নেমে এল।

আপনি জীবন সম্পর্কে কি ভাবেন জানিনে মঁসিয়ে। তবে আমার মনে হয়েছে একে নিয়ে কোন রকমেই কোন দার্শনিক সিদ্ধান্তে পৌছান যায় না। জীবনের বাঁকে বাঁকে এত আশ্চর্য ঘটনার সমাবেশ থাকে যা জীবনকে সকলের অনায়ত্ত এক অনির্দেশ্য পথের পথিক করে দেয়। আর আমাক নিজের জীবনেও দেখছি—অন্যের জীবনেও দেখছি। একটা ক্রূর অথচ কৌতুককর সামঞ্জস্য জীবনের প্রতি মুহূর্তকে অবজ্ঞা করে এক বিচিত্র সমন্বয় ও সমাবেশের সমুদ্রে হালভাঙা জাহাজের নাবিক করে রেখেছে।

জীবন সম্পর্কে লোকটির বিচিত্র দর্শনের কথা শুনে হাসলাম। কোন উত্তর দিলাম না, সে বোধহয় আমাকে লক্ষ্যও করল না। নিজের অতীত রোমন্থনের ভারে অত্যন্ত নিবিষ্ট ছিল। হয়তো পুরোন সেই দিনগুলোর মধ্যে একেবারে ডুবে গেছিল।

যাই হোক। পিপির সঙ্গী—আবার শুরু করল, প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমার কাছে অসহ্য মনে হচ্ছিল। একটা দারুণ ত্রাসের বিভীষিকা

আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। আজ ক্যাবারের এই আবহাওয়ায় সে কথা আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না।"

সমুদ্রের গর্জ্জন আবার বেড়ে উঠেছে। বোধহয় জোয়ার এল। বাইরে কোন সাড়া নেই। জানালার দিকে চোখ মেলে তাকাতে সাহস হচ্ছিল না। মৃত্যুকে কোনদিন এমন করে দেখিনি। তাই কল্পনার সমস্ত ভয় অশরীবী মিছিল হয়ে আমাব দিকে এগিয়ে আসছিল। তারা বোধহয় পৃথিবীর কেউ নয়। হিংস্র দাহের অপ্রাকৃত জ্বালা তাদের চোখে। জীবনের অন্যলোক নবক। সেখানকার অধিবাসী তারা। এই অপঘাত মৃত্যুর নায়ককে নিয়ে যাবার জন্যে মিছিল করে আসছে। তাবা হয়তো আমার পার্থিব অস্তিত্বকে সহ্য করবে না। হয়তো আমাকে দীর্ঘ নখে ছিঁড়ে টুকবো টুকবো কবে ফেলবে। তাঁদের নিঃশ্বাসের আগুনে মরে পুড়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবো।

আপনি বোধহয় জানেন ম'সিয়ে--মানুষ যখন অনুপায় তখন দ্বৈত সত্বা তাদের মধ্যে কার্যকরী হয়ে ওঠে। আমাব ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। আমার যে মন ভয় পাচ্ছিল তাকে সাহস দেবার জন্যে মনেব অন্য সত্বা একটু এসে দাঁড়িয়েছিল। আব তারই জোবে আমি তখনও সোজা হয়ে বসেছিলাম।

সেই আমাকে সাহস দিচ্ছিল, ভয় কি—আব একটু বাদেই আলো আসবে। কোন রকমে কাটিয়ে দাও এই সময়টা। রাতের এই অবশেষটুকু—

মনের যে সত্বা ভয় পেয়েছিল সে বলল, আলোয় যখন এই নৃশংসতা প্রকাশ পাবে তখন ?

কোন দিকে যাই।

ভয় আর আশংকা আমাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। স্নায়ুর উপর অসহ্য চাপ পড়ছে। ঝুঁকে পড়েছে আমার মাথা। তুলতে পারছিনে।

কখন আলোটা নিভে গেছে। তাও বুঝতে পারিনি। একটু আগে কি এখনি। চোখ বুঁজে বসেছিলাম। আর আলো জ্বালতে সাহস

হচ্ছিল না। সহসা বাইরের দিকে তাকিয়ে আমাব বুকের রক্ত হিম হয়ে এল। এক জোড়া নীল ইশাবা কোন অপ্রাকৃত সংকেতের বিজ্ঞাপনের মতো জানালার ওপারে স্থির ও নিবদ্ধ।

অলৌকিক বিহ্বলতায় আমি অচেতন হয়ে ডুবে যেতে লাগলাম। বোধহয় সংজ্ঞা হাবাতাম। হঠাৎ নিউ শব্দ কবে সেই ক্রুর আলো দুটো জানালাব ওপাশে নেমে গেল।

দারুণ একটা ত্রাসেব হাত থেকে উদ্ধাব পেয়ে আমি চেয়ার থেকে উঠতে গেলাম - হুমড়ি খেয়ে পড়লাম ডেওনেজের পায়েব ওপর। মনে হল সে যেন সমস্ত অবয়ব দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধবল। তারপর মনে নেই।

জ্ঞান ফিবতে দেখি ডেওনেজেব বুকের রক্তে আমার জামাকাপড় মাখামাখি। ডেওনেজেব মুখেব দিকে তাকালাম। বিবর্ণ মুখেব রঙ প্রায় মেহগ্নি কাঠেব মতো কালো হয়ে গেছে। চোখ দুটো ঈষৎ নিমীলিত।

কোনবকমে উঠে বসলাম। সাবা গায়ে ব্যথা।

জানালাব দিকে তাকালাম। আলোয় ছেয়ে গেছে। আবছা ছায়াপড়া আলো। পাংশু সূর্যেব আলো মেঘেব কিনাবায় বক্তপিঙ্গলে অপ্রাকৃত ও অনৈসর্গিক হয়ে উঠেছে।

পৃথিবী সম্পকে সজাগ হয়ে উঠলাম। আমার নিজের সম্পর্কে ঘোর নৈরাশ্য। তবু ভালো কেউ এখনো ওঠেনি। আমার নিজের জামা-কাপড় দিয়ে মৃত দেহটাকে ঢেকে দিলাম। তাবপর একটা তোয়ালে দিয়ে মেজেব ওপর থেকে ঘসে বক্ত তুলতে লাগলাম। এমন সময় কড়া নড়ে উঠল।

চেঁচিয়ে উঠলাম, অপেক্ষা করো।

তারপর নিজেকে কোন রকমে তৈরি করে দরজাটা অল্প একটু খুলে খেঁকিয়ে উঠলাম, এত সকালে কি দরকার?

হোটেলের ম্যানেজার সুপ্রভাত জানালেন।

আমিও উচ্চারণ করলাম, সুপ্রভাত। কিছু দরকার আছে ?

ম্যানেজার একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বন্ধু ?

জিজ্ঞেস করলাম, কেন ?

একটু দরকার ছিল।

এখনও ঘুমোচ্ছে।

ধন্যবাদ। পরে দেখা করতে বলবেন।

মাথা নেড়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। ম্যানেজারের মুখের ওপর। ব্যাপার একটু অপ্রকৃতিস্থের মতো হয়ে গেছিল। তা' হোক।

বুঝলাম আর দেরি করলে চলবে না। এই হত্যার দায়িত্ব থেকে আমাকে মুক্তি পেতে হলে দূরে সরে যেতে হবে। অনেক দূরে। মন্টিকার্লোর মাটি থেকে দূরে।

মন আর এক মুহূর্ত সেই ঘরে থাকতে চাইছিল না। ভেবে দেখলাম দেরি করা ঠিক হবে না। আমার যা সঞ্চয় ছিল পকেটে ভরে নিলাম। তাবপর জামাকাপড় পালটে ভেতর থেকে খিল দিয়ে দরজা টপকে নীচে নামলাম। তারপর সোজা পথে বেরিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলাম। কয়েকদিন পরে ভেসে উঠলাম প্যারিসে।

প্যারিসে ফিরে ট্যাক্সি ড্রাইভারি সুরু করলাম। পিপির সংগে আলাপ এই যাতায়াতের পথের ধারে। আলাপ ঘনিষ্ট হল। দেখলাম ও আমাকে ভালোবাসতে চায়। ওর সম্পর্কে সবটুকু জানিয়ে আমার প্রতি ওর মনের মমতার কথা জানাল।

সত্যি কথা বলতে কি মঁসিয়ে, ডেওনেজের মৃত্যুর পর জীবন সম্পর্কে আমার দৃষ্টি পালটে গেছিল। নিজের প্রতি এতটুকু মমতা ছিল না। যা রোজগার করতাম পথেই তার সবটুকু ব্যয় করে দিতাম। সেই সময়েই পিপির সংগে আমার দেখা। মনে হল কেউ যদি আমাকে ভালোবেসে খুসি হতে চায়—হোক না। আপত্তি কেন ? জীবনে তো আশা নেই। নিরাশাও নেই। সুখদুঃখ সব মিলে একাকার হয়ে গেছে। আলো-অন্ধকারের পার্থক্য বুঝতে পারিনে।

ম'সিয়ে, আপনি হয়তো মনে মনে ঘৃণা করছেন। মানুষের মুখে শুধু ঘৃণা দেখে হাসি পায়। জিজ্ঞেস করি, ঘৃণা করবার তুমি কে—কি অধিকার তোমার?

একটু থামলো সে। গলাটা ভিজিয়ে নিল। আমি সিগারেট এগিয়ে দিলাম।

জীবনে তো কত বিস্ময়ই ঘটে—এও তেমনি কিছু। এর চেয়ে বেশি কিছু মনে করবার হেতু নেই। জীবনে কি চেয়েছিলাম আর কি পেলাম—চাওয়া-পাওয়ার টানাপোড়েনের দুর্জ্ঞেয় নিয়তির খেলা। আজও ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি।

সে কথা ঠিক। কিন্তু তবু বলছি মনামি, কিছু মনে করবেন না। নতুন করে জীবনকে কি সুরু করতে পারতেন না? শুধু খানিকটা নৈরাশ্যের জন্যে জীবনের সুস্থ সম্ভাবনাকে অবশেষে অপচয় করে তুলছেন! সত্যি কি আপনি ফিরতে পারতেন না?

হয়তো পারতাম। ম্লান কণ্ঠে সে আমাকে সমর্থন করল। তারপর কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে সিগারেট টেনে যেতে লাগল। আমি ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। এক সময় লোকটা মাথা তুলল। তুলে আমার দিকে চেয়ে রইল। শেষ কথা বলল না। বুঝলাম নীরবতাই ওর কথা বলার ভূমিকা। লোকটি কিছু বলছিল না দেখে আমার যখন ধৈর্যচ্যুতি ঘটবার উপক্রম তখনই সে কথা সুরু করল। আর অনেকটা স্বগতোক্তি করার ভঙ্গীতে। সামনে যেন আমি নেই। কেউ নেই! এই ক্যাবারের গান—আলোর অলীক আয়োজন সবই যেন ওর চোখের সামনে থেকে মুছে গেছে। ও বলল, হয়তো পারতাম না। কেন পারতাম না সে কথা বলতে হলে আপনাকে সেই স্প্যানিশ মেয়েটির কথা বলতে হয় যাকে আমি নিজের হাতে খুন করেছিলাম। নৃশংসভাবে। আমার রিভলবারের ছ'টা গুলিই যার দিকে নিক্ষেপ করেছিলাম। তারপর টেনে নর্দমায় ফেলে দিয়েছিলাম।

লোকটা একটু থেমে জিজ্ঞাসা করল, ম'সিয়ের কি সময় হবে আর?

মাথা নেড়ে বলি, সুরু করুন।

সুরু করার আগে লোকটি শুধু একটি কথা বলতে চেয়েছিল, সে এক আশ্চর্য কাহিনী!

দরজার দিকে হঠাৎ তাকিয়ে সোজা হয়ে বসলাম।

মঁসিয়ে লঁা ক্যাবাবের হলে শেবরাতে একজন বাঙালী মহিলা হাজির কবেছেন। স্প্যানিশ মেয়েটিব গল্প আপাতত মুলতুবী রইল। বোধহয় আব কখনো শোনা হবে না।

পিপিব সঙ্গী ওদেব দেখে বিদায় নিল। এবং নিজের টেবিলে উঠে গেল। কখন পিপি ফিববে সেই প্রত্যাশায় বসে থাকা ছাড়া কোন কাজ ওব হাতে ছিল না। শবীব খাবাপ বলে সেদিন আর নাচতে নামেনি।

কিন্তু পিপিব মানুষটিব দিকে নজর দেবাব সময় ছিল না। যে পথ দিয়ে মঁসিয়ে ফিরছিলেন মহিলাটিকে নিয়ে সেই পথের দিকে তাকালাম? কাছাকাছি আসতে উঠেও দাড়ালাম তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে।

তুজনে টেবিলেব সামনে এসে দাঁড়াল।

সসম্মানে অভিবাদন জানালাম। মুখে বোধহয় একটু স্মিতহাসি ফুটেছিল। মহিলাটিও হেসে প্রত্যুত্তব দিলেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত কেউ একটিও কথা বলিনি। মঁসিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে নীববে সিগাবেট টেনে যাচ্ছিলেন।

আপনাকে এখানে প্রত্যাশা করিনি। অবশেষে আমি নীরবতা ভাঙলাম। এবং বাংলা ভাষায়।

কেন?

ফরাসী ক্যাবাবে বাঙালী মহিলার উপস্থিতি কি খুবই বিস্ময়কর নয়।

পৃথিবীতে বিস্ময়েব কিছু আছে নাকি? আমার শৈশবেও কি ভাবতে পেবেছিলাম জীবনের এই পরিণাম আমার নিয়তিতে লেখা—

সেজন্যে নয়। আমি ভাবছি সুদূর বাংলা থেকে এসে কেমন করে

এই পাপের চাকায় জড়িয়ে পড়লেন।

আমার ভাগ্য!

আমরা বোধহয় বসেই কথা বলতে পারি। ম'সিয়ে লাঁ আমাদের কথার মাঝখানে নিজেকে এগিয়ে দিলেন।

ওঃ, হ্যাঁ—হ্যাঁ, বসা যাক। আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম, বসুন—বসুন, আমি নিজেকে অপ্রতিভ ভাবি।

দুজনে মুখোমুখি বসলাম। ম'সিয়ে লাঁ আমার পাশে। বসেই মনে হল, ভাগ্য! ভাগ্যই বটে। না' হলে যে অরুণবসনা অনিন্দ্য নারী ভাগ্যবানের গৃহ আনন্দিত করতো – যে বক্ষের সঞ্চিত স্নেহ স্বামীপুত্রের কল্যাণে প্রবাহিত হত—যে বাহু অহরহ অবিরত বিপন্নে সম্পদে নিজের সংসারকে শ্রী দিয়ে শান্তি দিয়ে লাবণ্যে অভিসিঞ্চিত করত সে কেন মরুপথে হারালো!

বিচিত্র জীবন!

বাইরে কপিকাসের পাতায় দক্ষিণ সমুদ্রের ঢেউ।

এত ঋজু আর সাবলীল চেহারা সাধারণত বাঙালী মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় না। তা'ছাড়া চেহারায় বসনে বিন্যাসে ফরাসি মেয়েদের স্নুমিত প্রসাধনের আর্টিষ্টিক নিপুণতা। নখরগুলিতে উজ্জ্বল পলাশপাপড়ির মত আঙ্গুলগুলি একগুচ্ছ কিংশুকের মতো এলিয়ে আছে। খোঁপায় জার্মিনো রোজের অস্ফুট কুঁড়ি।

আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম! কী সৌষ্ঠব! কী শালীন দেহরুচি!

ম'সিয়ে লাঁ বললেন, মুগ্ধ হয়ে গেলেন নাকি?

যাঃ। ছোট ছেলের মতো কপট অন্ধকার আমার মুখে রক্তাভ হয়ে ওঠে। মনে মনে বলি, হে অনিন্দ্যা, তোমাকে দেখে সম্রাটও দাসখৎ লিখে দেবে আমি তো সামান্য।

তার সোনালি সুতোর কাজকরা সাদা ব্লাউজের ওপর চুনীপান্নার সমাবেশ অলৌকিক হয়ে উঠেছে।

কি দেবে আপনাকে ? সবিনয় নিবেদন করলাম।

হুইস্কির সংগে 'জন মিশিয়ে দিতে বলুন। শান্ত তার গলার স্বর। ক্যাবারের বেয়ারাকে ডেকে অর্ডার পেশ করবার আগে মঁসিয়ে লাঁ অর্ডার পেশ করলেন।

আপনাদের সময়টা কি এখানে কাটবে—না, বাইরে কোথাও যাবেন ?

এখানেই বসবো ভাবছি! মঁসিয়ে লাঁর মুখের দিকে তাকালাম। দেখলাম তিনি নিমীলিত! সেই অবস্থায়ই বললেন, আপনার যা অবস্থা ফেলে গেলেও আশ্চর্য হবো না।

এর জন্যে বেশি চার্জ করবো না। বিগলিত হাসির প্রবাহ ঠোঁটের কানায় টলটল করে।

দেখলাম ল্যা মিল্যুর শিক্ষা বেশ ভালো করে রপ্ত করেছে।

আপনার নামটা জানতে পারি কি ?

নিশ্চয়ই—। একটু থামল সে তারপর বলল, না থাক—

কেন ? আপত্তি কিসের ? আমি জিজ্ঞাসু হলাম।

হাসল সে একটু, সে সব পুরোন স্মৃতি ঘেঁটে লাভ কি···সে নাম—সে মানুষের কতটুকু আর অবশিষ্ট! খেদ শোনা গেল মহিলাটির কণ্ঠে।

তা' হলে থাক। আমি তাকে থামিয়ে দি, হৃদয়কে কষ্ট দিয়ে কৌতূহল মেটানোর সাধ আমার নেই।

বললে কিছু ক্ষতি নেই। তবে আমার নিজেরই ভালো লাগে না। ইচ্ছে ক'রে ভুলে যেতে চাই।

আপনাকে দুঃখ দেবার জন্যে লজ্জিত। মাপ করবেন। একজন বাঙালী মহিলার উপস্থিতি শুনে কৌতূহলকে কিছুতেই দমন করতে পারিনি। মঁসিয়ে লাঁ আপনাকে ডেকে এনেছেন শুধু আমার কৌতূহল মেটানোর জন্যে।' অন্য উদ্দেশ্য নেই। আপনাকে দেখে বিস্ময় মানছি। আশ্চর্য লাগছে।

ভদ্রমহিলা কোন উত্তর দিলেন না।

আমি উৎসাহভরে বলে চলি, আপনি বলুন ম্যাডাম, আপনাকে এ অবস্থায় দেখে যদি আশ্চর্য হই—তাতে কি আশ্চর্য হবার কিছু আছে? কোথায় বাংলা। পৃথিবীর এক কোণে ছোট্ট একটা দেশ। সেখান থেকে কি করে ছিটকে পড়লেন কে জানে। ভাগ্যের কোন পরিহাস আপনাকে এখানে ঠেলে দিয়েছে সেইটুকুই জানবার বাসনা।

অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন সেই মহিলা। আমি পাশ ফিবে দেখলাম ম্ঁসিয়ে ল্ঁা-র মুখ চিমনির মত ধেঁায়া ছেড়ে যাচ্ছে।

সে কথা এখানে বসে তো হতে পারে না। এখানে আমাকে রোজগার করতে হয়। আপনাদেব সম্মানের জন্যে নিজের ইচ্ছে থাকলেও ম্ঁসিয়ে আলবেঁয়া বোধহয় অনুমোদন কববেন না। আসুন না একদিন আমার ম্যানসনে। কালই আসুন। আপত্তি আছে?

না না। আপত্তি কিসের?

ঠিকানাটা দিলেন ম্যাডাম।

ওয়েটার টেবিলে ওয়াইন কাস্ক বেখে গেল। সাদা জার্মান মদে ভরা। মহিলার সম্মানের জন্যে ম্ঁসিয়ে ল্ঁা অর্ডার দিয়েছিলেন।

হার গ্রেস ডাচেস অব নাইট ইন প্যারিস নিজেই অনুগ্রহ করে টেরাকোটা কাঁচের অস্বচ্ছ ওয়াইন গ্লাস পূর্ণ করে দিলেন।

আমি মনুর সন্তান, দ্রাক্ষারসের চেয়ে আদমের মদের প্রয়োজনীয়তা বেশি কবে অনুভব করছিলাম।

ওয়াইন বিস্কিটগুলো কেউ হাত দিয়ে তুলল না। আমি মাঝে মাঝে দু'এক সিপ টেনে ওদেব সংগে সমতা রাখছিলাম।

পরিপূর্ণ বাত্রি।

বোধহয়—Haply the queen moon is on her throne আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখিনি।

ম্যাডামেব যৌবনেও সোনালি আলস্যের রঙ ধবেছে।

স্বর্ণ পালঙ্কেব শিথিল আকাঙ্ক্ষা তাঁর অবয়বে। চোখের কোকনদে

গভীর কালোছায়া, সে কি ঘুমের স্নিগ্ধ লিখন না অন্য কিছু? ঈশ্বর জানেন!

না। আমি নিজের মনে প্রতিবাদ করি। নিজেকে বলি, তুমি জানো না? বোকা কোথাকার! নিজেকে ফাঁকি দিচ্ছ—

হয়তো তাই।

হয়তো তাই সত্যি!

রাত্রির উর্বশী প্যারিস আমাকে আকর্ষণ করছে তার রূপসী অবয়বের আকাঙ্ক্ষায়। অথচ জানি এই হীরামুক্তা মাণিক্যের ঘটা—চোখের দিগন্তে ইন্দ্রধনুচ্ছটা সব খোয়াব!

ইচ্ছে হল চেঁচিয়ে উঠি, সব ঝুটা—সব ঝুটা হায়—কড়া জার্মান মদের নেশা ধরেছে আমার। চোখ জড়িয়ে আসছে। অস্ফুট হিজি-বিজি চিন্তাগুলো ক্রমশ সজীব হয়ে উঠছে!

ম্যাডামের মুখে মিশরের স্বেচ্ছাচারিণী ক্লিওপেট্রার ছায়া। যে নারীকে পুরুষ চিরকাল কামনা করেছে তার দু'বাহুর মধ্যে—যাকে সংসারের শান্তি—সন্তানের মা—চিরজীবনের সংগিনী হিসেবে নয়, যাকে পেতে চেয়েছে যৌবনেব সুরসভার স্বয়ম্বর উৎসবে। সেখানে অতীত অন্ধকারে লিপ্ত —ভবিষ্যৎ অনুদ্দেশ; শুধু বর্তমান-সমস্ত সমা-রোহ নিয়ে সমীপবর্তী।

মাথাটা নড়ে উঠল। অসহ্য ভার মনে হচ্ছে। নিজের উপর নিজের শাসনও শিথিল হয়ে উঠছে। ইচ্ছে করছে···। সিজেই আবার ভাবছি কি আশ্চর্য বাসবদত্তার সঙ্গ কামনা করছি। আমার এতদিন-কার রুচি শালীনতা সবই কি তলিয়ে যাবে!

তবু মনে হল রাত্রিব ঐশ্বর্য এই নারীর অবয়বে। একে আজকের উৎসবে আমার প্রয়োজন।

হাত বাড়িয়ে দিলাম তার দিকে।

এর অর্থ ভয়ঙ্কর। আজ রাত্রে তার সঙ্গে বাসর যাপন করব। মহিলাটি উঠে আমার হাতে চুমু দিল। আমিও তার হাত তুলে নিলাম বুকে।

মহিলা এগিয়ে এসে আমাকে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, আপনার বোধহয় খুব নেশা ধরেছে। একটু চোখ বুঁজে থাকুন।

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন মঁসিয়ে লাঁ। এবং এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে ফেলেছেন।

উঠুন।

উঠে দাঁড়ালাম। নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারছিলাম না। মঁসিয়ে লাঁ পকেট থেকে টাকা বের করে দিলেন মহিলাটির দিকে। একবাব আমার দিকে তাকিয়ে তুলে নিল সে।

আমি হাসলাম। প্রথমে আস্তে। তারপর জোবে। তাবপর ক্রমশ একটানা।

মঁসিয়ে বললেন, শুভরাত্রি।

কাল কি আসছেন আমার ম্যানসনে ?

সম্ভব। মঁসিয়ে লাঁ আমাকে ও-ব হাতের মধ্যে ধবে বেখেছেন।

শুভবাত্রি। মহিলাটি আমাব দিকে চেয়ে বইলেন। মঁসিয়ে লাঁ-ব কাঁধে ভব দিয়ে এগিযে গেলাম কার্পেটেব ওপব নিঃশব্দে পা ফেলে।

যেতে যেতে মঁসিয়ে লাঁ-ব দিকে মুখ তুলে বললাম, কাল যেতে হবে। কি বলেন মঁসিয়ে ?

নিশ্চয়ই। মঁসিয়ে লাঁ আমাব পিঠ চাপড়ে বললেন, আমি বুঝতে পারছি আপনি ওকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন।

মঁসিয়ের দিকে চেয়ে হাসতে গেলাম। পারলাম না। মাথা আবো ঝুঁকে পড়ল।

কথা দেওয়া ছিল বটে যাওয়া হোল না। মঁসিয়ে লাঁ নিষেধ কবলেন। বললেন, থাক। কি হবে গিয়ে বলুন ? ওদের ইতিহাস প্রায় একই রকমের ববং চলুন আজ সন্ধ্যেয় ও * জায়গায় এ ব্যবসার আর একটা রূপ দেখিয়ে আনি। প্যাবিসেব সভ্যতা সংস্কৃতি কি ভাবে

দেহব্যবসার উপর মনোহরণ আবরণ দিয়েছে সেটা বোধহয় আপনার পর্যবেক্ষণের পক্ষে উপাদেয় হবে।

মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। মন আর একবার তাকে দেখতে চাইছিল। সেই সৌন্দর্যের জন্য চোখের তৃষ্ণা আকুল হয়ে উঠেছিল। কাল রাতেব আকস্মিক বিভ্রান্তি আমাকে যে বেসামাল করে দিয়েছিল তার জন্যে মনে যেন একটু লজ্জার অবশেষ ছিল। তাই ভাবলাম বোধ-হয় ভালোই হল। হ্যাঁ, ভালোই হল। আমাদেব এই না-দেখা চিবকালেব জন্যে স্থিব হযে যাক।

মনের মধ্যে একটু যেন বেদনা বোধ করলাম। কি সে বেদনা? কেন এ বেদনা। মনকে বিশ্লেষণ কবে বারবার এ প্রশ্নের উত্তর চাইলাম। মন নিজের মনে মনে বলল, মন কি বিচিত্র!

আভেন্যু ত্ব অর্লিয়েন্সের একটা ক্যাথে গিয়ে বসলাম তুজনে সন্ধ্যেবেলা। বাতেব ভোজন পর্বটা এখানে সেরে ফেলব। এই বাসনা। এখানকাব খাবাবেব উৎকর্ষতার লোক প্রসিদ্ধি আছে। মেনুব কার্ডটাও অনবদ্য লিটাবেচার।

মেনুব ওপব চোখ বুলিযে গেলাম। হাঙরেব পাখার সঙ্গে চিকেন-জুস মিলিযে কতো রকমেব খাদ্য তৈরি হয়েছে। কোনটার সংগে আমণ্ড মেশানো, কোনটায় এ্যাসপাবাগাস-এর প্রিপারেশন।

সুদূব ইন্দোনেশিয়া থেকে পাখির বাসা নিয়ে গিয়ে নানারকম প্রিপারেশন-এর উপাদেয় পদে পরিণত করা হয়েছে। সোনালি ব্যাঙ, শূয়োবেব মেটে এ সব তো খাদ্য তালিকার উপরের কোঠায় পড়ে।

আর এই সব অদ্ভুত খাদ্য তালিকার মধ্যে বিচরণ করে আমি প্রায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ম'সিরে ল' আমাকে উদ্ধার করলেন। ক্ষীরমী-বাম্বুমধ্যাৎ-এব মতো তিনটি আইটেম বেছে নিয়ে অর্ডার প্লেস্ করলেন।

প্রথমে মস্কেলিসের লবষ্টার প্রিপারেশন। লবষ্টার বল, লবষ্টার চিকেন, লবষ্টাব এ্যাসপারাগাস। মাঝখানে আপেলসিদ্ধ আর মধু শেষে মিষ্টি ভাবমুখ।

মাঝে সেই মেয়েটির কণ্ঠ থেকে ট্রেণের তীক্ষ্ণ হুইসিলের মতো একটা শব্দ বেরিয়ে আসছে। সেও বিচিত্র তরঙ্গিত।

দেওয়ালের কাছ থেকে সরে এলাম।

পাশের আর একটা হল ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। হলটা নাচের জন্য নির্দিষ্ট। একটা চেয়ার টেনে বসলাম। বেয়ারা পানীয় নিয়ে এল। এখানে পরিষ্কার আলোর নীচে বসে পুরুষ নারীরা বিমুগ্ধ প্রেমের কথোপ-কথনে ব্যস্ত। মুখে বসন্তের সবুজ পাতার মতো মায়াবী হাসি। হৃদয়ে কি ছিল জানি না।

একটু দূরে আবছা অন্ধকারে বাজিয়ের-দল সমবেত ঐকতানের সুরস্রোতে হলকে পূর্ণ করে রাখছে। এক মুহূর্তে তাদের বিরাম নেই; বিরতি নেই। বোধহয় জীবনের এমন এক মুহূর্ত পৃথিবীর কানে অন্য কোন শব্দ আসতে দেবে না। হৃদয়ে কোন চিন্তার স্রোত উৎসারিত হতে দেবে না।

সেই জন্যেই বোধ হয় তাদের বাজনায় যতি নেই। গতি আছে। শুধু এ ঘরের চারদিকে একবার দৃষ্টি ফেলে দেখে নিলাম। সেই পুরোন পরিচিত রঙকরা চুলের বিবর্ণ মুখের মহিলা দল। অল্পবয়সী মেয়েরাও আছে। আর আছে ঠাকুর-মার বয়সী মহিলারা। তাদের অঙ্গে পোষাকের স্বল্পতা অত্যন্ত লক্ষ্যণীয়। মাথায় নৈশটুপি। সারাটা মুখ এমন করে রঙকরা যেন আফ্রিকার অদৃষ্টপূর্ব কোন উপজাতির কেউ। তারা এমন করে তাকাচ্ছে আর নাচছে যাতে হলঘরে আগন্তুক প্রত্যেক পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

আমি উঠে সেই বর্ডেলোর অন্য একটা ঘরে গেলাম। ঘরটার দেওয়াল পোর্ট ওয়াইনের মত ঘন লালে-কালোয় মেশানো। সেখানে একটি মহিলা (আঁটসাঁট পোষাক পরা, পায়ে সোনালি কাজ করা কালো চটি) আমার দিকে আধখোলা চোখে তাকালো। হঠাৎ তার গায়ে একটা আলোর বৃত্ত এসে পড়ল। আর সেই আলোর বৃত্তে তার দেহের প্রতিটি প্রত্যঙ্গ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার চোখ, ঠোঁট, কান—

কানের রত্নভূষণ ক্রমশঃ আমার চোখে ধরা দিতে লাগল। এমন কি তার ভেলভেটের মতো কালো চুলের রাশির ওপর সেই আলো পড়ে আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিল।

সেই মেয়েটির পেছনে আমি যেন একটি অশরীরী কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। অত্যন্ত মৃদু, পরিষ্কার এবং সুমিষ্ট। ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম ওর পেছনে আরো একজন আছে। যাকে আমি এতক্ষণ আবিষ্কার করতে পারিনি। যুবতীটি দেখতে অনেকটা বালকের মত। তার চুল ছোট করে কাটা আর ফুলিয়ে মাথার উপর একটা মে-স্পিঙ্ক ফুলের মত সাজানো। সে তার পালকের মতো হালকা শরীর নিয়ে লাল রঙের হীল তোলা জুতো পরে হাঁটছিল। এক একটা পা যখন সামনে এগিয়ে দিচ্ছিল আলো পড়ে জুতোর উপরের নক্সার পাথরগুলো জ্বলজ্বল করছে।

সে তার সঙ্গীকে ফিসফিস করে কিছু বলল। দুজনে হাসি বিনিময় তারপর তারা নাচের ভঙ্গীতে ইশারা করে আরো দূরে চলে গেল। আমি ওদের একজনের জামায় দেখলাম শুধু ঠোঁটের ছাপ। আর সাদা জ্যাকেটে সেই ছাপটা অদ্ভুত একটা প্যাটার্নের সৃষ্টি করেছে।

এমন সময় পিঠে কার হাতের স্পর্শ পেলাম। দেখি স্মিত মুখে একজন সুন্দরী দাঁড়িয়ে আছেন। চিনি নে। আগে কখনো দেখিনি। জিজ্ঞাসু হয়ে তার মুখের দিকে তাকালাম।

আপনি বিভ্রান্ত। তাই আপনাকে সাহায্য করতে এলাম।

তাই নাকি ?

মাথা নাড়ল সে।

কি ধরণের সাহায্য আপনি করতে পারেন ?

এখানে নবাগতের দল চারদিকে আয়োজন দেখে স্বতই বিহ্বল পড়ে। চারদিকেই স্বর্গের হাতছানি। কোন ঘরে যে স্বর্গের সিঁড়ি সেই কথাটি বুঝে উঠতে পারে না। আসুন আমার ... স্বর্গের অনুসন্ধানে এখানে এসেছেন সেই 'গার্ডেন অব ...

আপনাকে পৌঁছে দেব।

সত্যি? আমি যেন একটু ব্যঙ্গ করতে চাইলাম। অথচ বুঝে উঠতে পারলাম না সত্যি কি বলতে চায় আগন্তুক মহিলা।

সত্যি! সেও আমার কথার প্রতিধ্বনি করল। সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত ধরে ফেলল। তারপর হঠাৎ-ই ঠোঁটের উত্তপ্ত স্পর্শ দিয়ে বলল, মনামি চোখ বন্ধ করে আমার সঙ্গে এসো। ভয় কি তোমার হাত তো আমি ধরে আছি।

তার বুকের উপর রসপুষ্ট আঙুরের গুচ্ছ দোলা খাচ্ছে। মাঝে মাঝে টোল পড়ছে তার গালে। ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে মনে মনে আমিও মূর্ছা যাই যেন। তার ব্লণ্ড করা সোনালি চুলে হালকা রঙের প্লাস্টিকের ফুলটাও মনোরম ভাবে কাঁপছিল।

না থাক।

কেন প্রিয়তম? ততক্ষণে সে আমার খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

এমনি।

সে কি?

স্বর্গটা আমাকেই খুঁজে নিতে দাও। আর সেই ইডেনে যদি তোমাকে ইভ হিসেবে পাই তবে আমার আদম হওয়া সার্থক বলে মানব। আমার নিজের শক্তিতে আমার বিশ্বাস আছে। দুপাশের ছড়ানো স্বর্গের মধ্যে আসলটাকে খুঁজে নিতে চাই। কিংবা এও হতে পারে তুমি তোমার স্বর্গের ঠিকানা রেখে যাও, ক্লান্ত হয়ে পড়লে তোমার কুঞ্জেই রাত কাটাব সখি।

হতাশ হয়ে মহিলা আমার দিক থেকে ফিরলেন। অনেকটা সময় ব্যর্থ হল ভেবে অন্য কোন আদমের অন্বেষণে চললেন। এমন ব্যর্থ হওয়া স্বভাবতই ওদের ধাতে সয় না। এখানে যারা আসে তারা তো এমন করে অনুনয়কে ব্যর্থ করতে পারে না!

পেছন ফিরতেই দেখি মঁসিয়ে লা দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে মৃদু হাসি।

কী ব্যাপার ? আমি ওর হাত ধরে জিজ্ঞাসা করি।

কী নিষ্ঠুর আপনি ! ম'সিয়ে ল'া হাসলেন। এত কোমল বিহ্বল অনুরোধ মিথ্যে হয়ে গেল আপনার হৃদয়ের প্রাচীরে ঘা খেয়ে, আশ্চর্য ! এখন চলুন —। হাত ধরে অন্য দিকে টানলেন তিনি।

আমি আবৃত্তি করলাম, ম্লান হয়ে এলো কণ্ঠে মন্দার মালিকা !

একটু আড়ালে নিয়ে ম'সিয়ে ল'া আমাকে একটা কালো পরিচ্ছদ দিয়ে বললেন, পরে ফেলুন। আমিও পরছি।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, একি ?

এবার যেখানে যাবো সেখানে সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ফুর্তি করতে আসেন। সমাজের তারা মাথা। সমাজের নৈতিক শৃংখলার সামঞ্জস্যকে তারাই বলবৎ করে রাখেন। তা' বলে নিজেরা তো সেন্টপল—

আমি বাধা দিয়ে বললাম, আমাদের ভাষায় বলতে গেলে ঋষ্যশৃঙ্গ বা শুকদেব ঠাকুর নয় যে জীবনের স্বাদ আহ্লাদ সব সেফ-লকারে ডিপোজিট দিয়ে রেখেছেন। তাই গভীর নিশীথে পরিচয় লুকিয়ে এখানে হাজির হন।

ঠিক তাই। ম'সিয়ে ল'া পিঠ চাপড়ে দিলেন, চলুন সেখানেই যাবো। অবশ্য অন্য কোথাও নয়। এই বাড়িরই অন্য অংশে।

দুজনে ঘোর কালো পরিচ্ছদ পরে নিলাম। মুখেও মুখোস লাগালাম। শুধু চোখ দুটো খোলা রইল। সেই কাপড়ের ফাঁক দিয়ে আমরা দুজনে দুজনের দিকে তাকালাম। ম সিয়ে ল'ার চোখের ধূসর তারা কালো সিল্কের কাপড়ের অভ্যন্তরে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দুজনে দুজনের সঙ্গে হাণ্ডসেক করলাম।

এ পোষাক পেলেন কোথা থেকে ?

এখানেই ভাড়া পাওয়া যায়। ম সিয়ে ল'া উত্তর দিলেন।

চলুন কোথায় যাবেন। আমি তাড়া দিলাম ম'সিয়ে ল'াকে।

একটু অপেক্ষা করুন। দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালেন ম'সিয়ে ল'া। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একজন মহিলা

অভিবাদন জানিয়ে স্বাগত করলেন।

তার সংগে আমরা একটা সরু গলি-পথ দিয়ে হাঁটতে শুরু করে দিলাম। আমার মনে হল দুটো আলাদা বাড়ি। একটা পথ দিয়ে জোড়া। পরিষ্কার অথচ ঈষৎ আলোকিত পথ ধরে আমরা পথের শেষে একটা ছোট অথচ সুন্দর একটা ঘরে গিয়ে পৌঁছলাম। ঘরটা তখনো ফাঁকা। অবশ্য কাছাকাছি পায়ের হাঁটাচলার শব্দ এবং কথাবার্তার ফিসফিসানি শুনতে পাচ্ছিলাম। শব্দগুলো যেন ক্রমশ কাছাকাছি এগিয়ে আসছিল। আমি তো থেমে দাঁড়িয়ে গেলাম। ভাবলাম বোধহয় পথেব শেষে এসে গেছি। অন্যমনস্ক ম ঁসিযে ল ঁাও থেমে গেছিলেন।

মহিলা তাড়া দিলেন, থেমে পড়লেন যে?

আরো যেতে হবে নাকি? আমি যেন বিরক্ত হলাম। কোথা থেকে কোথায় এসে হাজির হলাম।

আব একটু। অনুগ্রহ করে আর একটু আসুন। মহিলাটি সবিনয় নিবেদন করলেন।

অবশেষে সেই ঘব এবং আবো খানিকটা রাস্তা পার হয়ে আমরা একটা বড়ো দবজার সামনে গিয়ে হাজিব হলাম। দরজাটা যখন খোলা হল, দেখলাম সম্পূর্ণ অন্ধকার। সেই অপরিচিত অন্ধকারের মধ্যে অশরীবী কথাব দূরাগত গুঞ্জনেব আভাস পেলাম। ' উকে দেখতে পেলাম না। ম ঁসিয়ে লা এবং আমি পরস্পর হাত ধরেছিলাম, এ কোথায় এলাম। এ কোন অন্ধকারে? সেই আলোকিত আনন্দের দেশ থেকে এ কোন এলাকায় এলাম। দূর থেকে ছেড়ে আসা ঐকতানেব নাচের বাজনা আমাদের কানে কেঁপে উঠছিল. মঁসিসে ল ঁার মুখেব দিকে তাকিযেও তাকে দেখতে পেলাম না। জানি না মঁসিয়ে লাঁ কি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। বলতে গেলাম, মঁসিয়ে—

হাত দিয়ে ইশারা করলেন, চুপ কর॰॰।

আমাদের গাইড মহিলারও কোন সাড়া পেলাম না। চুপ করে

দাঁড়িয়ে রইলাম। নতুন কিছুর প্রত্যাশায়। একলা থাকলে কি করতাম জানিনে। সঙ্গে মঁসিয়ে লাঁ। মিস গাইড। বোধহয় মিসগাইড করবার জন্য।

হঠাৎ বাতাসে একটা কামাতুর বিহ্বলতার প্রশ্ন শুনতে পেলাম। সেই অন্ধকার ঘরের কোথায় যেন ফুলের গায় মৌমাছির ছোঁয়ার মতো একটা আলতো প্রশ্ন ভেসে এল। মহিলার কণ্ঠ শুনতে পেলাম· এখনো সময় আছে—কথাটা এতো আস্তে আর এতো মোলায়েম মৃদুতার সঙ্গে উচ্চারিত হল যে সবটা ভালো করে বুঝতে পারলাম না। এক-একবাব অন্য ঘর থেকে উত্তেজিত গানের সম্মেলক ভেসে আসছিল।

সেই সময় একটা সংকেত বোধহয় সেই বিশাল ঘরের কোন কোণ থেকে ভেসে এল। চড়া সুরের একটা গান। উচ্চকিত। একটু বুঝি কর্কশ। কিন্তু তার মধ্যে একটা ঝড়ের বেগ আছে যা রক্তে উন্মাদনা এনে দেয়।

আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। মঁসিয়ে লাঁর কাঁধে কাঁধ ঠেকে গেল। কিন্তু হঠাৎই সেই গানের মৃত্যু হল। যেমন চমকে উঠেছিল তেমনি নৈঃশব্দের মাঝে মৃত্যু হল। তখনো আমরা সেই অন্ধকাব দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছি!

আবাব ফ্রেঞ্চ হর্ণ বেজে উঠল। সেই বাজনার মধ্যে একটা দুর্দমনীয় আহ্বান ছিল যা আমাদের হৃদয়কে এক আশ্চর্য বাসনায় পূর্ণ কবে দিল। কিছু বন্য বাসনা আর উদ্বিগ্ন কামনা। কি নামে যে একে ডাকি!

মঁসিয়ে লাঁ কানেব কাছে ফিসফিস করলেন, কেমন লাগছে?

বেশ দুঃসাহসিকতায় ভরা। রোমাঞ্চকর!

দু:খ হচ্ছে না তো এসেছেন বলে?

দুঃখ! আমি আশ্চর্য হলাম, এ শব্দটা তো আমি ভাবিনি!

ব্যাপারটা একটুখানি ধাঁধাঁর মতো কিনা তাই—

ব্যস্ত হবেন না মঁসিয়ে লাঁ। দুঃখের কোন পরিচয় অবশ্য এর মধ্যে নেই, যদি থাকতো তাতেও দুঃখিত হতাম না। যাকে জানতে চাই তার

জন্যে এটুকু দুঃখ আমার সহ্য হবে। আপনি মিথ্যে ব্যস্ত হবেন না।

আবার বেহালা বেজে উঠল। চড়া নিখাদে কেঁপে উঠছিল। তারি মাঝখানে এক-একবার ভেরিটা বেজে উঠে থেমে যাচ্ছিল। শব্দটা অনেকটা যেন জাহাজের হর্ণের মতো। কুয়াশাচ্ছন্ন সাগরের মাঝখানে অনেকটা প্রাণের স্পন্দনের মতো—বেহালার কোমলতা তালের পর্ব ও মাত্রাভেদের মতো উচ্চারিত হচ্ছিল। শেষবারে হর্ণটা একটা মাতাল ঝড়ের মতো বেজে উঠল। কিছুক্ষণ সব চুপচাপ কোন শব্দ নেই।

তারপরই সুরু হল নাচের বাজনা। আলতো ধ্বনিগুলো পাখির মতো অন্ধকারে উড়ে যাচ্ছিল। তারা সব সিন্ধুপারের পাখি। সিন্ধুপারে যায় উড়ে।

আলো জ্বলে উঠল। আমাদের সামনে সেই 'গাইড়' মহিলা নেই। তার বদলে দুজন সুন্দরী হাতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মুখ মুখোসে ঢাকা। তার ওপর সোনালি সংকেত লেখা আছে। অন্যদিকে দেখলাম আর একজন মহিলার মুখোসের ওপর চাদ আকা। তরুণ চাঁদ। বাহুতে একজন প্রবীণ চন্দ্র।

দেওয়ালের গায় একজন দাড়িয়ে আছেন তার ছদ্মবেশটা পাখির মত। তাকিয়ে দেখলাম। দেখে মনে হল রাজহংসের মতো, সৌন্দর্যে অনতুল। রাত্রির এই নেভা লেকের তীরে এসে নেমেছে। তার চোখের মণি দুটো মুখোসের ভেতর থেকেও অস্বাভাবিকভাবে জ্বলছে। সে যটি বোধ হয় কারো দিকে চেয়ে দেখছিল। বাইরের ঘর থেকে ঐকতানের স্রোত ভেসে আসছে। কী উদ্দাম! কী বন্য! হৃদয় যেন চঞ্চল চৈত্রের স্রোতে উন্মনা হয়ে যাচ্ছে। হে হৃদয়, ধৈর্য ধারণ করো!

অর্কেস্ট্রায় নতুন সুর উঠল। বেহালা মাঝে মাঝে বেদনায় ভেঙে পড়ে আবার ক্ষিপ্র সুর তুলে আনন্দকে ঘন করে তুলছে। এতক্ষণে আমরা ঘরে ঢুকলাম। ছদ্মবেশের তলায় দুজনে ঢাকা পড়ে আছি। নিজেরাই কেউ কাউকে চিনতে পারছি না। শুধু আমাদের কপালে মাছের সংকেত পরিচয়পত্র হয়ে জ্বলছে।

আমরা এগারোজন পুরুষ ও ন'জন মেয়ের পর ঢুকলাম। চমৎকার সেলুন। যেমন নিভৃত তেমনি মনোরম, এবং আলোক নিয়ন্ত্রিত। ঘরের মধ্যে কেউ নাচছিল। কেউ কথা বলছিল। ঘরে ঢুকে বেহালা বাজিয়েকে দেখলাম। লম্বা লালচুলো মানুষটি নিবিষ্ট হয়ে বাজিয়ে যাচ্ছে। পাশেই পিয়ানো বাজাচ্ছে সুন্দরী একটি মেয়ে। আবছা অন্ধকারে ওদের মুখ ঢাকা। তবু দেখতে কিছু কষ্ট হয় না।

মঁসিয়ে লাঁ এতক্ষণ আমার কাছ থেকে দূরে ছিলেন। এবার কাছে সরে এলেন। এবং আমাকে ওয়াকেবহাল করবার জন্যেই বললেন, যে সব নারী পুরুষ এখানে মজা লুঠতে এসে জমেছে সমাজের কোন না কোন ক্ষেত্রে তারা প্রতিষ্ঠিত। এদের মধ্যে কলেজে পড়া মেয়ে থেকে ঘর সংসারের গৃহিনী, সন্তানের মা সবাইকে পাবেন। তেমনি হয়তো কোন চার্চের বিগতপ্রায়-যৌবন বিশপ, পাবলিক স্কুলের প্রিন্সিপাল, কোন বড় কোম্পানীর হাই এক্সিকিউটিভ, এছাড়া তরুণ কবি সাহিত্যিক শিল্পী এঁরা তো আছেনই।

মানুষের মনের মধ্যে একটা আদিম উদ্দামতা আছে; সে সংসারের কোন বিধি নিষেধ মেনে চলতে চায় না। সে তার ভালোলাগাকে প্রশ্রয় দিয়ে নিজের হিসেব মতো চলতে চায়। কিংবা এও হতে পারে সমাজের বিধি-নিষেধ মেনে চলে মন একঘেয়েমিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। বাইরে কোথাও খাঁচা থেকে ছাড়া-পাওয়া পাখির মতো নিষিদ্ধ ফলের আনন্দ পেতে চায়। তাই এরা এখানে এসে জমেছে। এর মধ্যে অনেকেই অনেকের চেনাশোনা। তবু ছদ্মবেশের তলে নিজের অস্তিত্বকে লুকিয়ে রেখে আবার সমাজে ফিরে যেতে যায়। ছদ্মবেশের আড়ালে থেকেও অনেকের পরিচয় ধরা পড়ে। যারা ধরা পড়েন এবং যিনি ধরেন উভয়েই চেপে যান। এমনও অনেক ক্ষেত্রে ঘটে থাকে যে প্রৌঢ় পিতা এবং বিবাহিতা কন্যা একই প্রমোদভবনে সমবেত হয়েছেন। স্বামী এবং স্ত্রী সুখের জন্য একই হুল্লোড়ে এসে জমেছেন। সাধারণত এসব ক্ষেত্রে একজন অন্যজনকে বুঝতে পারলে সরে পড়েন। গোলমাল করেন না।

তা ছাড়া ফরাসি দেশে মানুষের স্বাধীনতা অত্যন্ত স্বীকৃত সত্য। স্ত্রীর পক্ষে যা পাপ স্বামীর পক্ষে কোন আইন সেটাকে পুণ্য বলে রায় দিতে পারে না। এসব জায়গাতে বিত্তশালী বিদেশিরাও আসে। যারা টাকা ওড়াতে চায়। তাদেরই জন্য এসব ক্যাবারের নিমন্ত্রণ গভীর নিশীথেও দরজা খোলা রাখে।

ম'সিয়ে চুপ করলেন।

বোধ হয় মনের অতলে তিনি কিছু খুঁজছিলেন। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি।

যা প্রত্যাশা করেছিলাম। ঠিক তাই। ম'সিয়ে ল'া মুখ খুললেন। এবং সুরু করলেন, ভালবেসেই তারা বিয়ে করেছিল। কয়েক বছরের উদ্দাম ভালোবেসেই তারা বিয়ে করেছিল। কয়েক বছরের উদ্দাম ভালোবাসার কুঁড়ি ফুল হয়ে উঠল। ছুজনে ভেবেছিল এই সুখের চেয়ে স্বর্গ ছলনা। কয়েক বছর কেটে গেল রাত্রির স্বপ্নের মতো; তখনো ছুজনকে ছুজনের পাওয়ার প্রয়োজন শেষ হয়নি। সমস্ত পৃথিবী নির্বাসিত হয়ে রইল। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব। দেখে মনে হল ছুজনে যেন যুগল প্রেমের স্রোতে ভেসে এসেছে। কদাচিত তারা সহরে থাকতো। রেস্তর অভাব ছিল না। তাই কখনো পাহাড়ের শৈলাবাসে, পাইনের ছায়ায়, পাহাড়ী নদীর কিনারে নির্জন শিলাখণ্ডে ছুজনের রোমান্স ঘন হয়ে উঠল। আকাশে যখন তারা উঠত, বনভূমি বসন্তের পর্যাপ্ত পুষ্পের স্তবকে নম্র হয়ে পড়ত, তখন তারা হাত ধরাধরি করে হৃদয়ের প্রণয় সম্ভাষণে মগ্ন হয়ে কথা কইত পৃথিবীর নেপথ্যে। নিভৃতে।

কোন বছর হয়তো দূর সমুদ্রের নির্জন উপকূলে চলে যেত গ্রীষ্মে। তারপর সমুদ্রের বালির উপর শুয়ে 'এমনি করে যায় যদি দিন যাক না' ভাব নিয়ে ঢেউ গুণত। কেউ কারো এক মুহূর্তের বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারতো না।

বুঝেছি। আমি মাথা নাড়লাম, এ আমাদের শ্রীমতী রাধার অবস্থা। কোন একটা শ্লোকে পড়েছিলাম: হারনারোপিত কণ্ঠে ময়া

বিশ্লেষভীরুণা।

বুঝতে পারলাম না।

একটু ধৈর্য ধরুন ম'সিয়ে বিশ্লেষণ করে দিচ্ছি। আপনাদের ত্রবাঁদুবদের প্রেম-গীতিকার মতো আমাদের বৈষ্ণব কবিদের গান আছে। প্রেমের গান। সেই গানের নায়িকা রাধা। নায়ক কৃষ্ণ। নায়িকা নায়কের তিলেক অদর্শন বরদাস্ত করতে পাবে না। প্রতি অঙ্গের জন্য প্রতি অঙ্গের পিপাসা। এমন কি হারও পরে না পাছে সেই অঙ্গের বিচ্ছেদ এনে দেয়।

সমঝদারের হাসি হাসলেন ম'সিয়ে ল'া, ব্যাপাবটা তাই বটে। আপনি দেখে থাকবেন মনামি, মেয়ে কিংবা পুরুষ বিয়েব পর প্রেমের প্রয়োজন ভুলে যায়। যে দেহের ওপব ভিত্তি কবে প্রেমেব কুসুম আসে —সেই দেহটাকেই প্রধান বলে তারই আরাধনা কবে—

সাধনা নয়। আমি জুড়ে দি।

হ্যাঁ, নিবেদন আর বিনোদন যে এক জিনিষ নয় সেটা ভুলে যায়। আমার নিজের মনে হয়েছে প্রেমের প্রয়োজন বিয়েব পবই বেশি। প্রেমের আর্টটা তখনই ম্যাজিক দেখাতে পাবে। বিয়ের আগে দুজনেব কাছে প্রেম অনেকটা অসংলগ্ন একটা কাব্য কল্পনা। বিয়ের পরেই তার সার্থকতা। আর বিয়ের পবে যখন-ই এই প্রেমেব অবজ্ঞা দেখা যায় তখনই-বিপর্যয় ঘটে।

তত্ত্বের বড়ো বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে গল্পটা শুরু করুন।

তত্ত্বটা আর বললাম কোথায়। এতো শুধু ভূমিকা কবছি। আর তাতেই যখন আপনি ঘায়েল তখন এখানেই ছেদ টানছি। তারপর সেই প্রেম প্রত্যেক দিনকার ব্যবহারে নাওয়া খাওয়ার মতো সাধারণ হয়ে গেল। সেই ভালোবাসার বিবর্তন যখন স্বাদহীন সস্তা ধূলোর জিনিষ হয়ে গেল তখনই পুরুষের মন আনচান করে উঠল। বাইরের পৃথিবী আবার ডাক দিল। সমাজ স্বজন বন্ধুরা আবার তার অন্বেষণের গণ্ডীর মধ্যে এল। ফের আগেকার দিনের মতো ফিরতে রাত হতে

লাগল। নায়িকা প্রথমে মান করত, অনুযোগ করত। শেষে সেও পুরোন বন্ধু আর বান্ধবীদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। খাওয়ার সময়ও দেখা হওয়াও বন্ধ হয়ে গেল। একজনের যখন ঘুমোনোর সময়, অন্যজন তখন বিচরণে ব্যস্ত।

দেখা গেল দুজনের বিপরীত সেক্সের বন্ধু এবং বান্ধবীদের আসা যাওয়া বেড়ে যাচ্ছে। সভ্যতার মতো মানুষের মন ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। মধ্যযুগ হ'লে হয়তো এতোখানি বাড়াবাড়ি কোন পক্ষ স্বীকার করত না। এটা গণতন্ত্রের যুগ, বাইরের সামাজিকতা বজায় রেখেও পরস্পর মানসিক স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীন ইচ্ছে নিয়ে পড়ে রইল। শেষে এ সবের আবেদনও ফিঁকে হয়ে এল। দুজনে দুজনের পরম শত্রু। ডাইভোর্স করে নিলেও ব্যাপারটা মিটে যেত। কিন্তু তাতেও সম্মানে বাধে। কাজেই আনন্দের বিকৃতি রাত্রির প্যারিসে ডাক দিল। তারপর একদিন এমন একটা জায়গায় দুজনের দেখা। আর পরিণতি কি হবে সেটুকু কল্পনা করে নেওয়া আপনার পক্ষে কষ্টকর নয়—

আপনারই মুখ থেকে শেষটুকু শুনতে চাই মঁসিয়ে···

মঁসিয়ে লাঁ। সিগারেট ধরালেন।

মঁসিয়ে লাঁকে সিগারেট টানতে দেখে বুঝলাম সত্যি গল্পটা মুলতুবি রাখতে চান তিনি। আর আমার চোখের দিকে এমন করে তাকালেন যার অর্থ এমন বিস্তৃত করে গল্প ফেঁদে বসবার জায়গা এটা নয়।

আমার অনুমান যে সত্যি মঁসিয়ে লাঁর ঠোঁটে কয়েকটা শব্দের উচ্চারণ শুনেই প্রমাণ পেলাম।

গল্প শুনতে গেলে আমাদের দেখা-শোনার অনেকখানি বাকী থেকে যাবে মসিয়ে। ওটা বরং অন্য সময় একটা ককটেলের সঙ্গে সদগতি করা যাবে.

তাই হোক। আমি হাসলাম। হেসে চোখ ফেরাতেই একটা কনট্রাষ্ট চোখে পড়ল। একটা সোহিয়ালি মেয়ে বেলজিয়ামের রঙীন প্লেটে পানীয় নিয়ে মনোহরণ ভঙ্গিতে হেঁটে এল। সাদা মানুষগুলোর

মাঝখানে কালো মেয়েটাকে আশ্চর্য সৌন্দর্য বলে মনে হল। মনে হল অন্ধকারের ঝুরির মতো কালো চুলের রাশে যেন মুখখানিতে সবুজ ঘাসের আনন্দটুকু অনিন্দ্য হয়ে উঠেছে।

বৃষ্টির মেঘ দেখা দিলে তৃষ্ণার্ত চাতকের দল যেমন উদগত আনন্দের ধ্বনিতে গদগদ হয় তেমনি একটা কলধ্বনি উথলে উথলে উঠল আমাদের সমাবেশে।

আগন্তুকদের ভীড় বাড়তে সুরু করেছে। নতুন কেউ আসছে আর হাত তুলে জনতাকে অভিনন্দিত করছে। ঘরের ভেতরকার মানুষগুলোও ভেঙে পড়ছে হর্ষের রোমাঞ্চে। সকলেরই মুখ ঢাকা।

উপস্থিতদের কেউ অলস হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ শোফায় গল্পের জাল বিছিয়ে চলেছে। তবু দেখে মনে হয় উত্তেজনা একটু করে চরমে উঠছে। যদিও মানুষগুলো এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন নিরুদ্বিগ্ন প্রশান্ত মহাসাগরীয় অতলতায় ডুবে আছে। তবু অন্তর্স্রোতের পরিচয় পাচ্ছি। অসাধারণ তার বেগ। বাইরে নিথর।

পেছন থেকে যেন একটু গোলমালের আওয়াজ পেলাম। ফিরলাম। পেছন দিকে। একেবারে উলটো মুখে।

একদল মেয়ে বকের পাঁতির মতো সার বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছে। এতগুলো বনহরিনীর মনোহারিণী সমাবেশ বড়ো দেখা যায় না। পিছনে হলদে পর্দা। ভেলভেটের উজ্জ্বলতায় যেন একঝাঁক ফুল শীতের ঝলমল সকালে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কোন রকম লজ্জার বালাই নেই। মুখের ওপর মুখোসটুকু আব্রু।

অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে এদের উপস্থিতির রহস্যকে ভেদ করতে চাইলাম। ব্লণ্ডকরা সোনালি চুলের একটি মেয়ে মাঝখানে দাঁড়িয়ে সারা দলটাকে পরিচালনা করছে।

নতুন করে আবার গান সুরু হল। আরেক রাউণ্ড পানও হয়ে গেল। একপর্ব নাচের পালাও শেষ হয়ে নতুন করে হালফিল টুইষ্ট সুরু হয়ে গেল।

আমার পাশের একটি জোড়ের চক্রবাক সঙ্গিনীকে কিছু বলতে মহিলাটি ফিসফিস করে উঠল, না না। অথচ কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনেই জড়াজড়ি করে ঘর ছেড়ে গেল। তাদের চলে যাওয়া কেউ খেয়াল করল না যেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল এখানকার সমাবেশের আর সবটুকু উপলক্ষ্য, লক্ষ্য জোড় বেঁধে বেরিয়ে যাওয়া।

একটি মেয়ে দ্বিধার সংগে কয়েক পা এগিয়ে এসে তার সঙ্গিকে কিছু বলল, আর সংগে সংগেই অর্কেষ্ট্রা বেজে উঠল। মাঝখানে একজন মহিলার চীৎকারও শোনা গেল। মেয়েটি এক পা এগিয়ে দু'পা পিছিয়ে একরকম নাচের ভঙ্গীতে এগিয়ে আসতে লাগল। পুরুষদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল কে তার সংগী হবে।

অর্কেষ্ট্রার বাজনা অত্যন্ত নম্র অথচ মধুর তালে হেঁটে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে খ্যাপা হাওয়ার মতো ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে। তখন বুকের ভেতর কেমন যেন সুদূর দিগন্তের বেদনা বাজিয়ে দিয়ে যায়।

মঁসিয়ে লাঁর দিকে এতক্ষণে তাকানোর অবসর পেলাম। মঁসিয়েকে বেশ একটি খুপসুরৎ (মুখটা অবশ্য দেখতে পাচ্ছিনে।) মহিলা সঙ্গিনী করেছেন। মহিলাটির চুলগুলো একরাশ রোদের মতো মঁসিয়ে লাঁর কাঁধে ভেঙে বিছিয়ে গেছে। মেয়েটা যেন এগিয়ে আছে মঁসিয়ে লাঁর মুখের কাছে। মঁসিয়ে লাঁ আমাকে চোখ টিপে এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। মাঝখানে গিয়ে একবার থামলেন তারপর নাচের ছন্দে পা ভেড়ালেন।

একের পর এক মহিলাদের সঙ্গী মিলছে। তারা ঘরের মাঝখানে একটুক্ষণের জন্যে শরীরটাকে হিল্লোলিত করে, অন্ধকারের দিকে সরে যাচ্ছে। কোথায় যায়? অন্ধকারে—কি আছে সেখানে? কে জানে। মনকে প্রশ্ন করলাম। মনই উত্তর দিল।

ভেবেছিলাম ঘরের এক কোণে সরে গিয়ে দাঁড়াবো; একটু অলক্ষ্যে। না এখনো সময় হয় নি। ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর এখনি অন্ধ বন্ধ করো না পাখা!

দেখলাম আমিও ভেসে উঠেছি এক স্বর্ণ উপকূলের বুকের কাছাকাছি। আমিও তার বাহুবন্দী ? মুখের দিকে তাকালাম, মুখ কোথায় ! মুখোস। মিষ্টি একটা গন্ধ ভাসছে তার চুলের বিশৃংখলা ঘিরে। হু'চামচ সমুদ্রের জলের মতো ছলছল করছে চোখের মায়াবী রূপকথার রহস্য।

কেমন লাগছে ? সে ফিসফিস করল কানের কাছে, খুব ভালো লাগছে না !

একটু থামল সে। তারপব নিজের মনেই উচ্চারণ করল, বোধ হয় কোলকাতার থেকে ভালো।

চমকে উঠতে চেয়েছিলাম। চমকালাম না। না চমকানোর কিছু নেই। কোথা থেকে আমার পাত্তার খবর জুটিয়েছে। ছলনাময়ীদের, ছলাকলার তো অন্ত নাই গো নাই।

নাচের আসরে টেনে নামালো আমাকে। আর নাচতে নাচতে বলল, ভয় পেয়ো না। এখানে আমরা যা-ইচ্ছে-তাই করতে পারি। খিলখিল কবে একবাব হেসে উঠেই থেমে গেল। আর আমাকে জোরে জাপটে ধরল।

হুম। শুধু একটা শব্দ উচ্চারণ করে ওর সব কথার উত্তর দিতে চাইলাম। আমার দৃষ্টিকে একটু নামিয়ে মুখোসের ফাঁক দিয়ে তার চোখের দিকে তাকালাম। কি আছে মুখোসের ওপাশে—সেই বেলেয়ারি কাঁচের মতো ঠুনকো প্রণয়ের পণ্য সম্ভার। প্রত্যেক রাত্রে যা নতুন করে ক্ষণিকের অতিথিদের মনোহরণের জন্যে বেঁচে ওঠে।

আলোটায় আরো জোর হয়েছে। জ্যোৎস্নার মতো আলো ফুলের পাপড়ির মতো আমাদের গায়ের ওপর ঝরে পড়েছে।

মেয়েটি গায়ে লেপটে আছে। কথা বলছে না। অথচ তার চোখের তারার ইশারায় আর বাহুবন্ধনীর স্পন্দনে অব্যক্ত কথার তরঙ্গ স্পন্দিত হয়ে উঠছে।

আর একবার থামতে হল আমাদের। নিগ্রো মেয়েটি ট্রে করে পানীয় নিয়ে এসেছে। তৎপরতার সঙ্গে পান করে নিতে হল।

এবার সত্যি চমকাতে হল হাসির শব্দে। একঝাঁক শালিক উড়ে গেল যেন, পেছনে তাদের শব্দের নূপুর ঝরিয়ে রেখে। মধুর অথচ কুটিল। অকারণ অথচ অলীক।

দেখলাম, নাচের সময় মেয়েদের হাত প্রজাপতির ডানার মতো উঠছে নামছে।

পুরুষদের চোখ নেকড়ের মতো জ্বলছে। সাইবেরিয়ার শীতার্ত রাত্রির প্রান্তরে-ঘেরা হিংস্রতা সেই চোখের আলোর কানায়। দুটোতেই দেহের ক্ষুধা। শুধু জাত আলাদা।

ম'সিয়ে ল'া এতক্ষণ চোখের আড়ালে ছিলেন। কয়েক পা এগিয়ে এলেন। যে মেয়েটি তাঁর নাচের সংগী সে তার মুখটাকে ম'সিয়ে ল'ার মুখোসের উপর স্পর্শ করে আছে। বাজনার তালে দুজনে হেমন্তের ঝরাপাতার মতো মাটিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছে।

আমরাও ক্রমাগত নেচে চলেছি। এ সব ব্যাপারে আমার ইচ্ছেটা অবস্থাকে মানিয়ে চলতে চায় না। অথচ অনুপায়।

মেয়েরা ঘরের বাইরে যাবার আগে নির্লজ্জভাবে মুখের মুখোস খুলে তাকাচ্ছে। আর বিজয়িনীর হাসি হাসছে। তাদের চোখে-মুখে উতলে উঠছে নিরাভরণ বিকৃতি। দেহে যে ছন্দ উতরোল ছবিতে জিনা লোলো ব্রিজিডার দেহে কখনো সম্ভব হয়।

জানালার কাছাকাছি এসে গেছিলাম, কি জানি একবার হয়তো বাইরের দৃশ্য দেখবার জন্যে দাঁড়িয়েও গেছিলাম। মেয়েটির সংগে এ সম্পর্কে হয়তো কোন কথাও বলেছিলাম। মনে নেই। হঠাৎ দেখি ম'সিয়ে ল'া, ফরাসি পুলিশের সেই বিশিষ্ট কর্মচারী আমার প্যারিসের বিশেষ বন্ধু—আমার পাশ দিয়ে সরে গেলেন। দ্রুত এবং দ্বিধা-গ্রস্ত পায়। পেছনে ফিরে একবার তাকালেনও। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার দরজার সামনে গিয়ে একবার দাঁড়ালেন। বোধহয় বুঝতে

পাচ্ছিলেন না কি করবেন। এই ঘরের বাইরের যে সব নিগূঢ় কক্ষের রহস্য আছে তার কোনটায় বোধ হয় তলিয়ে গেলেন। ওকে আর দেখতে পেলাম না।

আমাদের দেশের সাপুড়েদের কথা মনে পড়ল। সাপের হাতেই মৃত্যু অনেক সময় তাদের কপালে লেখা থাকে।

চোখ বুঁজে আমিও নেচে চলেছি। শুধু হিলের শব্দ শুনতে পাচ্ছি! মেয়েটির মুখের গরম নিংশ্বাস আমার মুখে জড়িয়ে যাচ্ছে। বিচিত্র পুষ্পসারের গন্ধ মিলে বাতাসকে ভারি করে তুলেছে। মন গন্ধে ভরা। আর মৃদু স্নিগ্ধ ছায়া মানুষের জন্য।

ড্রামের আওয়াজ ফেনিয়ে উঠছে। ট্রমপেনের স্পন্দন দ্রুততব হয়ে উঠছে।

একটি মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল। দেখলাম তার মানুষটি তাকে দু'হাতের ওপর রেখে শূন্যে তুলে ধরেছে। মেয়েটির বেঁকে পড়া দেহ-ধনুর দিকে লোকটি কামার্ত চোখে তাকাচ্ছে। হলের মধ্যেই তাকে নিয়ে সার্কাশের খেলোয়াড়ের মতো দু' একবার খেলা দেখিয়ে অন্ধকারে সরে গেল।

চারদিক থেকে এবার শব্দ আসছে। নানারকমের বিচিত্র শব্দ। সেই বিচিত্রমুখ মানুষের মত্ততা ক্রমশ আদিম অনুপ্রেরণার জ্বালা হয়ে উঠছে।

পৃথিবীর সব দেশের মানুষ এসে জুটেছে। ইংরেজ আমেরিকান জার্মান ইতালিয়ান। মানুষগুলো যেন বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। তাদের মুখের চেহারায় তাদের আর মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। সবাই যেন কবর থেকে উঠে এসেছে।

ক্রমশ আলো নিস্তেজ হয়ে আসছে। অন্ধকারের গন্ধ অনুভব করছি। এখনি অন্ধকারের কফিনের তলায় সবাই ঢাকা পড়ে যাবে। তাই উল্লাস।' তারই উল্লাস।

মেয়েগুলো বে-পরোয়া হয়ে উঠেছে। পুরুষগুলোকে তারা বোধহয় ছিঁড়ে কামড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলবে।

কে একজন মেঝের ওপর পিছলে পড়ে গেল। আর একজন এলিয়ে প'ড়ল তার গায়ে।

একটা অত্যন্ত শ্লথকণ্ঠের গান ছড়িয়ে পড়ছে। নাটক শেষ হয়ে এল। পুরুষ আর মেয়েরা দল বেঁধে জড়াজড়ি করবার উন্মত্ততায় মাতাল হয়ে উঠেছে।

প্রাগৈতিহাসিক কালের গুহার মধ্যে আদি মানব আর মানবীদের দল। আদিম দেহ চাবের যৌথ উৎসবে মেতে উঠেছে।

সকলের দেহের উপর অন্ধকারের ছায়া পড়েছে। এখনো আলো আছে। মানুষগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। শুধু ওদের ছায়াদের মত্ত হ্যাংলামি নির্লজ্জতার দাবানলে জ্বলে উঠেছে।

ইংরেজ আমেরিকান ফরাসী বেলজিয়াম ইতালিয়ান মানুষগুলো এবার যে যার মাতৃভাষায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

বিহ্বল হয়ে যাবার মতো সময়। জাহাজ বন্দর এসে ভেড়বার আগে মাইক বাজাচ্ছে। উপকূলের রেখা জনপদ সহরের লিখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সমস্ত ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল। ঢুকে গেলাম আমরা।

একটা দারুণ চীৎকারের ঐকতান-এ আর সব ডুবে গেল। কনসার্টের আওয়াজও এই বিপুল বিহ্বলতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে।

এক সময় সব চীৎকার থেমে গেল। অন্ধকারে মানুষদের আভাস ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এল। দূরে কোথাও অশরীর কথার ফিসফিস ঘনিষ্ঠ সংলাপের অনুবন্ধ হিসেবে বাতাসে ভেসে এল।

কী [illegible] রাত্রি

দিন কয়েক পরের কথা প্যারিসের একটা ঘরের ধারে আমি আর মঁসিয়ে লাঁ দাঁড়িয়ে ছিলাম। জায়গাটা লুভ্রের কাছাকাছি। পথের প্রান্ত টিউলিপে ঘেরা। আশেপাশের কোথায়ও কৃত্রিম ঝর্ণার [illegible]

জলের মিষ্টি শব্দ সময়ের অবয়ব ছুঁয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে বাচ্চা ছেলেদের মিষ্টি হাসির শব্দ পাচ্ছি। দেখছি দূরের লেকে কেউ কেউ কাগজের নৌকা ভাসাচ্ছে।

চোখের সামনে সাঁজ-এ লিঁজের বাড়িগুলো একটা ফিতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ওর পিছনে আর্কত্ত ট্রায়াম্প উঁকি দিচ্ছে।

প্যারিস, স্বপ্নেরও স্বপ্ন। মঁসিয়ে লাঁ আবেগে ভর দিয়ে কথা বলছিলেন, একে আপনি মার্চের সকালের কোন সুন্দরীর মুখের সঙ্গ তুলনা করতে পারেন। প্যারিসকে আমরা মনের মতো করে সাজিয়েছি। এর আর্ট, সহৃদয় মানুষ আতিথেয় আবহাওয়া আপনি আর কোথাও পাবেন না।

সত্যি করে বলুন দেখি মঁসিয়ে প্যারিসের পথ-চলতি মেয়েদের মতো অকারণে কেউ আপনাকে হাসি বিলিয়ে যাবে? আপনি কোন মেয়েকে দেখে হাসুন সেও আপনাকে স্পষ্ট শোধ দেবে ঠোঁটের হাসিতে। পুলিসে খবর দেবে না।

আমাকে কোন কথা বলতে না দেখে মঁসিয়ে লাঁ গম্ভীর হয়ে গেলেন। মনে মনে কিছু ভাবলেন বোধ হয়। তারপর আমার দিকে সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি কি ভাবছেন মঁসিয়ে আমি জানি।

আমি বোধ হয় একটুখানি আপত্তি করতে চাইলাম। কিন্তু মঁসিয়ে লাঁ আমার কথায় কান দিলেন না।

তা সত্ত্বেও আমেরিকানদের কোন দ্বিধা নেই। মঁসিয়ে লাঁ বলে চললেন, প্যারিসে এসে সেই মেয়েদের পেছনে ওরা লাগে। তবে এটা ঠিক মনামি, মঁসিয়ে লাঁ সিগারেটের আগুনটাকে বার কয়েক টেনে তীব্র করে তুললেন, তবে এটা ঠিক প্যারিস সম্পর্কে আপনারা পৃথিবীর মানুষেরা যা ভাবেন প্যারিস তা নয়। এর বাদামি বুকের নীচে সবুজ একটা হৃদয় আছে। আর সে হৃদয় সহজ আনন্দেই মুগ্ধ। বিকৃতির পাপ তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

টিউলিপের সমাবেশের মাঝ দিয়ে আমরা হেঁটে যাচ্ছি। সকালে কি সব পাখিরা গাছপালার আড়ালে বসে শব্দের নূপুর ঝরিয়ে দেয়।

অথচ দেখুন আজকে কি ঘটতে চলেছে। আজকে প্যারিস সারা পৃথিবীর কাছে রাত্রির পরিচয়ের জন্যেই জনস্রোত টানছে। আমেরিকানদের কাছে স্বপ্ন—প্যারিস। ইতালিয়ান গ্রীক জার্মান বেলজিয়াম সবাই রাত্রির প্যারিসের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকায়।

আমেরিকানরা ফি-বছর বসন্তে প্যারিসের ছুটি কাটাতে আসে। দলে দলে। তারা মুগ্ধ দেশপর্যটক নয়। দিনের প্যারিসকে তারা চেনে না। রাত্রের প্যারিসের সংগেই তাদের মৈত্রী। আপনি কি ভাবছেন এসব ব্যবসা প্যারিসিয়ানরা নিজেদের জন্যে করেছিল ?

আমার তো তাই মনে হয়।

ওইখানেই আপনারা ভুল করেন। এসব ব্যবসার মূল পত্তন হয় বিদেশীদের প্রলুব্ধ করবার জন্য। এর সাফল্যও বিদেশীদের জন্যে। ফরাসিরা কখনো নিজেদের জন্য এ সব ব্যবসার সৃষ্টি করেননি। আপনি যেখানেই যাবেন দেখবেন, এ ধরণের ব্যবসা ব্যাঙের ছাতার মতো সব জায়গাতেই গজিয়ে উঠছে। প্লেস পিগ্যলের কথাই ধরুন না, দেখলেন তো কেমন চুটিয়ে ব্যবসা করে যাচ্ছে। আমেরিকানদের টেকনিকে ব্যবসা চলেছে—নাচঘর ক্যাবারে আর কপোত-কপোতীর সমাবেশ। অথচ এদের বন্ধ করে দেবার কোন উপায় নেই। যেমন চলছে তেমনি চলবে। ক্রমশ হয়তো বেড়ে যাবে।

তবে বন্ধ করে না দিলেও উপায় নেই। এ ধরণের ব্যবসার সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছু বন্ধ করে দেওয়া উচিত। জনসাধারণের নৈতিক স্বাস্থ্যের জন্যেও বটে আবার দৈহিক স্বাস্থ্যের জন্যেও বটে। অবশ্য ব্যবসা বন্ধ করে দেবার জন্যে যে সব মেয়েদের কাজ যাবে তাদের জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু উপায় কি মঁসিয়ে!

মঁসিয়ে লাঁ আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, চলুন সঁত

লাজারে দেখে আসবেন।

আমার সমর্থন অসমর্থনের জন্যে ভাবলেন না ম'সিয়ে ল'। চিউয়িং গামের প্যাকেট আমার দিকে এগিয়ে ম'সিয়ে ল' ট্যাক্সি ক্লাব থামাতে ছুটলেন।

আমাদের দেহ ট্যাক্সির গহ্বরে ঢোকাতেই মুন ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটে চলল। সঁত লাজারের নারকীয় এলাকার দিকে। আমাদের চারপাশে ট্যাকসির হর্ণ কান ঝালাপালা করে দেবার দাখিল। সবাই একপথে ছুটে চলেছে।

সঁত লাজাবের জঘন্য জেলখানায় অবশেষে হাজির হলাম। জেল-খানার বিরাট তোরণের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন ম'সিয়ে ল'।। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, এই সেই বিখ্যাত তোরণ যার তলা দিয়ে মৃত্যুর অন্ধকারের দিকে হেঁটে গেছিল।

আমি পথটার উপর দিয়ে ভেতবের দিকে তাকালাম।

সঁত লাজারে প্রথমত জেল। দ্বিতীয়ত যে সব মেয়ে এ সব ব্যবসায় জড়িয়ে আছে তাদের কাছে মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর, নিজেদের দেহ সম্পর্কে কোন মিথ্যে এরা বলতে সাহস কবে না। সঁত লাজারের সেল—যেমন ঠাণ্ডা তেমনি অন্ধকার। আর এ'সব মেয়েরা অন্ধকার ও হিমকে ভীষণ ভয় পায়। ওরা সঁত লাজাবেব ডাক্তাবের সামনে এসে দাঁড়ানোব আগে সংক্রামক বোগের বাহ্যিক চিহ্নকে টোটকা ওষুধ দিয়ে ঢেকে আনবার চেষ্টা করে।

কেন? আমি জিজ্ঞাসু হলাম।

প্যারিসে যে পাপ পরিশীলিত হয় সঁত লাজারে তা পরিশোধনের কেন্দ্র। প্যারিস পুলিসের কাজের অনেকখানি সঁত লাজারেরও হাতে। রোগগ্রস্থ মেয়েদের এখানে রেখে সংক্রমনের হাত থেকে আগন্তুকদের রক্ষা করে।

অবশ্য মেয়েরা এখানকার ডাক্তারদের আন্তরিকতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ করে। তারা জানে আমরা যা আমরা তাই। আর এর হাত

থেকে কেউ কেউ আমাদের রক্ষা করতে পারবে না। শুত লাজারে আমাদের রোগ সম্পর্কে সে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করে সেটা লোক-দেখানো।

এখানে প্রত্যেক পনেরোদিন অন্তর মেয়েদের ডাক্তারি পরীক্ষার সামনে আসতে হয়। যদিও একদিন অন্তর পরীক্ষাব ব্যবস্থা আইনে লিপিবদ্ধ আছে।

আমরা ভেতরে ঢুকলাম।

ভেতরে খুব ভীড়। অনেক মেয়ে এসে লাইনে দাঁড়িয়েছে। নতুন মেয়েরা এসে লাইনে সংখ্যা বৃদ্ধি করছে।

ডাক্তাবদেব কাজকর্ম দেখে মনে হল কাজকর্ম যদিও নিয়মবদ্ধ তা হলেও অনেকটা যেন এলোমেলো।

ধরুন মঁসিয়ে যদি দেখা যায়, মেয়েটা সত্যি সংক্রামক রোগগ্রস্থ। তা হলে কি কবা হবে?

তা হলে প্রথমে তাকে গ্রাণ্ড হোটেলে পাঠানো হবে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের জন্য। যদি দেখা যায় তেমন জটিল নয় তাহলে তাকে প্রত্যহ এসে ডাক্তাবেব নির্দেশ জ্ঞাত হয়ে যেতে হবে। সে যে ডাক্তাবেব চিকিৎসাধীন সে কথাটাও তার সার্টিফিকেটে লিখে দেওয়া হবে।

তাতে লাভ? প্রশ্ন করলাম।

হাসলেন মঁসিয়ে লাঁ, আগন্তুকদের প্রত্যেকেই রোগটাকে ভয় করে। স্ফুর্তিব সংগে বাড়তি একটা বোগের ঝামেলা কেউ কাঁধে নিতে চায়?

ব্যাপারটা জানিয়ে দেওয়া হয় কি করে?

ওদের কোয়ার্টারের কাছাকাছি এ সম্পর্কে নানা রকমেব প্রাচীরপত্র ঝুলিয়ে রাখা হয়।

একটা উদাহরণ দিন—

অবশ্য বিজ্ঞাপনগুলো খুব সংযত ও সংক্ষেপিত। যেমন: ওদের সঙ্গে মেলামেশার আগে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেখে নিন।

ফরাসি দেশে এ ধরণের সংক্রামক রোগ নিরাময়ের আর কি ব্যবস্থা আছে ?

ফরাসি জাতীয় মহিলা সংঘ সংঘবদ্ধ ব্রথেল সিষ্টেমের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। এ ছাড়া তাঁরা ভ্রাম্যমান ডাক্তার নিয়োগ করেছেন। যে মহিলা বা মেয়ে স্বাভাবিক সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে চায় তাদের জন্য নারীভবন তৈরি হয়েছে।

জেলের ঈষৎ রৌদ্রালোকিত প্রাঙ্গণে দাঁড়ালাম দু'জনে। সিগারেট এগিয়ে দিলাম মঁসিয়ে লাঁর দিকে।

সিগারেট হাতে নিয়ে মঁসিয়ে লাঁ উপরের দিকে তাকালেন। পায়রা ডাকছে। জেলের এ দিকটা নির্জন।

কয়েকটা কথা আপনাকে বলা দরকার মঁসিয়ে, পৃথিবীর সব দেশেই নৈতিক ব্যাভিচার মেয়েদের পাপের পথে টেনে আনে। ক্রমিক অনুবৃত্তির পথ ব্রথেলের নরক। আর ক্রমাগত ব্রথেল জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি রোগ।

এ ব্যাধির হাত থেকে মানুষকে মুক্তি পেতে হলে রোগের মূল অন্বেষণ করা দরকার। যে সব মেয়েরা এ পথে নেমেছে তাদের প্রতি আমরা যেন অমানবিক হয়ে না যাই। তাদের সঙ্গে যেন মানুষের মতোই ব্যবহার করি। তারা আমাদেরই কারো আত্মীয়া। তাদের দিকে আমরা যেন বিদ্রূপের পাথর না ছুঁড়ি। আমরা প্রত্যেকেই কাচের ঘরে থাকি এ কথা যেন ভুলে না যাই।

যখন কোন মেয়েকে ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা অফিসার ডে লা পিয়াক্স-এর সামনে হাজির করা হয় যেন তাদেরই দোষী করে রূঢ় ব্যবহার করা না হয়। মেয়েটি হয়তো তার চেয়ে তার পরিবেশের জন্য দায়ী।

দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় আমার যা মনে হয়েছে সেই কথাটি ছোট্ট করে বলছি, মেয়েরা পুরুষদের কাছ থেকে যেমন ব্যবহার পায় সমাজে তাই ফিরিয়ে দেয়।

একজন মেয়েকে রক্ষা করলে একজন মানুষকে রক্ষা করা হয়।

এটা আমাদের ডিপার্টমেন্টের মূলমন্ত্র

মঁসিয়ে হাসলেন।

আমি অনেক দূরে চলে গেছিলাম। মঁসিয়ের কথায় আবার ফিরে এলাম। আমিও হাসলাম ওঁর দিকে ফিরে।

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন মঁসিয়ে লাঁ। বললেন, চলুন একটু পা চালিয়ে। আপনাকে ভাবমুখ খাওয়াবো কথা দিয়েছিলাম।

আমাকে একরকম টেনে সঁত লাজারে থেকে বের করে নিয়ে এলেন।

মঁসিয়ে লাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ক্লান্ত হয়ে ফিরলাম। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। বাইরে লাঞ্চ সেরে সিনেমা দেখে তারপর বাড়ি। বাড়িতে ফিরেও অন্ধকারের প্যারিসকে ভুলতে পারছিলাম না। যে প্যারিস একদিন স্বাধীনতা সাম্য সৌভ্রাত্র্যের বাণী ছড়িয়েছে তার নিজের আজ একি শিকল।

ঋষি ভিক্টর হিউগোর প্যারিস! স্বাধীনতা সাম্য সৌভ্রাত্র্যের প্যারিস! আনতোল ফ্রাঁস থেকে শুরু আধুনিক বোমা বোঁলা ক্যামু সাত্রের প্যারিস বিষে নীল হয়ে গেছে। বাইরে থেকে আমরা তার প্রদীপের আলোটুকু দেখেছি, তলায় যে অন্ধকার ঘন হয়ে আছে তার দিকে চেয়ে দেখেছি কি!

সুধার পাত্রে প্যারিস অমৃত ঢেলে দিয়ে নিজে বিষ পান করে নীলকণ্ঠ।

টেলিফোন বেজে উঠলো, হ্যালো—

ফরাসি পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঁসিয়ে মধ্যপ্রাচ্য সফরে যাচ্ছেন। বোধহয় আগামী রবিবার। আপনার জন্যে টিকিটের ব্যবস্থা করব কি? অফিসের ফরাসি কেরানির গলা ভেসে এল।

নিশ্চয়ই। ওঁর এই ট্যুরের সবটাই আমাকে কভার করতে হবে।

অনেকদিন পরে আবার পথে নামলাম। প্রথমে ক্যাসাব্লাঙ্কা। ব্যস্ত সময়। জীবিকার কাজকর্মের ফাঁকে তবু একবার ভাবলাম বৌসবীব হয়ে যাই। খাস প্যারিসেই এর খ্যাতি। রাত্রির জন্যে ফ্রান্স

নাকি আশ্চর্য এক সহব বানিয়েছে। প্যারিসের নাম করা এক কাগজের স্থানীয় সংবাদদাতাই ব্যবস্থা করে দিলেন। যা যেখানে দেখেছি যা শুনেছি সবই বলবো। শুধু তাব নামটা বলতে পারবো না।......

না। নামটা আমি কিছুতেই বলতে পারবো না। তাকে আমি কথা দিয়েছিলাম।

দেশকালের যতোই ব্যবধান হোক না—তবু তাকে দেওয়া কথার মর্যাদা আমি রাখতে চাই।

যে কোন ঘরে ঢুকতে পারতাম। প্রত্যেক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে স্বাগত সম্বর্ধনার জন্য স্মিত হাসি নিয়ে ওরা দাঁড়িয়েছিল। কৌতূহল মেটানোব জন্যে ঘরে ঢোকবাব উপযুক্ত দাম দিলে নিশ্চয়ই খুশি হয়ে আমাদের প্রশ্নেব উত্তর দিত।

তবু কেন জানি না একটু বাদবিচাব কবেছিলাম। আমাব চেয়ে আলির খুঁতখুঁতে স্বভাব আবো বেশী। ওই আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল, যাব-তাব ঘবে ঢুকবেন না। একটু দেখে শুনে খোঁজখবব নিয়ে তাবপব যা হয় কবা যাবে। মঁসিয়ে দঁবেও তাই বলে দিয়েছেন।

সেই জন্যেই দবজা থেকে দরজায় গিয়ে থমকে দাঁড়াচ্ছিলাম। তারপবই সবে যাচ্ছিলাম। ওব দরজায় এসে যখন দাঁড়ালাম আমার নিজেরই মনে হল যাকে চাই এতক্ষণে তার দেখা পেলাম। আলির দিকে তাকিয়ে হাসলাম। আলিও হাসল। তার চোখে ইসারা ছিল। বুঝতে পাবলাম আপত্তি নেই। মঁসিয়ে দঁবে আলিকে আমার সঙ্গে দিয়েছেন। সুবিধাব জন্য। ওয়াকেবহাল লোক। এখানকার হালচাল ভালো কবে জানা।

আলি কৌসবীবে অনেকবার এসেছেন। মঁসিয়ে দঁবের কাজে প্রায়ই আসাযাওয়া করতে হয়।

ক্যাসাব্লাঙ্কা থেকে কয়েক মাইলের ফ্যারাক। একটা মোটর পথ

দিয়ে জোড়া। চারিদিকেই মরুভূমি। সন্ধ্যেবেলা একটা স্পেশাল বাস সার্ভিস চালু হয়। সারা রাত যাত্রী নিয়ে যাওয়া আসা করে।

বৌসবীর স্পেশালে উঠলেই লোকে বুঝবে স্ফূর্তি করতে যাচ্ছে। কাজেই জিজ্ঞাসাবাদ নেই। পয়সা দিলেন টিকিট নিলেন। ব্যাস্।

এবার বাইরের দিকে তাকান দেখবেন ধূসর অন্ধকার। আর অনুভব করবেন উঁচুনীচু পথের ওপর বাসের পায়তারা। প্রাণ যাবার যোগাড় আর কি!

বেশি দূর নয় তাই রক্ষে। বাসে বসেই অন্ধকারে বুঝতে পারবেন সামনে আলোর ইসারা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। একটু পরেই দেখবেন মরুভূমির অন্ধকারে আলোর জরিদার পোষাক পরে কোন সুন্দরী নাচতে নেমেছে।

বৌসবীর সহরটায় শুধু ওরাই থাকে না। কাছাকাছি আরব ও জু'দের গ্রাম আছে। তবে এর সৌরভ ও গৌরব ওদের জন্যেই। ফুর্তিবাজদের তীর্থ। বসরার যেমন গোলাপ বৌসবীরের তেমনি হুরী।

মরক্কোর এই নগরটার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি শুধু রূপের নয় রূপসীদের জন্যও বটে—বাইরে থেকে যারা আসেন তাদের ভাগ্যে বৌসবীর লেখা না-থাকলে সারাজীবন খেদ করে মরেন। কপাল চাপড়েও সে খেদোক্তি ঠাণ্ডা হয় না।

দিনরাত্রি আগুন জ্বলছে এখানে। কামনার আগুন। বাসনার আগুন। পতঙ্গের দল উড়ে এসে পড়ছে। পুড়ে মরার মধ্যেও আশ্চর্য শান্তি। অনির্বাণ অতৃপ্তি।

বিভ্রান্ত হয়ে গেছিলাম। গেটের সামনে থমকে দাঁড়াতে হল। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে যে বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে সেটা আরব্যরজনীর এক হাজার রাত্রির পাতা থেকে তুলে এনেছে। মিনারে অলিন্দে গম্বুজে সে এক এলাহি ব্যাপার। কি আশ্চর্য রঙের মিনে করা জাফরিকাটা দেওয়াল। না, রুচি আছে ফরাসিদের।

পাপের জন্যে যে সহয় ওরা তৈরি করেছে তার ওপরও সৌন্দর্যের প্রলেপ দিয়েছে।

মঁসিয়ে দঁবে বলেছিলেন, কি করা যায় বলুন! ক্যাসাব্লাঙ্কার মানুষের ভালোমন্দ ফরাসিদেরই দেখতে হয়—তাই এ অবস্থা। আপনাদের চোখে অপরাধ মনে হতে পারে এটা আসলে কিন্তু জনসাধারনের নৈতিক পরিশীলনের ব্যবস্থা!

উত্তর দিতে পারি নি। শুকনো হাসতে হয়েছিল।

ক্যাসাব্লাঙ্কা থেকে বাসে মাত্র সতেরো মিনিটের পথ। গেট দিয়ে ঢুকে ছোট্ট একটা ফোয়ারার কাছে এসে দাঁড়ালাম।

চারদিকে চোখ ফেলে এক নজরে দেখে নিলাম মুরীয় প্যাটার্নের স্নানঘর ফরাসি বুলভা এবং আমেরিকান সিনেমা হাউস।

পরে অবশ্য আবিষ্কার করেছিলাম পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যে অশ্লীল ছবি লুকিয়ে চুরিয়ে নিজেদের ঘরে বসে প্রোজেক্টারে দেখা হয় সেই সব ছবি এখানে খোলামেলা বিজ্ঞাপন দিয়ে পঁয়ত্রিশ মিলিমিটারে দেখান হচ্ছে। ছবিগুলো আমেরিকায় তৈরি।

এখানকার পথঘাটে ছায়াচ্ছন্ন পাদপের বিস্তার। পার্কগুলো জনসাধারণের নির্জন প্রমোদকুঞ্জ।

আধুনিক সভ্যতার ও বিলাসোপকরণের জন্যে একশ'টা দোকান দিনরাত খোলা আছে। সেখানে রেডিমেড রেডিও থেকে মেডেনফর্ম বজায় রাখবার অঙ্গসম্ভারও পাওয়া যায়।

যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম তার দুপাশ দিয়ে সাজানো বাড়ি। বাড়ির ভেতর থেকে মাতালের চীৎকার আর অসভ্য গানের কলি ভেসে আসছিল। ঘরের সামনে স্থানীয় এবং চালানি সাদা মেয়েরা আমাদের দেখে চেঁচাচ্ছিল, আসুন একসঙ্গে চা খাওয়া যাক। ঈশ্বরের দোহাই আজকের সন্ধ্যেটা যেন বৃথা না যায়!

মুরমেয়েদের দেখলে চমকে যেতে হয়। এরা মরুভূমির মঞ্জরী নয়। যেন প্যারিসের বুলভা থেকে উঠে এসেছে। একেবারে হালফিল মহা-

দেশীয় ফ্যাশানের তালিম দেওয়া জেল্লা ছড়াচ্ছে। পৃথিবীর সবদেশেই এই সব মেয়েদের একই রকম চেহারা। ব্যভিচার ও অনাচারের পলি জমে একটা ক্লেদাক্ত বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু নেশার ঘোরে তা মনেও থাকে না।

আমি আগে হাঁটছি। আলি আমার পিছনে।

ম'সিয়ে কেমন বুঝছেন?

সবে তো নরকের দরজায় পা দিয়েছি। এর মধ্যে মন্তব্য করি কি করে? দাঁড়ান আগে বসি। পানতামাক খাই।

এক-একটা ঘরে খদ্দেরের ভিড় বেশি। ছোট ঘর বসবার জায়গা নেই। লোকেরা তাই বাইরে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই লাইনে জিহোবা প্রেরিত পুরুষের শিষ্যবৃন্দ লিজিওনারী এবং সাধারণ নাগরিক। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছে। গন্তব্য: স্বর্গ। বা ডাক্তারের ক্লিনিক। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শেষেরটাই।

মেয়েগুলোকে এরা এমন করে পরখ করছে যেন হাটে বাজারে মুরগি কি ফিলিপিনো দ্বীপের আনারস কিনছে। লজ্জা সরমের কোন বালাই নেই। আরে সহরটাই তো এইজন্যে। সাধুসন্তরা এখানে আসবেন না জানা কথা। তুমিও আগুন নেভাতে চাও। আমারও সেই এক উদ্দেশ্য। ভাই বেরাদার আমরা। লজ্জা কিসের। জিনিষটা তো আর মুফতি পাচ্ছি না। নগদে কিনতে হচ্ছে। একটু দেখে নেওয়াই দরকার। তাই তুমি যাই বলো বাপু। মানুষ তো বটে— পছন্দ অপছন্দ একটা থাকবেই।

না, জ্বালালে ব্যাটারা। আমাদের পিছু লেগেছে। এরি মধ্যে সার্কাসের আয়োজন। একটি মাত্র পর্দা। গর্দভের সঙ্গে মুবমল্লের দ্বন্দ্বযুদ্ধ। ছাড়বে না কিছুতেই। বলে ম'সিয়ের তো দেশ বিদেশের অনেক আসনাই দেখা আছে। বৌসবিবে এলেন, অনেক কিস্‌সা অনেক মজা পাবেন।

তবে এই সার্কাস যদি না দেখেন বেহেস্থে গিয়ে কি কৈফিয়ত

দেবেন ? সত্যি তো। মনে মনে ভাবি, না দেখলে ভাগ্যে হয়তো স্বর্গের থাড´ ক্লাসের কামরা জুটবে। ঠকতে রাজী নই। কি বলেন আলি ?

আলি হাসলেন। হেসে বললেন, বেয়াকুফরা আমাদের দুজনকেই বেয়াকুফ ঠাওরেছে।

ইয়া আল্লা। আরব্য উপন্যাসের পুরিতে যদি পৌঁছতে পেরে থাকি। এক রাত্রিব বোকা না হয় সাজলামই। আপত্তি নেই তো ?

মাথা নাড়েন তিনি।

তবে দেরি না করে টিকিট কেটে ফেলা যাক। জানেন তো—। একটু গম্ভীর হয়ে ওকে বললাম, ইতিহাসের দুটি জিনিষ এখনো টিঁকে আছে। স্পেনীযদেব বুল ফাইট আব এই মুবদের 'রাসভ-রণ' ; একটা তো আগেই সেবে ফেলেছি। এটাই বাকি ছিল, ভাগ্যে সেটাও জুটে গেল। আসুন।

দু'শ ফ্রাঙ্ক দিয়ে দুটো টিকিট কাটলাম।

সার্কাস বলতে ভাবেন না তাঁবু পড়েছে। আলোর জেল্লা ছুটেছে। ব্যাণ্ডেব ঐকতান উঠেছে। না, তাঁবু-টাবু ওসব কিসস্সু নেই। সেবেফ খোলা মাঠ-ময়দান।

এক কোণে গাছেব নীচে সার্কাসের আসর বসেছে। ইতিমধ্যে অনেক লোক জমে গেছে। আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাদেব পিছনেও অনেকে এলেন। জিনিষটার নাম নেই ট্রাডিশন আছে।

তিনজন আরব যন্ত্রী যন্ত্র নিয়ে বসে গেছেন। ডারবুকা জিমব্রি আর ফাওলা। মজাদাব লড়াই সুরুর ঘণ্টা পড়ল। দুই পাশে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াল।

বাজনা বিচিত্রভাবে বেজে উঠল রণবাদ্যেব ভঙ্গীতে। মুরটিও রণ-হুঙ্কাব দিল। গর্দভটিও তাব গর্জন ও লম্ফনেব কেরামতি দেখাতে ছুটে গেল। দুজনেই নিরস্ত্র। সুতরাং জমে উঠতে দেরী হল না। দুজনের লক্ষ্য দেখলাম প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা। মানুষেব লক্ষ্য গর্দভেব গর্দান

আর গর্দভের লক্ষ্য পদাঘাতে মনুষ্য পুঙ্গবকে ঘায়েল করা।

যে জিনিসটা মানুষকে এ সব ব্যাপারে চমৎকৃত করে এ যুদ্ধে তা অনুপস্থিত ; সুতরাং গাইপাঁঠার মতো নিরামিষ।

বেরিয়ে এলাম। ডারবুকা জির্মাত্রি আর ভাওলা পাল্লা দিয়ে লড়ে চলেছে।

চলুন মঁসিয়ে আলি ?

আলি বোধহয় আমার ওপর ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এমন করে দেরি করলে আসল জায়গায় গিয়ে পৌছতে অন্ধকারে ভাটি লাগবে।

যাই হোক এবার রাস্তা ছেড়ে হোটেলের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। আনকোরা একটি ফরাসি মেয়ে। সবে বোধহয় ফরাসি বুলভা থেকে উঠে এসেছে। পরের দরজাগুলোতে ইতালীয় ও স্পেনীয় মেয়েদের ভিড়। তারা মৃদু ও মধুর কণ্ঠে আহ্বান করছিল, আসুন— ভেতরে এসে আজকের সন্ধ্যে উপভোগ করুন। (আহ্বান নয় কলকণ্ঠের কাকলি)।

আলি বললেন, এখানে নয়। মঁসিয়ে দ্যরের নিশানা দেওয়া আছে। সেখানেই যাওয়া যাক।

অন্যত্র হাজির হলাম। পথে নিওনের আলো। পিয়ানো অ্যাকডিয়নের সুর। ললিত-কম্প্র কণ্ঠের গান। যেন সমুদ্রের ওপর থেকে ভেসে আসছে।

পথে পুলিশ আর মিলিটারী পুলিসের ভিড়। প্রমোদ সন্ধানী জনতার ভিড় নিয়ন্ত্রণ করছে। প্রায়ই সংঘর্ষে আগুন জ্বলে ওঠে। ব্যাবসারও অনেক ক্ষতি হয়। ফরাসি সরকার তাই প্রচুর পুলিশের ব্যবস্থা রেখেছেন।

আজকে ভিড়টা একটু বেশি। আলি নিজের মনেই বললেন।

তাই নাকি ?

সারি সারি ঘরগুলোতে বিচিত্র মুখের ভীড়। তন্বী। পৃথুলা। সাদা কালো বাদামী। পৃথিবীর সব দেশ থেকে বিদেশি ফুলের গুচ্ছ

এনে বৌসবারে সাজিয়েছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ তো একেবারে আশ্চর্য। কি নিষ্পাপ মুখ। শিশিরে ধোয়া ডেফোডিল। বেশবাশের স্বল্পতা, মনোহরণেব নির্লজ্জ ভঙ্গী তাদের আলাদা হলেও আকর্ষণের সুত্রটা এক।

আসুন এক কাপ চা খাওয়া যাক। এটাই সকলের কথার মুখপাত। আমাকে দেখে এদের ফিসফিসানি বেড়ে গেছে। বাজা উজির ঠাওবাল নাকি আমাকে কে জানে! ওদের চঞ্চলতা অনুভব করছি।

আলি একটা দরজার সামনে থমকে দাঁড়ালেন। দরজাটা একটু ফাঁক। পথটা প্রাঙ্গণ পেরিয়ে লাগোয়া একটা বাবান্দার দরজায় গিয়ে পৌচেছে। ভেতবে সুবেলা কণ্ঠের আহ্বান পেলাম, আসুন—ভেতরে আসুন!

যাবো? আলিকে জিজ্ঞেস করলাম।

আসুন। আলি আগে আমাকে পথ করে দিল।

ছোট ঘব। চোখ ধাঁধানো আলোর বহর। ঘবের বাতাস ভারি হয়ে আছে। এদিক-ওদিক চেয়ে সুন্দরীর পাত্তা করছিলাম। দবজার ওপাশেই তাব দেখা পেলাম। সন্ধ্যেবেলায সুন্দরীর আসনাই দিচ্ছে ভালো। একেবাবে বেহেস্তের হুরি। আল্লারসুলের ইচ্ছেয মর্তেব তকলিফ দূব করবার জন্যে লহমার খত লিখে এসেছে।

মিষ্টি হাসি দিযে আমাদের অভ্যর্থনা কবল। এক নজরে মেযেটার আপাদ মস্তক নজব বুলিযে নিলাম। নাঃ, সুন্দবী বলে স্বীকার কবতে হয়। মাথার চুলে খুবসুরৎ একটা লাল গোলাপ চড়িযেছে। আর একটা লাগিযেছে তাব জ্যাকেটে।

মুখের দিকে তাকিযে মনে হল স্পর্শকাতব। আর যখন হাসি ফোটাল মনে হল সৌন্দর্যের সঙ্গে বিষন্নতার আশ্চর্য সমীকরণ ঘটেছে। আব সে যখন আমাব দিকে তাকালো তাব বক্ত প্রলেপ দেওয়া ঠোঁটে কুণ্ঠিত স্বচ্ছন্দ বিচিত্র ভঙ্গিমা ফুটে বেবোল।

না, ভাই সাহেব ম'সিয়ে দঁবের নজরের প্রশংসা করতে হয়। আলির দিকে তাকালাম।

সে ইসারায় বোঝাল এরি ঠিকানা ম'সিয়ে দিয়েছিলেন। দেওয়ালে মঁসিয়ে দঁবের নামাঙ্কিত সার্টিফিকেটের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

এ ধরণের মালঞ্চের যোগ্য মালাকার। মনে মনে তারিফ করলাম। মেয়েটির জন্যে বিষণ্ণতা বোধ করি। হয়তো অনেক ট্রাজেডির সিঁড়ি বেয়ে ম'সিয়ে দঁবের হাতে এসে ঠেকেছে।

হঠাৎ বাইবে পায়ের শব্দ বেজে উঠল। ইষৎ ফাঁক হয়ে গেল দবজাটা আব ভেতবে দুজন ফরাসি ভদ্রলোক চলে এলেন। আমাদের দেখে বললেন, মাপ্ কবলেন ম'সিয়ে বুঝতেই পাবিনি। ওদের একজন ফরাসি স্থলভ সৌজন্যেব সঙ্গে ক্ষমা চাইলেন

ওব ঘরে যে কেউ এ সময় থাকতে পারে খেয়াল করিনি। অন্যজন কৈফিয়ৎ দিলেন, আমাদেব একটু দেখেশুনে চলা দরকার। বোধ হয় বন্ধুকে সতর্ক করে দিলেন তিনি।

সরে গেলেন দুজনে।

সিগারেটের প্যাকেট বেব করে আলিকে অফার করলাম। নিজেও একটা সিগারেট মুখে গুঁজলাম। তাবপর দেশালাইয়ে কাঠি ঘষে অগ্নি সংযোগ করলাম। মেয়েটি আমার পাশে বিছানার ওপর এসে বসল। এমনিতে দেখেছি স্থন্দবীদেব সান্নিধ্যে এলে হৃদয় ময়ূরের মতো নেচে ওঠে। আর সেই যদি অপরিচিত হয় তো কথা নেই। মনে হয় একেই তো স্বপ্নে দেখেছি মাধবী রাতে। শারদ প্রভাতে।

সে যখন কথা স্থরু করল কী পবিচ্ছন্ন উচ্চারণ। অথচ সঙ্গীতের মতো মিষ্টি। তার কথার মধ্যে কাষ্টাইলের প্রাচীন বিশিষ্টার্থক শব্দ রীতির বয়ন। শব্দের বিন্যাস ও চয়নে বেশ একটা প্রাচীন ট্রাডিশনের ধারা রয়েছে। না, এ মেয়ে দেখছি ফেংনা নয়।

আমি ম'সিয়ে দঁবের একজন বন্ধু। আলোচনা স্থরু করলাম,

আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে কী যে খুসি হয়েছি কি বলবো। যদি আপনার সম্বন্ধে কিছু বলেন বিশেষ আনন্দিত হবো।

মেয়েটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল। তারপর চব্বিশ-পঁচিশ যৌবনকে ডিভানের ওপর এলিয়ে দিল। একটু খানি হাসল। খুসি হয়েছে মনে হল তাকে। বোধহয় প্রত্যেকদিনকার কদর্য পুনরাবৃত্তি থেকে রক্ষা পাওয়া গেল এই জন্যই সে খুশি।

দূর প্রাচ্যে আমার দীর্ঘদিনের ভ্রমনের ইতিহাসে অনেক নতুন গল্প শুনেছি। যার অনেকগুলোই সেই একই কাহিনীর এপিঠ ওপিঠ। কিন্তু এই গল্পটি শুনে আমার মনে হয়েছিল পোকায়-কাটা জীবনের এই পাণ্ডুলিপির কোথায় যেন একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। মানুষের কামনার কৌতুহল ও পারিবারিক শৈথিল্য কোথায় টেনে আনতে পারে এই গল্পটি তার একটি বিশেষ উদাহরণ হয়ে থাকবে বলে বিশ্বাস। গল্প বলতে ও কতোবার কেঁদেছে—ভিজে জবজবে গলায় কথা আটকে গেছে। মাথা নীচু করে পুরোন দিনের স্মৃতি অনুভব করেছে। জানে এই সুখস্মৃতি স্মৃতির বিষ হয়ে সারা জীবন তাকে যে দাহ দেবে তার হাত থেকে তার পরিত্রাণ নেই। অথচ এই মেয়েব জীবনে এই নরক সে যে কল্পনায়ও অসম্ভব ছিল।

এই ভিন্ন স্বাদের রূপকথাটি যথাসম্ভব মেয়েটির নিজের ভাষায় বলে যাচ্ছিল।

মাদ্রিদের এক প্রভাবশালী ব্যবসায়ী পরিবারে আমার জন্ম। জেনারেলের সঙ্গে বাবার ছোটবেলার বন্ধুত্ব। তুজনের পথ ভিন্ন কিন্তু বন্ধুত্ব ছিল অকৃত্রিম। জেনারেল শাসন ভার নেবার পর বাবাকে মন্ত্রীত্বের জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সবিনয় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বাবা।

হেসে জেনারেল ফ্রাঙ্কো বলেছিলেন, রাজনীতিকে তুমি ভয় পাও ফিলিপ।

তাই বোধ হয়। বাবা মৃত্থ উত্তর দিয়েছিলেন, দেশের জন্যে

আমার এমন কিছু ত্যাগ নেই যার জন্যে মন্ত্রীত্বের আসন গ্রহণ করতে পারি। তুমি আমার বন্ধু আমাকে ভালোবাসো ; তোমার সেই ভালোবাসা সত্যি হয়ে থাক। এইটুকু আমার কামনা।।

গল্পটা ছোটবেলায় মায়ের মুখে শুনেছিলাম। এর থেকে আমার বাবার চরিত্র সম্পর্কে একটা ধারণা করে নিতে পারবেন বলে মনে হয়। ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল অকৃত্রিম কিন্তু ফ্যাসিজিম্‌কে তিনি ঘৃণা করতেন।

এই পর্যন্ত বলে মেয়েটি আমাদেব দুজনেব দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ছড়িয়ে বলবো না গুটিয়ে নেব। আপনাদেব হাতে কি রকম সময় আর কি আপনাদেব পছন্দ ঠিক জানিনে তো!

সারা রাতটাই তোমাব গল্পের জন্যে দিতে পারি। আপনি কি বলেন. আলি তার পরিচিত হাসি হাসলেন।

সিগারেটের প্যাকেট বের করে মেয়েটির দিকে ধরলাম। নিজেও একটি সিগারেট তুলে আলিব দিকে প্যাকেট এগিয়ে দিলাম।

আমার ছেলেবেলার কথা যতোদূব মনে আছে কখনো কোন জিনিষের জন্যে আব্দাব করতে হয় নি। মাদ্রিদে আমাদের সেই প্রাসাদের মতো পরিজন-পোষ্য ঝি-চাকরে ভরতি বাড়িটা সব সময় জমজম করত। বাবা প্রায় সব সময় নিজেব কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। সকালে চায়ের টেবিলে অথবা বাড়ির লনের পথে হাঁটবার সময় কথা বলতেন। আমাদের দু'বোনের সঙ্গে অথবা মায়ের সঙ্গে।

পৃথিবীর এত দুঃখ এত যন্ত্রণাব নবক আছে সেটা আমাদের বাড়িতে থেকে কল্পনাও করা যায় না। আমার বাবা-মার স্নেহ স্মরণ করে এখানে বসেও শান্তি পাই। সেই স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে যেখানে এসে পৌঁচেছি সেখানে থেকে হাহাকারের বিলাপোক্তি পাঠানো ছাড়া নিজে আর কোনদিন পৌঁছাতে পারবো না। যে সম্পদ হেলায় পাওয়া যায় মানুষ তার মূল্য বোঝে না। আমাব বেলায়ও ঠিক তাই ঘটেছিল।

হ্যাঁ, কি বলছিলাম। আমার বাবা ও মায়ের একমাত্র কাজ ছিল কি করে আমাদের সুখে রাখা যায়।

আমাদের ছোট বেলার কোন স্বাদ অপূর্ণ থাকেনি। প্রাচুর্য ও বিলাসিতার সীমা ছিল না। খুব আড়ম্বরের সঙ্গে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতাম। আমাদের এত সুখের মধ্যেও একটা কাঁটা সব সময়ই বিঁধত। নিদারুণ ভাবেই আমাদের বিদ্ধ করত। আমাদের •বোনদেব কথা স্বতন্ত্র। বাবা মায়ের কথা ভাবলে বিষণ্ণ হতে হত। এত সম্মান প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও বাবা কোন উৎসবে বা মজলিসে যেতেন না। সেখানে না গেলে নয় সেই সব জায়গায় যেতেন এবং কোন রকমে একটু দেখা দিয়েই উৎসব থেকে সরে পড়তেন। আমাদের জ্ঞান হবার পর তাকে এক-রকম নির্বাসিতের জীবন যাপন করতে দেখেছি।

ভাই-বোন মিলে আমরা তিন জন। দুই বোন এক ভাই। আমি সব চেয়ে ছোট। দিদি আবার আমার থেকে বছব পাঁচেকেব বড়ো। আর দাদা বোধ হয় আমার থেকে দশ বছরেব বড়ো। এই দাদাকে নিয়ে আমাদের পরিবারের দুশ্চিন্তাব সীমা ছিল না।

এত শাসন ও বিধি-নিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে দাদা কি কবে যেন বয়ে গেছিল। বাবার শত রকম চেষ্টাও তাকে ফেরাতে পারেনি। যতো কুৎসিৎ ও অশ্লীল আয়োজনে তার আনন্দ ছিল। সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের প্রতি তার কোন আকর্ষণ ছিল না। একটা মানুষের চরিত্রে পাপের যতো রকম প্রকাশ হতে পারে দাদার চরিত্রে তারই পরিচয় দেখা গেছিল। মাদ্রিদের প্রচলিত জীবনেব নেপথ্যে যে সব কুৎসিৎ কদাচারের স্রোত বইত—রাত্রির অন্ধকারে যে অশ্লীলতা নিজেকে প্রকাশ করত তারই মধ্যে দাদা নিজেকে মত্ত রাখত।

এ পরিবারের সম্মান ও আভিজাত্যের প্রতি তার কোন শ্রদ্ধা ছিল না। নিজের কামনা ও তার সিদ্ধিব জন্যে যে কোন উপায়ই গ্রহণ করতে তার কোন রকম দ্বিধা ছিল না।

এইখানে আমার নিজের ভাবনাব কথা বলি মঁসিয়ে, আপনার

আপত্তি নেই তো ?

না। না-না। আমার ও আলির হয়ে আমি জবাব দিলাম।

অনেক সমাজবিজ্ঞানী মানুষের চরিত্রে পরিবেশের প্রভাবের উল্লেখ করেছেন। তারা বলেছেন সমাজ এবং পরিবেশেব প্রভাবই মানুষের চরিত্রে সব চেয়ে বেশি। অথচ দাদার বেলায় তাব বিপবীতই দেখেছি। আমাদের বাড়ির আবহাওয়ায় কোন অশ্লীলতা ছিল না। সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ একটা জীবনেব প্রবাহ আমাদেব অনাবিল সংসারে বিদ্যমান ছিল। আমরা যাতে নিজেদের আদর্শ হিসেবে গড়ে তুলতে পারি সে জন্যে মা-বাবাব চেষ্টার অন্ত ছিল না।

কিন্তু দাদাব চরিত্রে কোন পবিবর্তন দেখা গেল না। মেয়েদেব সম্পর্কে তাব একটাই ধারণা এবং মেয়েদেব প্রয়োজন সম্পর্কেও একটা মতই পোষণ কবত।

ব্যাপারটা সুরু হয়েছিল আমাদেব বাড়ি থেকে—আপনাকে আগেই বলেছি মঁসিয়ে আমাদের বাড়িতে সাংসারিক কাজের জন্যে অনেক লোক বহাল হত। তাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষেব সংখ্যা প্রায় সমান থাকত। এই সব মেয়েদেব মধ্যে অনেকেব যৌবন থাকত—চোখমুখের চেহারাও খারাপ থাকতো না। ওদেবই একজন দাদাব নজরে পড়েছিল। প্রথমে আমাদের বাড়িব কেউ ব্যাপারটা লক্ষ্য কবেনি। একটু-আধটু করে ফিসফিস কথাব চাপা স্রোত বাড়িব আনাচ কানাচ ভ' গেল।

ঃ মেয়েটিকে ওর ঘর থেকে বেব হতে দেখা গেছে।

ঃ দুজনকে আঙুর গাছের আড়ালে জড়াজড়ি কবে বসে থাকতে দেখা গেছে।

: কর্তাব ছেলেকে কাল রাতে তাব বিছানায় দেখা যায় নি।

এ ধরণেব সংবাদ বাবা ও মায়ের কানেও প্রায়ই হাজির হত। বাবা অত্যন্ত রূঢ় মুখে মায়ের দিকে তাকাতেন। মা কোন উত্তর দিতে পারতেন না। চুপ করে বসে থাকতেন। তাতে বাবা আরো রেগে যেতেন।

আমি কী বলবো, বল ? মাকে কী যে অসহায় মনে হত।

লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।

আমার মাথাও উঁচু নেই। মা উত্তর দিতেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

বাবা শেষে রেগে গিয়ে বলতেন, তোমার ছেলেকে নিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে থাকো।

ছেলে কি আমার একলার ? মায়ের মৃদু জবাব শুনতে পেতাম।

এ রকম ভাবে তো এখানে থাকা যাবে না। চাকরদের মুখে সারা সহরে রাষ্ট্র হয়ে যাবে।

তা হয়তো যাবে। কিন্তু উপায় কি ?

তা হলে আমি কোথাও সরে যাই।

ভেবে দেখ। তুমি যা ভালো বোঝ তাই হবে।

সেদিনকার মতো ব্যাপারটা চাপা যেত। কয়েকদিন বাদে আবার সেই একই ধরণের ঘটনার অনুবৃত্তি প্রাতরাশের টেবিলে বাবা ও মায়ের কথায় টের পেতাম।

মেয়েটিকে আমি দেখতাম। অত্যন্ত শান্ত শিষ্ট। কাজে অবহেলা নেই। কখনো ঝগড়া করতেও শুনিনি।

দিদি কখনো ওর কাছে কোন অসুবিধার কথা জিজ্ঞাসা করলে, উত্তর পেয়েছে, না, কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

অনেক ছোকরা চাকর আমাদের বাড়িতে থাকত। তারা প্রত্যাশা করেছিল মেয়েটা তাদের প্রয়োজন মেটাবে। অথচ তাদের গ্রাস থেকে ফসকে যেতে দেখে তারা মরীয়া হয়ে ওর চালচলনের ওপর লক্ষ্য রাখছিল। এবং সময় বুঝে লোক দিয়ে মা অথবা বাবার কাছে সংবাদ পৌছে দিচ্ছিল।

এইখানে দিদির কথা একটু বলি। ছোট বেলা থেকেই দিদিকে আমার আশেপাশে সর্বদাই দেখেছি। তার আদর যত্নের কথা কখনো ভুলতে পারবো না। দিদিকে দেখে মনে হত যেন কোন বিষণ্ণ

রাজকুমারী। অত্যন্ত সঙ্গোপনে সে নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে চলতো। কখনো উচ্চগ্রামের হাসি কিংবা উচ্চকিত কথা তার গলায় ভেসে উঠত না। হয়তো গলায় তা' মানাতো না। নিজের ঘরে বসে পড়াশোনায় দিন কাটাতো। তার বান্ধবীব সংখ্যা ছিল সীমিত। এমন করে কথা বলতো দিদি যা বইয়ের লেখা ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না।

দিদিকে একবাব শুধু চঞ্চল দেখলাম। বাবাব ইতালিয়ান বন্ধুর ছেলে আমাদের অতিথি হয়ে এসে আমাদেব সকলের মন জয় করে নিলেন। বোধ কবি দিদিবও। দিদির ঘরেই তাকে বেশির ভাগ সময় পাওয়া যেত। আমাব মনে হল ওবা পৃথিবীটা ক্রমশ নিজেদের মধ্যে ছোট কবে নিচ্ছে। আমাব উপস্থিতি ওবা গ্রাহ্য করত না। ওদেব সঙ্গে বেড়াতে বেব হতে চাইলে ভীষণভাবে আপত্তি করতো দিদি।

দিদি, ব্যাপাবটা নিয়েও বাড়িতে আবার নতুন আলোচনা বয়ে যেতে লাগল। তবে সে আলোচনা ছিল সংযত। এবং সম্ভ্রমযুক্ত।

ইতালিয়ান ভদ্রলোক চলে যাবাব পর দিদিকে কেমন উন্মনা দেখলাম। দিদির আলাপ আবো মৃদু হয়ে এল। ডাকলেও সব সময় সাড়া পাওয়া যেত না। কেমন যেন ভাবের ওপব ভর করে দিদি চলাফেবা কবত।

ইতালিয়ান ভদ্রলোক থাকতে একদিন একটা ব্যাপাব দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছিলাম। সে কথাও কাউকে বলতে পারিনি। শুধু আমার অপবিণত মনেব মধ্যে ব্যাপাবটা অনেকদিন গুনগুন করে ফিরেছিল। আপনি জানেন কি না জানি না মঁসিয়ে আমাদের মাদ্রিদে এক-একদিন ময়ুরকণ্ঠী সূর্যাস্ত দেখা দেয়। রঙের হীরেপান্না পোকরাজ মেঘের গায় ছায়া ফেলে। তেমন এক সন্ধ্যাবেলা আমি বুঝি সূর্যাস্তের রঙ দেখতে ছাদে উঠেছিলাম। ছেলেবেলায় এটা আমার অদ্ভুত খেয়াল ছিল। আজকে সে খেয়ালকে অলীক বলে মনে হয়।

আমাদের বাড়িটা অনেক পুরোন। এবং প্রাচীন দুর্গ নির্মাণের কৌশলে তৈরি। অনেকবার এই বাড়িটা বিদেশি হানাদারদের

আক্রমণ ঠেকিয়েছে। তার মধ্যে আফ্রিকার মূর হানাদারদের কথা বিশেষভাবে বলা যেতে পারে। এখানে অবশ্য সে সব অবান্তর।

যেখানে থেকে শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ্য করা হত ছাদের সেই উঁচু শিখরটার দিকেই আমার লক্ষ্য। আমি ছাড়া কেউ সেখানে বড়ো উঠত না। আকাশের সঙ্গে আমার এক আশ্চর্য মিতালি ছিল। দিদিকে সেখানে কখনো দেখিনি। অনেক সিঁড়ি ভেঙে গোলঘরের মাথায় উঠে চমকে গেলাম।

দিদিকে দেখলাম সেই ইতালিয়ান ভদ্রলোকের বাহু বেষ্টনীর মধ্যে নিজেকে সঁপে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দিদির রেশমি চুল বাতাস লাগছে। আমার দিকে লক্ষ্য করবার মতো অবসর কারো ছিল না। ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। অল্প বয়েস। কিছু একটা রহস্য এর মধ্যে আছে নিশ্চয়ই। মনে মনে ভাবলাম।

আপনি জানেন ম'সিয়ে, কতকগুলো ব্যাপারে মেয়েদের সহজাত জ্ঞান থাকে, যে জিনিষটা তখনো আমার কিশোর কালের কাছে ধরা পড়েনি। অথচ যার আভাস পাচ্ছি সেই আমাকে খবর দিল মেয়েদের জীবনের এই আশ্চর্য বসন্তের।

আমি কাঁপছিলাম। ভয়ে। না হৃদয় পরাস্তকারী এক প্রগ্‌লভ সময়ের সাবলীন আর্বির্ভাবের ভয়ে নয়। হয়তো ভয়ে। অজ্ঞাত। অদৃষ্টপূর্ব এক দৃশ্যের বিহ্বলতায়। রোমঞ্চকর পুলকের তৃষ্ণায়।

কতোক্ষণ যে এমন করে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম জানি না। আমার নিজের মধ্যে কিসের বেদনা যেন মৌমাছির মতো গুনগুনিয়ে উঠল।

মাদ্রিদের আকাশের সেই আরক্ত আরক্ত আকাঙ্খিত সূর্যাস্ত নেপথ্যে ডুবে যেতে লাগল। তার রঙের বিচিত্রতা জলছবির মতো ছায়া ফেলে সেই দুটি মানব-মানবীকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। সিলুয়েট ছবির মতো তাদের অস্তিত্ব আমার চোখের জানালায় স্থিরচিত্রের মতো নিবদ্ধ হয়ে রইল। চোখ থেকে কতটুকু দূর অথচ কতো সুদূর!

তারা নিজের মধ্যে ডুবে ছিল। আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে তাদের

কোন জ্ঞান ছিল না। তাদের কোন প্রয়োজনও ছিল না। অথচ সেইদিন এক নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেলাম। আমার নিজের মধ্যে এক আনন্দের অনুভূতি এল।

সূর্যের আলো ডুবে গেল। অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। ওদের শরীর সংস্থান ছায়া হয়ে গেল। আমি তখনো বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, একবারও মনে হল না আমার চলে যাওয়া উচিত। আমার সমস্ত ইচ্ছা আমাকে সংহত করে রেখেছিল।

সন্ধ্যা যখন বেশ ঘন হয়ে এল। রাতের আকাশে রাশি রাশি তারা উঠল। তখন আমার খেয়াল হল এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। অথচ সরে যেতে গেলে পায়ের শব্দে ওরা যদি টের পায়। তাই একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলাম।

হঠাৎ এক সময় দিদির কান্নার শব্দ পেলাম। দিদি কাঁদছে। অবাক হয়ে গেলাম। শুনতে পেলাম দিদি কান্নাজড়ানো গলায় বলছে, তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না। কিছুতেই পারবো না লিওনার্দ।

কয়েকটা দিন অপেক্ষা করো।

একটা দিনও অপেক্ষা করতে পারবো না। দিদি কান্নায় ভেঙে পড়ল।

কিন্তু কোন উপায় নেই!

অন্ধকারে ওদের দেখতে পাচ্ছি না। অথচ ওদের অলৌকিক সংলাপ বাতাসে ভেসে আসতে লাগল।

একটা ঋতু অন্তত তোমাকে অপেক্ষা করতেই হবে। আমি সম্মানের সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই তোমাকে।

সে যে অনেক দেরি! দিদি ফুঁপিয়ে উঠল।

তারপর দুজনে হাত ধরাধরি করে অন্ধকারে নামতে লাগল।

দিদি বলল, কষ্ট হবে তা হোক। তবু সহ্য করে থাকবো।

আমি ওদের পিছনে অন্ধকারে পা টিপে নামছিলাম। নীচে নেমে ওরা সহজ হয়ে গেছিল। আমি শুধু আলোতে ওদের দেখে ভাবছিলাম

অন্ধকারে যাদের দেখেছিলাম এরা কি তারাই।

আমি আমার পড়ার ঘরে চলে গেলাম। চোখের সামনে বইয়ের পাতায় দিদি আর লিওনার্দের মুখটা বার বার ভেসে উঠতে লাগল। অক্ষর ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল। দিদিব প্রতি কেমন একটা ঈর্ষা অনুভব করলাম। মন বারে বাবে উন্মনা হয়ে অন্য কোথায় আর কোথাও সরে যাচ্ছিল। যে জগতেব পরিচয় আমি পাইনি অথচ যা আমার কল্পনায় বিন্দু হয়েছিল তাই যেন সিন্ধুব ফেনিলতা নিযে আমাকে ঘিরে ফেলল।

পরের দিন সকালে লিওনার্দ চলে গেলেন। দিদিকে আব বাইবে দেখা গেল না। দিদি মাঝে মাঝে বলত, আমাব যা কিছু সব তোকে দিয়ে যাবো।

তুই কোথায যাবি দিদি? আমি বোকাব মতো তাকাতাম তার দিকে।

যাবো এক জায়গায়।

সে কোথায়?

জানিনে। তাবপব একটু থেমে বলতো, সে অনেক দূবে—

আমি তোব সঙ্গে যাবো দিদি

তুই পারবি মাকে ছেড়ে থাকতে!

দিদি আমাব সে সব কথা কানে তুলত না। বলত, আমাব যা কিছু আছে সব তোকে দিয়ে যাবো। আমাব সব কিছু। সব—

দিদি হয়তো ভাবতো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না বা দিদির বদান্যতা দেখে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমি যে সব জানি—সে কথা দিদিকে বলতে আমার মুখে আটকাতো। সেই ভালো আমি যে কিছু জানিনে—এইটুকু জেনে দিদি সুখি হোক। সেই ভালো, সেই ভালো।

দিদি সম্পর্কে বাড়িতে সমস্ত আলোচনা যখন থিতিয়ে এসেছে তখনই সেই ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিবাহের প্রস্তাব এসে হাজির হল।

বাড়িশুদ্ধ সবাই অবাক হয়ে গেল। আর দিদিকে লজ্জায় একটু কুণ্ঠিতা দেখলাম। বাবা পর্যন্ত অবাক হয়ে গেলেন। আরো অবাক হয়ে গেলেন এইজন্যে যে চিঠির শেষে লেখা ছিল দিদিরও নাকি অমত নেই।

বুঝতেই পারছেন মঁসিয়ে, সে যুগের বাপ-মায়েরা এ ধরণের ব্যাপারটা কি রকম চোখে দেখে থাকেন। বিশেষ করে স্পেনের মতো দেশে—যেখানে মধ্যযুগের পর আর একটুও এগোয়নি। জিপসি ডাইনি আর বুলফাইটের ওপর দিয়ে সময় হেঁটে চলেছে।

চিঠি পেয়েই বাবা দিদিকে ডেকে পাঠালেন। আমি পাশের ঘরের আলমারির পিছনে জানালার গর্ত দিয়ে ব্যাপারটা দেখতে লাগলাম। মা পাশেই বসেছিলেন। বাবা দিদিকে জিজ্ঞেস করলেন, চিঠিতে যা লেখা তা কি সত্যি ?

দিদি অনেকক্ষণ কোন উত্তর দিল না। শেষে বাবার ধমক সহ্য করেও অস্বীকার করল না, ব্যাপারটা মিথ্যে।

বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন, বেরিয়ে যাও—যাও—এ সব কাজ আমার বাড়িতে আমি বরদাস্ত করব না।

বেশ তাই যাবো। দিদি সহজ গলায় উত্তর দিল।

কি ? বাবা রাগে উত্তেজনায় চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন। মা বাবাকে বসিয়ে দিলেন চেয়ারে। দিদি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাবা গুম হয়ে রইলেন! মা কিছু একটা বলবার জন্যে উসখুস করতে লাগলেন। অথচ বাবা জিজ্ঞেস না করলে কিছু বলতেও পারছেন না। অনেকক্ষণ বাদে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কি বলবে তুমি ?

মা উত্তর দিলেন, তোমার আপত্তি কিসের ?

সামাজিক অনাচার। একে আমি প্রশ্রয় দিতে পারি না।

তোমার নিজের কথাটা ভুলে গেলে।

তার মানে ?

বিয়ে হবার আগে আমরা কি কাউকে চিনতাম না ? লুকিয়ে

আমার সঙ্গে দেখা করবাব জন্যে বিয়ের আগে আমার ঘবে হাজির হওনি ?

বাবা চুপ করে রইলেন।

মা বলে চললেন, ওবা তো অশোভনতাব পবিচয় দেযনি। দুজনকে দুজনেব ভালো লেগেছে—দুজনে দুজনেব মনকে চিনেছে—ছেলে হিসেবে লিওনাদ তেমন ফেলনা নয়। জমিদাবী আছে। ব্যালান্সেব অঙ্ক ব্যাঙ্কেও খুব খাবাপ নয।

হুম্। বাবা মাযেব দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বইলেন।

আমবা চিবদিন থাকবো না। ওবা যদি সুখি হয আমবা কেন বাধা দিতে যাবো—শুধু মন্দটা আমাদেব বিবেচনা কবে দেখতে হবে।

সেদিন ঐ পযন্ত শোনা গেল। কে একজন এসে পড়াতে বাবাকে বাইরে যেতে হল।

বাবা আব মাকে তাবপব আব কোনদিন এ বিষযে আলোচনা করতে শুনিনি। জানিনা ব্যাপাবটা কিভাবে ওদেব মধ্যে আলোচনা হয়েছিল। দিদি কখনো বাবাব সামনে যেত না। সব সময নিজেব ঘরে সকলেব অগোচবে থাকত। বোধহয সেই দিনটির প্রত্যাশায।

কযেকদিন বাদে চাযের টেবিলে মা অপ্রত্যাশিতভাবে দিদিব বিযেতে বাবার সম্মতি এবং এপ্রিলেব শেষাশেষি বিযেব সম্ভাব্য দিন ঘোষণা করলেন। দিদিব মুখে একটা বক্তিম আনন্দেব উচ্ছাস ছাড়িযে পডল। অত্যন্ত সন্তর্পণে একটা বিহ্বলতা আশ্রয পেল।

লিওনার্দেব কাছে খবর গেল। তাকে মাদ্রিদে আসবাব জন্যে চিঠি দেওয়া হল। অনেকদিন বাদে সমস্ত বাড়িটা একটা আসন্ন উৎসবেব মুখোমুখি হবাব জন্যে দিন গুনতে লাগল। বাড়িতে দবজিদেব আনা-গোনা বেড়ে গেল। স্বর্ণকাব ও সৌখিনদ্রব্য বিক্রেতাদেব যাতাযাত ঘন হযে উঠল।

দাদাকে বাড়িব এসব ব্যাপাবেব মধ্যে কোথাও পাওয়া যেত না। সে তার নিজেব নেশা আর আনুষঙ্গিক ব্যাপাব নিযে ব্যস্ত থাকতো।

এমনি করে যদি ব্যাপারটা চলে যেত তা হলে হয়তো অসুবিধা হত না। ঈশ্বরের বোধহয় তাই অভিপ্রায় নয়।

বাবা একদিন রাত করে বাড়ি এলেন। বাড়ির সবাই তখন ঘুমিয়ে আছে। বোধহয় মাত্রিদে কেই আর জেগে নেই।

আউট হাউস থেকে বাড়িতে আসতে অনেকখানি পথ পার হয়ে আসতে হয়। গাছপালা ঝোপঝাড়ে ঘেরা কুঞ্জবনের মতো—সেই পথটুকু পার হতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। কাছেপিঠে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে কোথাও ধ্বস্তাধ্বস্তির আওয়াজ পেলেন। এগিয়ে গেলেন তিনি সেদিকে। কয়েক পা এগিয়ে তাকে থামতে হল। কয়েকটা অস্ফুট সংলাপ তার কানে ভেসে এল।

দোহাই লক্ষ্মীটি এমন করে আমার সর্বনাশ করো না।

আমি কোন কথা শুনবো না।

আমাকে ক্ষমা করো। কালই আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো।

আমি যদি যেতে না দি। হাসির শব্দ পাওয়া গেল। কথকের গলায়।

হা ঈশ্বর। আর্তনাদ ভেসে এল।

আকাশে এক চিলতে চাঁদ। সেই কাননভূমির ওপর রহস্যের ছায়া ফেলেছে। বাবা আর এগোতে পারলেন না। সেখান থেকেই ফিরতে হল। একটি কণ্ঠ যে তার পুত্রের এ বিষয়ে নিশ্চিত হলেন। জানি না সেদিন রাত তার কেমন করে কেটেছিল। পরের দিন সকালে দাদার ডাক পড়ল তার দরবারে। এমনিতে দুজনে দুজনকে এড়িয়ে চলত। কথাবার্তাও বিশেষ ছিল না। দেখা হত কদাচিৎ।

নিশা জাগরণের পর দাদা ক্লান্তির ঘুমে অচেতন। বাবার খাস চাকর দুবার তাকে ডাকতে গিয়ে গালাগালি আর মার খেয়ে ফিরে এল। শেষে প্রহরীদের দুজন তাকে তুলে নিয়ে এল। বাবা তৈরি ছিলেন। সেই অবস্থায় চাবুক চালালেন। প্রথমে মুখের ওপর শেষে সারা শরীরে। ভয়ে আমি কাঁপছিলাম।

দাদা ব্যাপারটা প্রথমে বুঝে উঠতে পারেনি। দাদাব নড়াচড়া করবাব উপায় ছিল না। প্রহবী দুজন তাকে ধরে ছিল। ক্লান্ত হয়ে বাবা বললেন, ওকে বেব কবে দাও—আব যেন কখনো এ বাড়িতে না-ঢোকে।

দাদাকে বেব কবে দিযে দাদার মুখেব উপব দবজা বন্ধ কবে দেওযা হল। মেযেটিকেও তাব পবেব দিন কোথায যেন পাঠিযে দেওযা হল।

কিছুদিন ধবে বাড়িব প্রাণ গুমবে বইল। তাবপব একটু কবে আবাব কথাবার্তা শোনা যেতে লাগল। বাড়ি তাব স্বাভাবিক জীবনে ফিবে এল। শুধু ফিবে এল নয—দিদিব বিযেব আযোজনে নতুন কবে মেতে উঠল। মাঝখানে যে দুর্ঘটনা ঘটে গেছিল সেটুকু ক্ষতও সময তাব হাত দিযে মুছে দিল।

দাদাকে যদিও তাবপব প্রত্যাশা কবেছি—কিন্তু দেখা পাইনি। শুনতাম দাদা প্রকাশ্যে মদ খেযে বেলেল্লাপনা কবে বেড়াচ্ছে। তাব সঙ্গে প্রায়ই একদল নষ্ট মেযে ও পুরুষ থাকে। চাকববা বলতো, পুলিশ নিশ্চযই বাবাব কাছে দাদাব বিষয রিপোর্ট করবে।

দাদা চলে যাবার পব বাবাকে অন্যমনস্ক দেখতাম। কি জানি কেন। বোধ হয ছেলেব জন্যেই। হতেও পাবে। নাও হতে পাবে।

সেদিনটাব কথা মনে নেই। মাসটা বোধ হয বসন্তেব স্নুরু। দিদিব বিযেব সপ্তাখানেক বাকি। তাড়াতাড়িতে কেনাকাটা শেষ কবে নেমন্তন্ন স্নুরু কবতে হবে। এই জন্যে বাবা আব মা দুজনে বাজাবে বেরুলেন। আমি ওদেব পিছু নিলাম। মা বললেন, তোব দিদি একলা থাকল যে—

থাক না।

বিযের আগে একলা থাকতে নেই।

আমি বাড়ি থাকলেও সেই একলাই থাকবে।

কেন?

নিজেব ঘবেব মধ্যে দরজা বন্ধ করে। আমাকে ঢুকতেই দেবে না।

তবুও।

একগাদা চাকবঝি রইল। আমি নিজেই গাড়িতে উঠে পড়লাম। দূরে বাবার লাঠিব শব্দ শুনতে পেলাম। বুঝলাম বাবা আসছেন।

বাবা গাড়িতে ওঠাব সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছেড়ে দিল। প্রথমে কয়েকজন নিকট আত্মীয়েব বাড়িতে গেলাম। সেখান থেকে বাজাবে। ফিবতে অনেক দেবি হয়ে গেল। রাত্তিব প্রায় দশটা হবে। ঘুরে ঘুবে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। বাড়ি ফিবেই নিজের ঘরে চলে গেলাম। মা দিদির জন্যে সখ কবে লাইপলাজুলিব একটা আংটি কিনে এনেছিলেন। একটু বিশ্রাম করেই তাব ঘবে দিদিকে ডাকলেন আয়া সাবা বাড়িতে খোঁজ কবেও দিদির কোন পাত্তা পেল না।

মা এমনিতেই দিদিকে আংটি দেখাবার জন্যে অধীর হয়ে পড়েছিলেন। তাব ওপব আয়াব এই দেবিতে অধৈয হলেন। আয়া তাঁর ঘরে উপস্থিত হতে মা খেঁখিয়ে উঠলেন, সাবা বাড়িতে খুঁজে এলি নাকি?

মাথা নাড়ল আয়া।

তার মানে?

দিদিমনিব ঘবে গিয়ে দেখি দিদিমনি নেই। তখন সাবাবাড়িটা খুঁজে কোথাও পেলাম না। তাইতো দেরা।

চাকববা কেউ খবর দিতে পাবল না—বেরিয়ে গেছে কিনা!

বিকেলেব পব তাবা কেউ দেখেনি।

বেবিয়ে যেতেও পাবে। মা নিজেব মনে বললেন, ওর কোন বান্ধবীর বাড়ী—

দাবোয়ানের কাছেও গেছিলাম। সে তো স্পষ্টই বলে দিল, দিদিমনি আজ সাবাদিনে একবাবও বেব হননি।

মা ততক্ষণে বিপদ উপলব্ধি করলেন। তাড়াতাড়ি নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বাবাকে ডাকলেন। বাবা শুনে বললেন, গেছে কোথাও ফিরতে দেরী হচ্ছে।

কি বাজে কথা বলছ। শুনছ যে দারোয়ান তাকে আজ সারাদিনে একবারও বাইরে যেতে দেখেনি।

তা হলে! বাবাও একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তারপর চাকরদের সারা বাড়িটা তন্ন তন্ন করে খুঁজতে আদেশ দিলেন।

চাকরগুলো মশাল জ্বালিয়ে হল্লা করে সারা বাড়ি খুঁজতে বের হল। গোলমাল শুনে আমি নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ঈশ্বরের কাছে দিদির জন্যে প্রার্থনা করলাম। বুকের মধ্যে একটা অজানা আশঙ্কা কেঁপে উঠল।

অব্যবহৃত অন্ধকার ঘরগুলোর দরজা খুলে গেল। মশালের লাল আগুনে অন্ধকার পুড়ে গেল। বাদুরগুলো তীক্ষ্ণ চিৎকার করে ডানা ঝাপটাতে লাগল। পথ-চলতি নাগরিকেরা কিছু একটা অদ্ভূত ব্যাপার হয়েছে ভেবে পথে থমকে গেল।

'গভীর রাত পর্যন্ত অনুসন্ধান চলল। দিদির কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। বাবার মুখ কালো হয়ে গেল। মা দাঁড়াতে পারলেন না। নিজের ঘরে গেলেন। আমাদের সেই পুরোন বাড়িটা অনেক কাল পরে উত্তেজনায় দপ দপ করতে লাগলো। সে রাত্তিরে আমাদের বাড়ির কেউ ঘুমোল না।

পরদিন সকালে বাবা নিজে পুলিশ কমিশনারকে খবর দিয়ে এলেন। গোটা দশেক নাগাদ তিনি এসে সরেজমিনে তদন্ত করে গেলেন। কিন্তু ব্যাপারটা আগের মতোই দুর্বোধ্য রয়ে গেল। দিদির এই অস্বাভাবিক অদৃশ্য হবার পিছনে কোন কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না।

সম্ভবপর সমস্ত জায়গারই তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করা হল। দিদির বান্ধবীদের ডেকে কিংবা তাদের বাড়ি গিয়ে বাবা নিজে জেরা করে এলেন।

কিন্তু ফল যথাপূর্বম।

দু'তিন দিন পার হয়ে গেল। দিদির ব্যাপারে সারা সহর তোলপাড় করা হল। পুলিশ নিষিদ্ধ এলাকা তচনচ করে ফেলল। কোন ফল

হল না। সমস্ত জাহাজের উপর কড়া নজর রাখা হল।' বলা যেতে পারে চেষ্টার কোন ত্রুটি হয়নি।

এই সব ঘটনার কোলাহলের মধ্যে আমার কিছু করবার ছিল না। শুধু দূর থেকে ব্যাপারগুলো লক্ষ্য করে যাচ্ছিলাম।

একতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠছিলাম হঠাৎ আমার মনে হল মাটির নীচের ঘরগুলো কেউ খোঁজ করেনি। সেখানে একবার দেখতে পারি। কিন্তু দিদি কেন মাটির নীচের ঘরগুলোতে থাকবে একথা আমার মনে হল না। ভাবলাম দুপুরে বাড়িটা যখন ঝিমুবে তখন আমি নীচে নামব।

অধৈর্য প্রতীক্ষার পর দুপুর এল। এই সময়েই সারা বাড়িতে কাজের বিরতি ঘটে। চাবি ঘরে গিয়ে পুরোন চাবির বাকসো হাতড়ে পাতালে যাবার ঘরের চাবি এনে রেখেছিলাম। একটা মোমবাতি জোগাড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম। চারদিকে সজাগ চোখ রেখেছিলাম কেউ যেন দেখে না ফেলে। সিঁড়ির অন্ধকারে দরজার কাছে এসে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। দরজায় তালা নেই। একেবারে হাট করে খোলা। চাবিটা আমার হাত থেকে পড়ে যাবার মতো হল। সাহসে ভর করে মোমবাতি জ্বাললাম। মোমবাতির আলোয় দেখলাম অন্ধকারে সিঁড়ি ঘুরে ঘুরে পাতালে নেমে গেছে। একবার ভাবলাম কেউ হয়তো পুরোন মদ নিতে এসেছে। চাবি দিতে ভুলে গেছে। আপনি বোধহয় জানেন মঁসিয়ে, ইউরোপের সব বনেদি পরিবারে মাটির নীচে স্যাঁৎলা ধরা মাটির জালায় মদ রেখে পুরোন করা হয়। আমাদের মাটির নীচের কোন ঘরে সেই জালা ভর্তি পুরোন মদ সারি দেওয়া থাকতো। সূর্যের আলো থেকে অনেক দূরে ভিজে আবহাওয়ায় পুরুষানুক্রমে দীর্ঘদিন ধরে সেই দ্রাক্ষারস রমণীয় হয়ে উঠত। তারপর বিশেষ অনুষ্ঠানে বা বাড়িতে কোন অতিথি এলে তখন সেই দ্রাক্ষারস দিয়ে তাদের আপ্যায়িত করা হয়।

যাই হোক, আমি ভাবলাম ফিরে যাই। পরে মনে হল একটু

অপেক্ষা করে দেখা যাক কেউ যদি গিয়ে থাকে নীচে এখুনি ফিরবে।

সিঁড়ি থেকে সরে গিয়ে আলো নিভিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর অপেক্ষা করতে লাগলাম। বাইরে তখন হয়তো তুপুর গড়িয়ে গেছে। আর সেই অন্ধকূপের মধ্যে অন্ধকার স্থির হয়ে আছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন কারো দেখা পেলাম না আলো জ্বেলে সিঁড়িতে পা দিলাম। এক—এক পা নীচে নামি আর পিছনেব অন্ধকাব ঘন হয়ে উঠে। রৌদ্রালোকহীন স্যাওলা ধরা দেওয়ালে কতো দিনের পুরোন গন্ধ তাজা বাতাস পেয়ে কিলবিল করে উঠলো, দম নিতে যেন কষ্ট হয়। তবু সাহসে ভর করে এগিয়ে চললাম।

একেবাবে শেষ সীমায় গিয়ে হাজির হলাম। সিঁড়ির সামনে বড়ো একটা চাতাল। তাবপব লম্বা করিডোর। তু পাশে ঘরের সারি।

কোথাও এক ফোঁটা বাতাস নেই। চারদিক এত শান্ত যে আমার নিঃশ্বাসের শব্দই আমার কানে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। মোমবাতির শিখা স্থিব হয়ে আছে। চাতাল পার হয়ে ঘরের সামনে এগিয়ে গেলাম। এই জায়গাটার নাম চাকরবাকরদের মুখে অনেকবার শুনেছি। এই জায়গাটা নিয়ে তারা বাড়িতে অনেক ভৌতিক উপাখ্যানের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু আমার সেই সব গল্প মনে আসা সত্বেও একটুও ভয় পাই নি। এই কথাটা মনে রেখেছিলাম যে দিদিকে খুঁজে বের করতেই হবে।

কয়েক পা এগিয়ে থামতে হলো। অনেক কাল কেউ এই পাতাল পুরিতে আসেনি, চারদিকের ভিজে আবহাওয়ায় এক ধরণের স্যাওলা জমেছিল। সেই স্যাওলার ওপর একজোড়া পায়ের অনেকগুলো দাগ দেখলাম। এলোমেলো। অসংলগ্ন। বিভ্রান্ত। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর নীচু হয়ে মোমবাত্তির আলোয় দেখলাম তু পায়ের দাগ সামনেরঁ দিকে এগিয়ে গেছে। অনেকক্ষণ লক্ষ্য করলাম, তারপর সেই পায়ের দাগ অনুসরণ করে এগিয়ে চললাম। বুকের মধ্যেটা দ্রুত ফেনিয়ে উঠছে। কে গেছে এ পথে। কি তার উদ্দেশ্য এই সব

নানান কথা ভাবতে গিয়ে অনেকখানি এগিয়ে এসেছি। করিডোর সামনে একটু বাঁক নিয়েছে। সেই জায়গাটা দেখলাম দেওয়ালের গায় কিছু একটার দাগ—স্যাওলার গায় হেঁচড়ে টেনে নেওয়ার দাগ চিহ্ন।

থমকে দাঁড়ালাম। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম পায়ের দাগ একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেছে। দেখলাম তালাটা ছিটকে একপাশে পড়ে আছে। দরজার সামনে এগিয়ে গেলাম। একেবারে সামনে নয়—একটু দূরে সরে রইলাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম যে ভেতরে ঢুকেছে সে এখুনি বেরিয়ে আসবে। আর সেই একজন যে দিদি এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না।

অপেক্ষা করবারও একটা সীমা আছে। আমার মোমবাতি ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে। আলো নিভে যাবে। এই অন্ধকারে পিছনে ফিরে উপরে উঠে যাওয়া ছাড়া কিছু করবার থাকবে না।

এগিয়ে গেলাম সামনে দিকে—দরজাটা ভেজানো ছিল। একহাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে খুলে দিলাম। আর্তনাদ করে কপাট দুটো সরে গেল। দরজার চৌকাঠের ওপর গিয়ে দাঁড়ালাম। ঘরের স্যাওলা ধরা পুরোন জালা স্থবির হয়ে পড়ে আছে। তাদের গায় স্যাওলার নানা আঁকা-বাঁকি। ভেতরে ঢুকলাম। সবে একটা মাকড়সা বাসা বাঁধবার চেষ্টা করছে। বাঁয়ে ফিরলাম। তারপর দক্ষিণে। পিছন ফিরতে গিয়ে যা দেখলাম—এখনো মনে করলে শিউরে উঠি। দারুণ একটা আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলাম। হাত থেকে মোমবাতি পড়ে গেল।

নিজের কানেই শুনলাম আমার আর্তনাদ সেই অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে শত শত বৎসরের নির্জনতাকে কঁপিয়ে ফিরছে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে মনে হল আমার জ্ঞান নেই। যা দেখেছি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে চৈতন্যের আলোয় তাকে নতুন করে দেখতে পেলাম। আমার দিদির মুখ। আমার দিদির শরীর। রক্তাক্ত বিকৃত।

তারপর কি করে উপরে উঠে এলাম সে কথা মনে নেই। মায়ের

সামনে পৌঁছে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। জ্ঞান হবার পর বিড়বিড় করে দিদির নাম উচ্চারণ করলাম। পাশে মা-বাবা আর ডাক্তারকে দেখতে পেলাম। সুস্থ হয়ে দিদির কথা মাকে বললাম। বাবা নিজে লোকজন নিয়ে মশাল জ্বেলে দিদির শব তুলে আনলেন। কোন নরপশু তাকে ভোগ করে হত্যা করে রেখে গেছে। এ ধরণের ব্যাপার বোধ হয় আমাদের মাদ্রিদে এই প্রথম। চব্বিশ ঘণ্টা দিদির শব বাড়িতে রেখে দেওয়া হল। তারপর দিন সকালে আমাদের পারিবারিক সমাধিচত্বরে নিয়ে সমাধিস্থ করা হল।

সেই লেবু গাছটার তলায় দিদিকে শোয়ানো হল যে গাছটা দিদির অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কোন বিশেষ দিনে আমাদের প্রিয়জনদের সমাধিতে ফুল দিতে এসে দিদি ঐ গাছটার নীচে দাঁড়াত। তা ছাড়া আমার বেশ মনে আছে একবার দিদি আমাকে বলেছিল, যদি মরি তবে আমাকে ঐ গাছটার নীচে শুইয়ে দিস। দিদির কথাই থাকল। সামনের বসন্তে যখন লিনডেন গাছটায় নতুন ফুলের গন্ধ থই থই করবে—দক্ষিণ দিক থেকে বাতাস আসবে—নতুন সূর্যের আলো পাতার ছায়া ভেঙে ডাল-পালার নীচে নেমে আসবে তখনো দিদি এখানেই ঘুমোবে। এই মাটির নীচে। ব্লু-বার্ড শিস দেবে—রবিন পাখা দোলাবে।

বাড়ি ফিরে এলাম। সমস্ত বাড়িটা কয়েকদিনের মধ্যেই তার পুরোন যোগসূত্র হারিয়ে ফেলল।

দিদির মৃত্যুকে মৃত্যু বলেই মনে হল না। মনে হত, হয়তো এখনি দিদি দরজার সামনে এসে দাঁড়াবে। আমার নাম ধরে ডাকবে।

মা আর বাবা দুজনেই একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন।

দিন এমনি করে যাচ্ছিল। দিদির মৃত্যুর কারণটা জানা গেছিল। কিন্তু কে এই বীভৎস মৃত্যুর জন্যে দায়ী সেটা কিছুতেই খুঁজে বের করা গেল না। সেই অজ্ঞাত কারণের জন্যে সবাই উৎসুক হলেও অন্বেষণের পথ অন্ধকারে ঘেরা।

এই ঘটনার মাস খানেক পরের কথা। দিদির মৃত্যুর দিনটা অনেক

খানি দূরে চলে গেছে। ক্রমশঃ ফিকে হয়ে যাচ্ছে শোকের উত্তাপ। পৃথিবীকে আবার নতুন করে ভালো লাগছে। ওরি মধ্যে একটু বিষণ্ণতা জড়িয়ে সমস্ত কাজে উদাসীন করে দিয়েছিল।

সেদিনটা রবিবার। চার্চে যাবার দিন। আমি রবিবার ভোরে উঠে দিদির কবরে ফুল দিয়ে পোষাক পরে তৈরী হচ্ছিলাম। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। ফোনটা বেজেই চলেছে। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ফোন-ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলে সাড়া দিলাম।

এধার থেকে সাড় এল, মাদ্রিদ হেড পি এস্ থেকে বলছি, সিনর ফিলিপ ম্যাস্তি'নিয়াকে চাই।

একটু ধরুন ডেকে দিচ্ছি।

বাবাকে ডেকে দিলাম।

বাবা এসে ফোন ধরলেন, হ্যাঁ—আমার ছেলে। ওর সম্বন্ধে আমার কিছু বলার নেই। যা ইচ্ছে করতে পারেন। আমার সঙ্গে ওর কোন পারিবারিক সম্পর্ক নেই।..... তবু যেতে হবে। পরে যাবো না হয়। কী বলছেন—স্বীকারোক্তি—কিসের? আচ্ছা এখনি যাচ্ছি—বাবা ফোন রেখে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। আমি বাবাকে অনুসরণ করলাম। বাবা গাড়ীতে ওঠবার সময় বললাম, আমি তোমার সঙ্গে যাবো বাবা।

কেন? বাবা বিরক্তির চোখে তাকালেন, থানায় তোমার যাওয়ার কি দরকার?

তুমি একলা যাচ্ছো। আমি সঙ্গে থাকলে—

বাবা আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর খুব আস্তে বললেন, এসো—

গাড়ী থেকে নেমে দুজনে সেই বাড়িটার মধ্যে ঢুকলাম। অন্ধকার করিডোর দিয়ে ভেতরে ঢুকে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেলাম।

পুলিশ কমিশনার আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। বাবাকে সম্মান দেখানোর জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। উভয়ের করমর্দনের পর

বসলেন। পাশের চেয়ারে আমিও বসলাম। যদিও কেউ-ই আমাকে বসতে বলেন নি।

বিশেষ ব্যাপারের জন্যে আপনাকে কষ্ট দিতে হল সিনর। অবশ্য এ'ছাড়া কোন উপায় ছিল না। আপনার ছেলেকে যেখানে থেকে তুলে আনা হয়েছে সেটা মাস্ত্রিদের রাত্রির জগৎ। সাধারণ দাগী বদ্‌মাইসরা পর্যন্ত যেখানে যেতে সাহস করে না। একটা খুনের ব্যাপারে ওকে অনেক দিন ধরে খোঁজা হচ্ছিল।

বাবা মাথা নীচু করে বসে ছিলেন। তাঁর মতো অভিমানী এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কী দারুণ দুর্দিন!

ওকে ডাকবো?

ডাকুন। বাবা দৃঢ় কণ্ঠে বললেন।

ওর স্বীকারোক্তি ওর নিজের মুখ থেকে শুনুন।

দাদাকে দুজন পুলিশ ধরে নিয়ে এল। একি অবস্থা! দাদাকে চেনাই যায় না। চোখমুখ কালো হয়ে গেছে। অপরিচ্ছন্ন ক্লেদের ঘোরে মুখ বিকৃত হয়ে আছে।

দাদা এসে বাবাকে দেখে চমকে উঠল। তারপর সেই যে মাথা নীচু করল আর তুলল না। কমিশনারের শত অনুরোধেও দাদা মুখ তুলল না। একটি কথাও তার মুখ থেকে বের করা গেল না।

বাবার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। অন্যদিকে চেয়ে বসে আছেন। মুখে তার দৃঢ় সঙ্কল্প ও যন্ত্রণার দাগ। মনে মনে যেন তিনি কিসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অর্জন করছিলেন।

শেষে কমিশনার বাবার দিকে তাকিয়ে একজন সান্ত্রীকে বললেন, ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও। তারপর বাবার দিকে চেয়ে চেয়ে বললেন, ওর সংগে আমার কথা টেপ করা আছে। সেইটাই শোনা যাক তা'হলে।

সেই ভালো। বাবা উত্তর দিলেন।

টেপ রেডি ছিল। চালিয়ে দেওয়া হল।

দাদার গলার আওয়াজ আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি। কেমন ভাঙা যেন। তা'ছাড়া এত সরু যেন মেয়েলি গলার স্বর।

তোমার নাম?

রিসকে মাস্তিনিয়া।

তোমার বাবার নাম?

সিনর ফিলিপ মাস্তিনিয়া।

হাল সাকিন?

মাদ্রিদ।

তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আছে তুমি সেগুলো স্বীকার কর?

করি।

এ বিষয়ে আদালতে তুমি স্বীকারোক্তি করতে পারো?

নিশ্চই

এই কি তোমার শেষ কথা?

আর একটু কথা আমার আছে সিনর কমিশনার।

বলো।

আজ আমি যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছি তার জন্যে কেউ দায়ী নয়। আমার মা নন। বাবাও নন। এতগুলো খুন করবার পর পৃথিবীতে আমার বাঁচবার কোন অধিকার নেই। সে অধিকার চাইও না। কারো কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নিজের আর অপমানও করবো না। একটি কথা আমি কাউকে বলতে পারিনি সেই কথাটা আমি জানিয়ে যেতে চাই। বলে না গেলে শান্তিও পাব না। আমি স্বেচ্ছায় এই স্বীকারোক্তি করছি। আমার এই স্বীকারোক্তি আদায় করবার জন্যে আমার ওপর কোন নিপীড়ন করা হয় নি। এটুকু আমাকে বলতে হচ্ছে শুধু বিবেকের দংশনে। যে নির্দোষ মেয়েটাকে আমি হত্যা করেছি আমি বলে না গেলে সেই কাহিনীটুকু অন্ধকারে থেকে যাবে।

আমার বাবা চিরকাল কড়া প্রকৃতির লোক। কোন রকম চারিত্রিক শৈথিল্য বরদাস্ত করা তার চরিত্রের একেবারে বিরোধী। অথচ এই

চরিত্রের দুর্বলতাই আমার সবটুকু অধিকার করে ছিল। ছোট বেলা থেকে আমাকে সংশোধন করবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। বাবার চেষ্টা আর আমার এড়িয়ে যাওয়া এই দুটোর মধ্যে দীর্ঘকাল প্রতিযোগিতা চলেছে। অবশেষে বাবার চেষ্টা বোধ করি ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তখন আমি বেশ বড়ো হয়ে গেছি। আমার যৌবনের সেই চোখে নারীকে শুধু ভোগের পণ্য ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারিনি। আমার স্বেচ্ছাচার তখনো দুর্দম হয়ে প্রকাশ করে নি। বাড়ির মধ্যেই তার গতিবিধি ছিল। বাড়িতে নবাগতা চাকরানীরাই আমার শিকার ছিল। এ ব্যাপারে কোন বাছবিচার ছিল না। বয়সের কোন তোয়াক্কাও করতাম না। সুবিধে পেলেই কামড় বসাতাম।

এ সব ব্যাপার নিয়ে চাকরদের মহলে আলোচনা হত। আমার মায়ের কানে গিয়েও পৌঁছতে পারে। আমি অবশ্য জানি না। তবে বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক উঠে গেছিল। তার সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না। তিনি নিজের কাজ কর্ম নিয়ে থাকতেন। আমি আমার পৃথিবীতে ডুবে থাকতাম। এমনি করেই আমাদের দিন কাটছিল। বলতে ভুলে গেছি আমাদের পরিবারে লোক পাঁচজন। বাবা মা আমি আর ছোট দুই বোন। ছোট বোন আমার পিঠোপিঠি। বোধ হয় বছর দু'তিনেক ছোট। এসব কথা বলা দরকার এই জন্যেই যে ব্যাপারটা আপনি ভালো বুঝতে পারবেন।

এই সময় আমাদের বাড়ীতে একটা দাসী এল। একেবারে গ্রাম্য। দেশে চাষবাসের কাজ করত। অটুট স্বাস্থ্য আর যৌবন ঝলমল করত তার সারা দেহে। সোনালি চুল। নীল চোখ। মুখের চেহারা বোকাবোকা। গলার স্বর আধোআধো। তাকে দেখেই আমার মনের ইচ্ছে পালতোলা নৌকার মতো ছুটে চলল।

বাবাকে যদিও ভয় করতাম কিন্তু তাঁর ছেলে হিসেবে বাড়িতে আমার অপ্রতিহত প্রভাব। গৃহকর্তার ছেলে এই উত্তরাধিকারকে মূলধন করে এগিয়ে গেলাম। এসব ব্যাপারে প্রয়োজনটাই বড়।

আনুসঙ্গিক আবেদন-নিবেদনের ব্যাপারটা আমার হিসাবের মধ্যে থাকে না। এক্ষেত্রেও তাই হল। আমি পুবোন দু'চার জন দাসীকে দিয়ে তার কাছে আমার ইচ্ছেটা প্রকাশ করলাম। মেয়েটি কোন পাত্তা দেয় নি। এমন ভাব দেখাত যে সে কিছু বুঝতে পাবেনি। শেষে আমি নিজেই এগিয়ে গেলাম। এসব ব্যাপাবে আমার একটুও লজ্জা ছিল না। না, ছিল বোধ হয়। তাকে লজ্জা না বলে সঙ্কোচ বলাই উচিত। সেটুকু আমার বাবার জন্যেই।

মেয়েটি আমার কথা শুনল। তারপর এমন ভাবে কথা বলল যেন এসব অসম্ভব কথা কখনো শোনেনি। প্রথমে একটু নরম হলাম। অনুনয় কবলাম। মোটা টাকা কবুল করলাম। উপহার দেবার প্রসঙ্গ তুলতেও ইতস্তত করলাম না। মেয়েটার সেই এক কথা, না না না।

বেগে গিয়ে মেয়েটাব হাত ধবলাম। ও ক্ষেপে গিয়ে এমন একটা ঝটকা মারল যে আমি ছিটকে গিয়ে পড়লাম। চাষীর মেয়ে। গায়েও অসীম শক্তি।

আচ্ছা। আমি সবে গেলাম।

তারপব থেকে আমি তক্কে তক্কে বইলাম। ওকে নিয়ে চাকরদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা পড়ে গেছিল। ওদের কেউ কেউ মায়ের কাছে আমার ব্যাপাব নিয়ে দরবাব করেছিল। সে সব খবর আমার কাছে পৌঁছেছিল। বিবেচনা কববার মতো অবস্থা আমার ছিল না।

ইতিমধ্যে সহবেব অনেক দুর্বৃত্তদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গেছে। তাদের সঙ্গে মিশে উচ্ছন্নে যাবাব পথে অনেকখানি এগিয়ে গেছি।

একদিন বাত কবে বাড়ি ফিরলাম। গেট বন্ধ হয়ে গেছিল। আমি বাড়ির বাগান পার হয়ে পথের উপর উঠতে যাচ্ছিলাম। সেই সময় মেয়েটিকে দেখলাম। আউট হাউস থেকে বাড়িব দিকে যাচ্ছে। জঙ্গলের ভেতব থেকে লক্ষ্য কবে সুযোগ বুঝে ওর ওপর গিয়ে পড়লাম। মেয়েটি বুঝতেই পারেনি বাড়ির মধ্যে এমন ব্যাপার ঘটতে পারে। সে হতভম্ব হয়ে গেছিল। আব কিছু বোঝবাব আগেই তাকে গাছপালার

ভেতর টেনে নিয়ে গেলাম। রাত তখন অনেক হয়েছে। বাবার বাড়িতে ফেরবার সম্ভাবনা নেই। বাড়ির লোকজন শুয়ে পড়বার উদ্যোগ করছে। সুযোগটা ফুল থেকে ফলে পরিণত হয়েছে।

মেয়েটা প্রথমে বুঝতে পারেনি আমি। ভেবেছিল ওর মনের মানুষ কেউ। তাতে আমার কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। কিন্তু ঘটনাটা অন্য দিকে ঘুরে গেল। অকস্মাৎ আউট হাউসের গেটের দরজা খুলে গেল। বাবার গাড়ি ঢুকল। আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি। কিন্তু বাবার সেই পরিচিত কাশির শব্দে চমকে উঠলাম।

মেয়েটাকে যতো বলি, চুপ, চুপ করো।

ও ততোই কেঁদে-ককিয়ে ওঠে, আমাকে ছেড়ে দাও।

এমন অবস্থায় পড়েছিলাম যে ওকে ছেড়েই দিতাম। দেখলাম, বাবা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমাদেব দিকে মানে যে বনটার ভেতরে আমরা ছিলাম। বাবা আর কয়েক মিনিট দাঁড়ালেই মেয়েটা পার পেয়ে যেত। কিন্তু সেই মুহূর্তে দেখলাম বাবা বাড়ির দিকে হাঁটতে সুরু করেছেন।

রাত ভোর করে ফিবলাম। যখন বিছানায় গেলাম তখন আলোর ছিঁটে-ফোঁটা গাছেব ওপর পড়েছে। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না। দুজন প্রহরী প্রায় ঘুমন্ত অবস্থায় আমাকে তুলে নিয়ে গেল। আর ঘুম থেকে জেগে উঠলাম বাবাব চাবুকের ঘায়ে। আমার চোখ-মুখকে কোন বকম পবোয়া না করে চাবুক বর্ষিত হচ্ছে।

সত্যি বলতে কি বাবার কাছে মার খেয়ে আমার মনে কোন রকম বিকার জন্মেনি। কেন না আমার নিজের মনে নিজের অপরাধ সম্পর্কে ধারণা জন্মেছিল।

আমি ক্ষেপে গেছিলাম কেন না মেয়েটিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি পাগল হয়ে গেছিলাম। দিন কতক তাকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে খুঁজে বেড়ালাম। যতোই তাকে পাবার আশা দুর্লভ হয়ে উঠল আমিও ততো মরীয়া হয়ে উঠলাম। আর রাগ গিয়ে শেষ পর্যন্ত বাবার উপড়

পড়ল। ছোটবেলা থেকে যতোবার তিনি শাসন করেছেন মারধোর করেছেন সব অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার জন্য ফিকির খুঁজতে লাগলাম। ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যে মতলব ঠাওরালাম তা যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি ঘৃণ্য।

আজ জীবনের প্রতি কোন মমতা নেই। আর সবকিছু বিচার করবার মতো মানসিক স্থিরতা ফিরে এসেছে। আজ বলছি যে অপরাধ আমি করেছি তার কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই।

সহর থেকে ডুবে গেলাম। আর ভেসে উঠলাম অন্য জগতে। যেখানে নগ্নদেহের নৃত্য, ছুরির ঝলক মদ রেস জুয়া। কয়েকটি মেয়েকে এই সময় খুন করেছি। খুব অল্প দিনের ব্যবধানে। আদালতে এদের সম্পর্কে খোলাখুলি বলব। আপনাকে শুধু পরিণতির কথাটাই বলছি।

আমি সময় পেলেই বাড়ির কাছ দিয়ে ঘুরতাম। একদিন বিকেলের দিকে ঘুরতে এসে দেখি আমার ছোট বোন বাবা আর মা বেরিয়ে যাচ্ছে। আমার শয়তানি বুদ্ধি উল্লসিত হয়ে উঠল। অন্ধকারে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বাড়ির ভেতর ঢোকবার আগে মদ খেয়ে এলাম। তারপর পাচিল ডিঙিয়ে পিছন দিক দিয়ে বাড়ির ভিতরে নামলাম। নিজের মনের ভেতরে কেন জানিনা একটা উল্লাস বোধ করছিলাম; নিঃশব্দে চিতাবাঘের মতো পা টিপে বাড়ির মধ্যে গেলাম। রাত্রি তখনো সুরু হয়নি বা একটু সুরু হয়ে থাকতে পারে। আমাদের বাড়িতে কোন সাড়া নেই। ভেতরে ঢুকে এলাম। অত্যন্ত সন্তর্পণে এ-ঘর ও-ঘর খুঁজে দেখলাম কেউ সেখানে আছে কিনা। যে চাকরানীটা আলো জ্বালে সে ঘরে আলো জ্বেলে দিয়ে ফিরেছে। সারা বাড়ির আর কোন সাড়া নেই।

আমার পিঠোপিঠি বোন এজি ওর ঘরের মধ্যেই ছিল। আমি জানতাম আর কয়েকদিন বাদে ওর বিয়ে। সমস্ত বাড়িতে দারুণ উল্লাস আলোয় হাসিতে ভেঙে পড়বে। সে উৎসবে আমার নেমন্তন্ন নেই। আমি অনাহুত। প্রবেশ নিষেধ। অথচ এই উৎসবের আমিও এক-

জন নাবিক ছিলাম কিম্বা হতে পারতাম। দারুণ একটা অভিমান মনের মধ্যে ধূমায়িত হয়ে উঠতে লাগল। সেই অভিমান মুহূর্তের মধ্যে চেতনাহীন ক্রোধের লাল চোখে পরিণত হল।

অপরিমিত মদ খাওয়া আর লাগাম ছেঁড়া প্রবৃত্তির শৈথিল্য আমাকে একেবারে বিবেচনা শূন্য করে দিল। বাবার দুর্জয় ব্যক্তিত্ব আর আরক্ত ভ্রূকুটি রেখাকীর্ণ মুখের বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ দুর্জনের শয়তানিতে ফেটে পড়ল।

নিজের মধ্যে নিজেই অট্টহাসিতে ভেঙে পড়লাম। দেখলাম দরজার দিকে পিছন ফিরে এজি বসে আছে। বোধ হয় চা খাচ্ছে। এক সময় গুনগুন করে কি একটা গানের কলি গাইতে লাগল। হাই তুলল। আলস্যে ভেঙে পড়ে টেবিলের ওপব মাথা রেখে বলল, ওঃ পৃথিবী কি সুন্দর—জীবন যে আরো সুন্দর!

তারপরই উঠে জানালার ধারে গেল এজি। জানালা ধরে বাইরের দিকে চেয়ে রইল।

হ্যাঁ এই সুযোগ। নিজের মনে মনে বললাম। আস্তে দরজাটা খুলে আলোটা নিভিয়ে দিলাম। হঠাৎ ঘর অন্ধকাব হয়ে যাওয়াতে, ও পিছন ফিবে জিজ্ঞাসা কবল, কে—কে? একটু থেমে বলল, কে আলো নিভিযে দিল!

আমি তখনো স্থিব হয়ে অন্ধকাবে দাঁড়িয়ে আছি। এজি আলোর কাছে এগিয়ে এল। সেই মুহূর্তে পিছন থেকে মাথায় আঘাত করলাম।

উঃ। চীৎকার করে পড়ে গেল এজি।

হেসে উঠলাম। প্রথমে ভাবলাম খুন কবে এখানে রেখে যাই। তারপর কি ভাবছিলাম এখন আব মনে নেই। ওর গলা টিপে ওকে খুন করলাম।

মনে হয় শয়তান এসে আমার ওপর ভর করেছিল। গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম শরীর তখনো গরম আছে। বুনো পশুর মতো তার শরীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তখন সংজ্ঞা লোপ পেয়েছিল।

মনে হল এজির বুকের ভিতর তার হৃদপিণ্ড তখনো ধুক্‌ধুক্‌ করে কাঁপছে।

বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন, ষ্টপ।

আমি তাকিয়ে দেখলাম তাঁর কপাল বেয়ে ঘাম পড়ছে। উঠে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

কমিশনার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন. একি আপনি উঠছেন?

হ্যাঁ, বাধ্য হয়েই উঠতে হচ্ছে। এ সব আমাকে শোনানোর উদ্দেশ্য?

কেসটা নিয়ে প্রসিড করবার আগে আপনাকে ওয়াকেবহাল করিয়ে নিলাম।

কারণ?

আপনি ওর পিতা।

অস্বীকার করতে পারিনে। তবে সেটা আমার পরম দুর্ভাগ্য। আপনাদের আইনে যা করতে বলে আপনি স্বচ্ছন্দে তাই করতে পারেন। এ বিষয়ে আমার কিছু বলবার নেই।

আমিও তৎক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছি। বাবা আমার দিকে চেয়ে ইশারা করলেন। আমি এগিয়ে এসে ওঁর হাত ধরলাম। তারপর দুজনেই সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

এরপর বুঝতেই পারছেন খবরের কাগজগুলো দাদার বিচার কাহিনী রঙ-চঙ করে বাজারে ছাড়তে লাগল। অন্যের কথা জানি না; আমার নিজের মনে হয়েছিল বিচারে দাদার চরম শাস্তি হবে। হয়েছিলও তাই। মৃত্যুর আগে দাদার ইচ্ছা হয়েছিল মায়ের সঙ্গে একবার দেখা হয়। জেল থেকে সেই সংবাদ নিয়ে লোক এসেছিল। মা বাবার দৃঢ় সংকল্পের কথা জানতেন তবু বাবার ঘরে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বাবা কিছুতেই ছেলের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি দিলেন না।

এইখানেই দাদার কাহিনীর যবনিকা পড়ে গেল। কিন্তু এতে আমাদের পরিবারের যে ক্ষতি হল সেটা কিছুতেই পূরণ হল না।

আগে বাবা নিজেই তার অনেক রকম কাজের মধ্যেও আমার পড়া-

শোনার খবর রাখতেন। ইদানীং তিনি কেমন হয়ে গেলেন। সবই করতেন তিনি কিন্তু তাঁর কোন কাজের মধ্যে আনন্দ ছিল না। করতে হয় এই জন্যই বুঝি কাজ করে যেতেন।

মাও কেমন হয়ে গেলেন যেন। তার নাগাল পাওয়া দায়! হঠাৎ ধর্মের দিকে তার মন ঝুঁকে পড়ল। মেজাজ অস্বাভাবিক রকমের খিটখিটে হয়ে গেল। প্রায় সব সময়েই আমাকে বকতেন। আমার কোন কাজকে তিনি ক্ষমা করতেন না। আমিও পারৎপক্ষে তাঁকে এড়িয়ে চলতাম। আমাদের তিনজনই নিজের ঘরে স্বতন্ত্র হয়ে রইলাম। এবং আর একটু ঘুরিয়ে বলা যায় তিনজনের পৃথিবী একেবারে আলাদা হয়ে গেল। এক বাড়িতে থেকেও কারো সঙ্গে কারো যোগ রইল না।

এমনি সময় আমাকে পড়াতে এলেম একজন তরুণ গৃহশিক্ষক। কতো আর তার বয়েস হবে!—চব্বিশ, খুব বেশি হলে পঁচিশ।

স্কুলে যাওয়া-না-যাওয়া ছিল আমার ইচ্ছে। গেলে নিজের ইচ্ছেয় যেতাম। না-গেলেও তা নিয়ে বকবার কেউ ছিল না। গৃহশিক্ষকটি একেবারে নিরীহ ধরণের। আমার সঙ্গে অত্যন্ত হিসেব করে কথা বলতেন। পড়ানোর বাইরে আমাদের কথা হত কদাচিৎ। এমন কি তাকে হাসতেও দেখি নি। অত্যন্ত গম্ভীর ধরণের মানুষ। পড়ানোর ব্যাপারে সব সময় নিজের নিষ্ঠা বাঁচিয়ে চলতেন। কেন জানিনে ওকে দেখে হাসি পেত। ওর এই ছেলেমানুষী গাম্ভীর্য আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারতাম না। মনে হত উনি সযত্নে পরিচ্ছন্ন কাপড়ের মতো নিজের গাম্ভীর্য রক্ষা করে চলতেন। আমার গৃহশিক্ষকের এই উদাসীনতা ভাঙবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলাম।

একদিন বললাম, আজ বিকেলে কি আপনার সময় হবে?

কেন বলতো?

এক সঙ্গে চা খেতাম।

বোধহয় হবে না। তারপরই গম্ভীর গলায় ল্যাটিনের সেভেন্‌টিন্‌থ্‌

লেসনস্ উলটে বললেন, এই অধ্যায়টা মনোযোগ দিয়ে পড়বে। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ। তারপর টেবিল থেকে ক্লাসিক্স-এর টেক্স্ট টেনে নিয়ে বললেন, এটা দেখছ তো?

আমি মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম। তবু ঘাড় নাড়লাম, হুঁ।

শিক্ষক মশাই চলে যাওয়ার পর নতুন করে ফন্দি ভাঁজতে লাগলাম। দিন পনেরো পরে বললাম, আজ বিকেলে একবার আসবেন।

আমার কথা শেষ করবার আগেই তিনি মাথা নাড়লেন, না না আমার সময় হবে না।

একটু থেমে বললাম, বাবা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

মুখের চেহারা পালটে গেল তার, ও, তাই নাকি, আচ্ছা। তা নিশ্চয়ই আসবো। ক'টায় আসতে হবে?

গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলাম, আপনার সুবিধে মতো আসবেন।

আচ্ছা আচ্ছা। রুমালে মুখ মুছে তিনি উত্তর দিলেন।

আমি জানতাম বাবা আজ বাড়ি থাকবেন না। মা-ও চার্চের একটা মিটিং-এ যোগ দিতে যাবেন।

মনে-মনে হেসে কুটিপাটি হলাম। বেচারাকে একলা সারাটা বিকেল অপেক্ষা করতে হবে।

বিকেল বেলা যথাসময়ে মাষ্টার মশাই এলেন। চমৎকার একটি পোষাক পরেছেন। ব্লু-বেল রঙের টাইটা আরো চমৎকার মানিয়েছে। একটু আগেই এলেন।

আমি নিজে দেখা করলাম না। চাকর পাঠিয়ে ওর বসবার ব্যবস্থা করে দিলাম। দু একবার আড়াল থেকে দেখে এলাম। চুপচাপ বসে আছেন। বাবার আর দেখা নেই। শেষ পর্যন্ত বোধহয় অধৈর্য হয়ে পড়লেন। ভাবলেন একা বসে থাকার চেয়ে ছাত্রীকে ডাকা যাক। আমি তৈরী হয়ে ছিলাম। ডাক আমার কাছে পৌঁছতেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। হাতে এক গোছা মে-ফ্লাওয়ার। ঘরের মধ্যে ঢুকলাম না। বাইরে অস্পষ্ট আলো আঁধারিতে এসে দাঁড়ালাম। শিক্ষক

মশাই প্রথমটা বুঝতে পারেন নি যে আমি—তারপর বিহ্বলতার ঘোর কেটে যেতে সচকিত হয়ে উঠলেন।

আমি মৃদু কণ্ঠে বললাম, আমাকে ডাকছেন?

উনি একটু ইতস্তত করে বললেন, হ্যাঁ, আপাতত তোমাকেই ডাকছি। অনেকক্ষণ একলা বসে আছি। তোমার বাবার সঙ্গে এখনো তো দেখা হল না। তোমার হাতে ওগুলো কি?

মে-স্পিঙ্ক।

বিদেশী ফুল বোধহয়?

হ্যাঁ, এগুলো ব্রিটিশ আইলস্-এ থেকে আনিয়েছি। তখনো ঘরের মধ্যে ঢুকিনি।

তুমি কি বাইরে যাবে?

ভাবছিলাম। এমন সময় আপনার ডাক গিয়ে পৌঁছল।

হ্যাঁ, এ বেলাটা না—হয় নাই বের হলে। তোমার বাবা আসা পর্যন্ত আমাকে একটু সঙ্গ দাও।

বসতে হল মাষ্টার মশাইব কাছে। সেই প্রথম পড়াশোনার বাইরে আমাদের কথা চলল।

আমি প্রশ্ন করে যাচ্ছিলাম। উনি উত্তর দিচ্ছিলেন।

আপনি কি য়ুনির্ভাসিটিতে পড়েন?

হ্যাঁ।

কিসে আপনি ডিগ্রি নেবেন?

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনেব তুলনামূলক বিচারে।

আমি মুখটাকে ঈষৎ বিকৃত করলাম।

অমনি করলে কেন তোমার মুখ?

বাবাঃ কি বিদঘুটে সাবজেক্ট?

মাস্টার মশাই হাসলেন।

সাদা রঙ বুঝি আপনি পছন্দ করেন না?

কেন?

আপনার গায়ে কত রকমের বাহার ! সংসটা ডাজলিং গ্রেট কালারে, কোট লাইট এ্যাশ, সার্ট গ্রীনিস-ব্লু, এমন কি টাইটা পর্যন্ত ব্লু-বেল রঙের ! কোন কথা বললেন না মাস্টার মশাই। গভীর চোখে আমাকে দেখতে লাগলেন।

জামা কাপড়ের রঙ দেখে অনেক সময় মানুষ চেনা যায়।

তাই নাকি ? তিনি বোধহয় ব্যঙ্গ করতে চাইলেন।

আমি আর একটু এগিয়ে গেলাম, মানুষ নয়—মানুষের মন।

এবার একটু অবাক হলেন আমার শিক্ষক মশাই। অমি অবশ্য প্রথম দিন ধরা ছোঁয়ার মধ্যে গেলাম না। তারপরই প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলাম, গ্যালগাডিব কবিতা আপনার কেমন লাগে ?

পড়ো নাকি ওর কবিতা ! একটু বিস্মিত হয়ে তিনি আমার মুখের দিকে তাকালেন।

পড়ি মানে ! আমি আগ্রহের সঙ্গে জানালাম, আমার প্রিয় কবি।

রাবিশ ! অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন ভদ্রলোক। আমি জানতাম আমার এই পিউরিটান শিক্ষকটি ধর্মে ক্যাথলিক খ্রীষ্টান হলেও মনে-মনে গোঁড়া মুর। মধ্যযুগেব পবিত্র বিশ্বাসের পৃথিবীতে তিনি নিঃশ্বাস নেন।

খুব মৃদু আর মোলায়েম স্বর গলায় এনে বললাম, আপনার ভাল লাগে না বুঝি ?

তিনি উত্তর দিলেন, আধুনিক কবিতা পাপ। ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস এব উৎস।

কী অদ্ভুত ! আমি আবৃত্তি করলাম :

গতকাল ঈশ্বরের অপঘাত মৃত্যুর পর,
স্বর্গ থেকে নির্বাসিত প্রেতাত্মা তার—
আমাদের চৈতন্যের দরজায় এসে,
বারম্বার রেখে যায় ব্যর্থ হাহাকার।

দেখলাম ভদ্রলোক একটু ক্ষুণ্ন হয়েছেন।

তোমার অল্প বয়স। এসব এখনো পড়ার মতো বয়স তোমার হয় নি। এই সব কবিতায় বিকার-ব্যাভিচারকে প্রশ্রয় দিয়ে মানুষের ইন্দ্রিয়কে উৎসাহিত করা হয়।

আমি কিন্তু—শিক্ষক মশাইয়ের দিকে উঁকি দিয়ে তাকালাম, পনেরোটি বসন্ত পার হতে চলেছি।

অনেকক্ষণ বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। তার মানে? খুব আস্তে কথা বললেন তিনি।

যৌবনের দর্জার গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছি। আর—

আর? আমার কথাটাই উচ্চারণ করলেন তিনি।

আর আমাকে যতো ছোট ভাবেন ততো খুকিটি আমি নই!

তাই নাকি! ভদ্রলোক সহজ হয়ে উচ্চকিত হাসি হাসলেন।

আর একবার চা দিতে বলবো?

বলো। বিকেলটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেলো। তোমার বাবা কখন আসবেন বুঝতে পারছি না।

কি জানি। আমি নিজেও যেন চিন্তিত হলাম।

চা খেতে খেতে আমি প্রস্তাব দিলাম বাবা না আসা পর্যন্ত আমরা ইচ্ছে করলে আমাদের বাগানে বেড়াতে পারি।

শিক্ষক মশাই উৎসাহের সঙ্গে আমাকে সমর্থন করলেন। চা শেষ করে উঠলাম আগে আমি। সিনর শিক্ষক পিছনে। অন্ধকার ঘোর না হলেও গাছপালার ছায়ায় বেশ কালো হয়ে উঠেছে। নতুন পাতা ফুল গাছপালা লতার গন্ধ জড়িয়ে অদ্ভুত একটা স্বাদ উড়ছে হাওয়ায়।

আমি প্রকৃতিকে ভালবাসি।

আমিও। ফিরে দাঁড়িয়ে উত্তর দিলাম।

উনি বললেন, তাই নাকি!

এ বাগানের অনেক গাছ নিজের হাতে লাগানো।

ভালো ভালো। সিনর টিচারের গলা শুনতে পেলাম, গাছের দিকে মনোযোগ দিতে গিয়ে পড়াশোনায় অবহেলা করো না।

অনেকখানি এগিয়ে গেছিলাম আমি।

শিক্ষক মশাই বললেন, ল্যাটিন গ্রামারটার দিকে একটু নজর দাও, ওটা ক্লাসিকের দরজা। এখন থেকেই যত্ন নেওয়া উচিত।

আমি যেন শুনতে পাইনি এমন ভাবে বললাম, দেখুন, দেখুন আমাদের বাগানে নতুন অতিথি এসেছে! ছোটমেয়ের মতো হাততালি দিয়ে উঠলাম।

বিস্মিত শিক্ষক মশাই এগিয়ে এসে বললেন কে—? চারদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না?

আমি বললাম, ওইতো—

কোথায়? এলোমেলো হয়ে চারদিকে তাকাতে লাগলেন তিনি।

এই অবকাশে আমি হায়াসিন্থের ছোট্ট একটি ফুল তার সামনে ধরলাম, এই যে আমাদের নতুন অতিথি!

লাভলি! খুব খুশি মনে হল তাকে।

আমি বললাম, আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবে ফুলটা আপনার কোটের কলারে পরিয়ে দি।

একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, না থাক! তুমি দিচ্ছ তাই আমি নিজে পরছি!

কয়েক পা এগিয়ে যাবার পর তিনি বললেন, বড্ড অন্ধকার!

বললাম, সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

সময়টা ভারি মিষ্টি। গাছপালার পাতার ফাঁক দিয়ে টুপটুপ করে অন্ধকার ঝরছে। পাখিরা নীড়ে ফিরেছে! সারাদিনের চোখে দেখা পৃথিবীর প্রান্তরে শস্য আহরণের গল্প নিয়ে কল-কূজনে ব্যস্ত। আমার নিজের সময়টা ভারি মিষ্টি লাগে। হেঁটে গিয়ে আমরা একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়ালাম। বাড়ি থেকে অনেকটা দূর। চারদিকে গাছপালায় ঘেরা। সামনে ছোট একটা সাঁতার কাটবার পুকুর।

এখানে বসবেন?

ঘড়িতে সময় দেখে শিক্ষক মশাই বললেন, হাতে সময় নেই আমার। তোমার বাবার সঙ্গে বোধ হয় আজ দেখা হল না! চল তোমাকে বাড়ির দরজায় পৌঁছে দিয়ে যাই।

এত তাড়াতাড়ি কেন? গলায় একটু ব্যাকুলতা একটু বেদনা ঢেলে দিলাম।

উনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, না তাড়া এমনিতে কিছু নয়। তবে আজকে আমাদের ডিপার্টমেণ্টের একটা সেমিনার আছে।

ও। শব্দটা উচ্চারণ করে থেমে গেলাম তারপর বললাম, আপনার হাতে কতো কাজ। সারাদিন বোধহয় আমাদের কথা মনেও থাকে না।

সত্যি। পড়াতে আসবার আগে পর্যন্ত তোমাদের কথা একটুও মনে থাকে না। চল চল আজ আর দেরি করতে পারবো না।

দুজনে আবার সেই গাছপালার অন্ধকার ভেঙে এগুতে লাগলাম। আমার মান্য শিক্ষক মশাই বললে, আমার হাতটা ধরো, চোখে দেখে কিছু বুঝতে পারছি না।

না হাত ধরার দরকার নেই। ভারি গলায় উত্তর দিলাম, আপনার সামনেই হাঁটছি তো!

একটু আস্তে হাঁটো। অন্ধকারে তোমাকে দেখে যেন পথ চিনে নিতে পারি।

শিক্ষক মশাইয়ের সামনেই ছিলাম। খানিকটা এগিয়ে যখন আলোর কাছে এলাম তখন মাথার মধ্যে দুষ্টুমি খেলে গেল। শিক্ষক মশাই মনোযোগ দিয়ে সুবোধ বালকের মতো আমাকে অনুসরণ করছেন। মনে মনে অন্য কিছু ভাবছিলেন কিনা জানি না। তেমনি এক অসাধারণ মুহূর্তে পায়ে কি যেন আটকে পড়ে যাবার ভান করলাম। ভয়ে একটু চেঁচিয়ে উঠেছিলাম বোধহয়। শিক্ষক মশাই দু'হাত মেলে আমাকে টেনে নিলেন। আমি যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলছি এমনি ভাবে তার বুকের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে তাকে জড়িয়ে রইলাম। কতক্ষণ কেটে-ছিল জানি না। কিন্তু আমার বুকের ওঠা নামার সঙ্গে ভদ্রলোকের

বুকের ওঠানামা এক হয়ে গেছিল। আমার খুব মজা লাগছিল।
বুকে কান পেতে তার বুকের ওঠানামার শব্দ পাচ্ছিলাম। ভদ্রলোক বোধহয় এই আকস্মিক ব্যাপারে হতচকিত হয়ে পড়েছিলেন। আমার যৌবনের তাপ বোধ হয় তার দেহে সঞ্চারিত হচ্ছিল। তাই একটু বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

হঠাৎ যেন আমার সংজ্ঞা ফিরেছে এমনি ভাব দেখিয়ে বললাম, একি আপনি আমাকে ধরে রেখেছেন কেন? ছেড়ে দিন—ছেড়ে দিন—

ভয় পেয়ে ছেড়ে দিলেন নিরীহ ভদ্রলোক, তারপর তোতলাতে-তোতলাতে বললেন, আমি ইচ্ছে করে ধরিনি। তুমি পড়ে যাচ্ছিলে তাই তোমাকে—

থাক। ভীষণ রেগে গেছি এমনি ভাব দেখিয়ে এগিয়ে গেলাম। দরজার কাছাকাছি এসে বললাম, কেউ দেখতে পায়নি তো?

না না। অত্যন্ত বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি উত্তর দিলেন।

ভাবছি কেউ যদি দেখে ফেলে। না না, উঃ—বাবা-মায়ের সামনে দাঁড়াতেই পারবো না। আমার মতো বয়েসের মেয়ে একজন অবিবাহিত যুবকের বুকের অন্ধকারে আশ্রয় নিয়েছে। শিক্ষক মশাইয়ের সঙ্গে ভালো করে কথা শেষ না করে ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

তিনি ডাকলেন, লিজি।

আমি কান্নায় ভেঙে পড়ে বললাম, না না! তারপর সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলাম।

নীচে দাঁড়িয়ে রইলেন ভদ্রলোক। উপরে উঠে হেসে মরি আর কি! জানালার আড়াল থেকে দেখলাম ভদ্রলোক তখনো আমার পথের দিকে চেয়ে আছেন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। বোধ হয় তার কর্তব্য স্থির করছিলেন। এক সময় দেখলাম দ্রুত পায় হেঁটে যাচ্ছেন। বোধ হয় একটু বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন তিনি।

আমি নিজের ঘরে এসে হাসিতে ভেঙে পড়লাম।

কয়েক মিনিট বাদেই গেটের কাছে বাবার গাড়ির শব্দ পেলাম। এত

সকালে তো বাবার আসবার কথা নয়। কী সর্বনাশ বাবার সঙ্গে শিক্ষক মশাইয়ের দেখা হয়ে যায় নি তো। তা' হলে আমি ধরা পড়ে যাবো।

বাবার গাড়ি গাছপালার ভেতর দিয়ে খুব আস্তে এগিয়ে এল। গাড়ি থেকে বাবা নামলেন। যাক বাঁচা গেল।

একটু বাদেই শিক্ষক মশাইয়ের মুখ অন্ধকারে ভেসে উঠল।

বাবা মাথা থেকে টুপি খুলে দাঁড়িয়েছিলেন। তখনি সন্দেহ হয়েছিল কারো জন্যে অপেক্ষা করছেন তিনি। সে ভদ্রলোক যে আমার শিক্ষক মশাই কল্পনাও করতে পারিনি। একটু বাদেই পোর্টিকোর নীচে যিনি এসে দাঁড়ালেন তিনি আমার শিক্ষক।

এসো এসো। বাবা তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

আমার আচার্যকে একটু অব্যবস্থিত চিত্ত মনে হল। একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছেন বোধ হয়।

হঠাৎ এ সময় আমার বাড়িতে কেন? বাবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

ভদ্রলোক কি-একটা উত্তব দিলেন বোঝা গেল না।

নিশ্চয়ই লিজির পরীক্ষা?

বাবার কথা শেষ হবার পর একটু সময় দিয়ে শিক্ষক মশাই বললেন, আপনি আমাকে আসতে—

দেখ হে। বাবা বললেন, জানো তো আমি আজকাল লিজির পড়াশুনা দেখতে পারছিনা। অনেক রকম ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি। তোমার উপর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি।

সে অবশ্য—

হ্যাঁ থাকতে পাবি। কেননা যিনি তোমাকে পাঠিয়েছিলেন বাজে লোক পাঠাবেন না এটুকু আমার জানা আছে।

হাত কচলে শিক্ষক মশাই ওরি মধ্যে কিছু একটা বলতে গেলেন। বাবা তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, শোন, এবার ভাবছি তুমি লিজিকে সকাল-বিকেল দু বেলাই পড়াবে। কি বল? চুরুট ধরালেন বাবা।

মানে আমার বিকেলে—

সময়ের অভাব? দেখ ইয়ং ম্যান, সময়টাকে টাকা দিয়ে কিনতে হয়। এর জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা আমি করবো। কাল থেকে সকাল-বিকেল দুবেলাই আসতে সুরু করো। বাবা তারপরই কথার মোড় ফেরালেন, তোমাদের হেড অব দি ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হয়। তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম, এসো একটু চা কি কফি খাওয়া যাক।

শিক্ষক মশাই এমন ভাব দেখালেন যে তার হাতে কাজ আছে আর সে কাজটা না-করতে পারলে পৃথিবী রসাতলে যাবে।

এখন থেকেই পরমায়ুর সবটুকু বিক্রি করে দিও না।

শিক্ষক মশাই বোধ হয় বাবার কথা বুঝতে পারলেন না।

ফাউষ্ট মেফিষ্টোফেলিসের কাছে আয়ুর সবটুকু বিক্রি করে দিয়েছিল পৃথিবীকে ভোগ কববার জন্যে। তার একটা অর্থ আছে। কিন্তু টাকা রোজগারের জন্যে অর্থহীন উদ্দেশ্যের কাছে পরমায়ু আমরা বিক্রি করে দিচ্ছি।

একটু হাসলেন শিক্ষক মশাই।

নিজে ভোগ না করে কার জন্যে উপার্জন করে যাওয়া? প্রত্যেকেই তার নিজের ভাগ্যে খায়। এখন থেকে জীবনটাকে তেমনি করে গড়ে তোল। এসো।

শিক্ষক মশাই আর কোন আপত্তি করলেন না।

বাবা তাকে পার্লারে বসিয়ে আমাকে ডাকতে পাঠালেন। আমি অত্যন্ত লজ্জাতুর হয়ে বাবার সামনে এসে দাঁড়ালাম।

যাও তোমার টিউটর বসে আছেন। ওর কাছে একটুখানি বোস—

কোন কথা না-বলে মাথা নেড়ে সায় দিলাম আমি। তারপর মুখখানা অত্যন্ত গম্ভীর করে এগিয়ে গেলাম। দরজার আড়াল থেকে দেখলাম শিক্ষক মশাই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন।

দরজায় একটু খানি নাড়া দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। শিক্ষক মশাই

আমার দিকে একটু হাসলেন, কি করছিলে ?

ল্যাটিন গ্রামার নিয়ে বসেছিলাম।

উৎসাহিত হয়ে উঠলেন তিনি। বললেন, বেশ বেশ।

আমি অত্যন্ত কৌতুকের সঙ্গে এই যুবকের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলাম। খানিকক্ষণ চুপচাপ। তিনি আবার বললেন, তোমার বাবা কোথায় গেলেন ?

আসছেন।

আমি মনে মনে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেছিলাম। এই বাব বোধহয় ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করবেন, তোমার বাবা তো আমাকে আসতে বলেন নি।

আমি অবশ্য তৈরি হয়ে ছিলাম। কিন্তু সে সব কিছু হল না। তার আগেই বাবা এসে আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই যে লিজিও এসে গেছ।

বাবা আসবার আগে শিক্ষক মশাই ফিসফিস করে বললেন, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে লিজি।

সে কথা তাকে কোনদিন বলবার সুযোগ দিইনি। রোজ আমার কথাই তাকে শুনতে হত। আর এই কথা বলার নেশা আমাকে পেয়ে বসল। কতটুকু পড়া হত ঈশ্বরই জানেন। আমি ইচ্ছা করে পড়তে চাইতাম না। তিনি আমাকে জোর করে পড়াতে চাইতেন। বলতেন, বাবার কাছে বলে দেবেন। জানতাম বাবার কাছে কোনদিনই বলবেন না। শেষে অনুনয় করতেন। বোধহয় আমাকে না পড়িয়েও তাঁকে টাকা নিতে হত সেজন্য তাঁর মনে বিক্ষোভ দেখা দিত।

যেদিন সন্ধ্যেবেলায় তিনি আসতেন না আমার অসহ্য মনে হত। পরের দিন যা-না-তাই বলতাম তাকে। তিনি হাসতেন। প্রসন্ন হাসি। তাঁর চোখ দেখে মনে হত আমার খামখেয়ালিতে বিন্দুমাত্র বিরক্ত হন নি। এমনি করে দিন কাটছিল। মায়ের ভয়ে স্কুলে যেতে হত, কেন না সারাদিন তাঁর খিটখিটে স্বভাব নিয়ে আমাকে শাসন করে চলতেন।

এর থেকে বরং স্কুলই ভালো। সেখানে সমান বয়সী মেয়েরা নিজেদের মনের কথা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতাম। কে নতুন প্রেমে পড়েছে। কার অবস্থা পড়ো-পড়ো, কেউ প্রেমে পড়ার স্বপ্ন দেখছে—এই সব ছেলেমানুষি গল্প নিয়ে অবকাশের সময় কাটিয়ে দিতাম।

আমার শিক্ষিকারা জানতেন বোধহয় যে আমার পড়াশুনা হবার সম্ভাবনা কম। তাই তাঁরাও আমাকে বিরক্ত করতেন না। আমার স্কুলে যাওয়া অনেকটা ফ্যাশান প্যারেডে যাবার মতো—সাজগোজে নিজেকে পরিপাটি নিপুণ করে নিতাম।

তারপর যেদিন আমার ক্লাসের ঘনিষ্ঠা বান্ধবীদের আমার প্রেমের কথা বললাম ওরা তো অবাক। আমি ওদের মিথ্যে রূপকথা বলতাম। ওরা বিশ্বাস করত। সেই কচি অথচ রঙীন সবুজ বয়েস নিষিদ্ধ কথার ঘ্রাণে পাগল হয়ে যেত। আমি বলতাম, ওঁকে জানাতে চাইনে মুখে। নীরবে ভালবেসে যেতে চাই। ও যদি দেখে না বোঝে, হৃদয়ে যে প্রেম রেখেছি চোখে তারই আলো—তবে? যদি কোনদিন জানতে না-ও পারে তবু নীরবে ভালোবেসে যাবো। কোন প্রতিদান চাইবো না। যতোদূর যাক। চোখে দেখি আর না-দেখি।

সঙ্গিনীরা আমার কথায় বিহ্বল মানতো। স্কুল বসবার আগে এসে আমার জন্যে বসে থাকতো। প্রতিদিনকার খুঁটিনাটি শুনে তবে আমাকে রেহাই দিত। আর যা ওদের শোনাতাম তার আগাগোড়াই মিথ্যে।

অন্যদিকে আমার সেই প্রেমের দেবতাটি কিন্তু নির্বিকার। আঁক কষতে কষতে ওর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতাম। দেখতাম যে আমার দিকে চেয়ে বসে আছে।

জিজ্ঞাসা করতেন, কি হল?

একটুখানি মিষ্টি হাসতেন।

আমি মাথা নাড়তাম। চোখ নামিয়ে নিতাম। বুকের ভেতর কেমন করত। একদিন শিক্ষক মশাই সন্ধ্যেবেলা এলেন। সেদিন

তাঁকে একটু পরিপাটি দেখলাম। তাঁর জামা থেকে মিষ্টি গন্ধ আসছিল। একটু পরেই তিনি তাঁর রুমাল বের করে মুখটা আলতো করে মুছে নিলেন।

আমি একবার আড়চোখে তাকিয়ে বললাম, মিষ্টি গন্ধ তো।

তোমার ভাল লাগছে?

মুখটা বিহ্বল করে যেন বললাম, অদ্ভুত।

হাসলেন মাষ্টার মশাই। হেসে রুমালটা পকেটে রাখলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, আজই কিনলেন নাকি?

হ্যাঁ। মাথা নাড়লেন তিনি। দোকানদার নিজেই পছন্দ করে দিল। জিজ্ঞেস করলাম, ভালো হবে তো? বলল, ব্যবহাব করে দেখুন। একটু থেমে শিক্ষক মশাই বললেন, সেন্টটা ভালো তাই তোমার ভালো লেগেছে। আমি তো এসব ব্যবহার করিনে। হঠাৎ সখ হওয়াতে কিনলাম।

আমি খাতার ওপব চোখ রেখে বললাম, জিনিষটা সত্যি ভালো।

তোমার যদি ভালো লাগে আমি একটা এনে দিতে পারি।

দোকানটা কোথায়?

সেন্ট পল গীর্জাব নীচে মিউনিসিপ্যাল বাজারের একটা দোকান থেকে কিনেছি।

ও। আমি হতাশ হয়ে চেয়ারে বসে পড়লাম।

কি হল?

অনেক দূর—আমাব পক্ষে একলা যাওয়া সম্ভব নয়।

আমি এনে দিতে পারি। তিনি সান্ত্বনা দিলেন আমাকে।

আমি আপনার সঙ্গে যেতে চাই।

কি করে হবে?

আজই হতে পারে। আমি আপনার সঙ্গে গেলাম। তারপর আপনি পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

তোমার বাবা?

বাবা তো এখন পীরেনিজ পাহাড়ে।

মা?

নিজের ঘরে। আজ রাত্রে আর বের হবেন না।

তা' হলে তোমাকে নিজের দায়িত্বে যেতে হয়।

বাঃ রে আমি কি এখন কচি খুকি! তা ছাড়া আপনি তো সঙ্গে আছেন। ভারি তো একটা সেন্ট কিনতে যাবো—তার জন্যে আপনি এমন করে জেরা করছেন যেন জেনারেলকে গুলী করেছি!

সেদিন ভদ্রলোককে নিয়ে ঘুরে ফিরে অনেক রাত্রে ফিরলাম। বাড়ি ফিরে কেমন একটা বিষণ্ণ নৈরাশ্য ছেয়ে ফেলল। মনে হল আমার সঙ্গে প্রতিক্ষণের জন্য কাউকে চাই। চোখ বুজে চেয়ারে বসে রইলাম। প্রথমে মনে হল আমার শিক্ষক মশাইটি আমার সবচেয়ে প্রিয়। তারপর মনে হল একজন মানুষকে চাই। একটি পুরুষ মনের মধ্যে গভীর আকাঙ্ক্ষায় আমায় চঞ্চল করে তুলল। তারপর কতোদিন কত রকমে সেই অপাপবিদ্ধ যুবকের ধ্যান ভঙ্গ কববার চেষ্টা করেছি। অথচ কঠিন তার পাথবের বুকে লেগে আমার সব প্রত্যাশা ফিরে এসেছে।

একদিন সন্ধ্যেয় সমুদ্রের ঝড় উঠে এল। ঝড়ের আগে যে পাখিরা আকাশে ওড়ে তারা সেই ভয়ঙ্কব মেঘের পাহাড়ের চূড়ায় একবার দেখা দিয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল। আমাদের বাগানের গ' পোলাগুলো পাগল হয়ে গেল। আউট হাউস থেকে বাড়ি আসবার পথেব আলোগুলো তখনো জ্বলে ওঠেনি। জানালা টেনে বন্ধ করে দিলাম। মনে ভাবলাম আজ মাষ্টার মশাই আসবেন না নিশ্চয়ই। বাইরে ঝড় উঠেছে। বাড়ির ভেতরটা কি শান্ত। আলো-আঁধারি ঘর। করিডর দিয়ে গুনগুন করে শুবার্টের Ave Maria গাইতে লাগলাম।

মায়ের ঘরে মোমবাতি জ্বলছিল। কালো মেহগনি টেবিলের ওপর রূপোর বাতিদানে আলো দুটো অকম্পিত। মা হাঁটু পেতে মাথা নিচু করে প্রার্থনা করছেন।

সরে গেলাম সেখান থেকে। সমস্ত বাড়িটা কয়েকবার ঘুরে ফেললাম। উপরে নীচে। চাকরদের ঘরে সবে আলো জ্বলে উঠেছে। সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত। যে যত ছোট সামান্য হোক তার আকড়ে ধরবার কিছু আছে। আমার জীবনে সেই আকড়ে ধরবার জিনিষটাকেই খুঁজছি। বাবা নিজের ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত। মা ধর্ম। আমার পাওনা স্নেহ থেকে তাঁরা আমাকে একেবারে বঞ্চিত করে রেখেছেন। অথচ আমি তো পৃথিবীর সবটুকুই পেতে চাই। সেই শূন্যতাই আমাকে বিভ্রান্ত করে দেয়।

নিজের ঘরে ফিরে শুয়ে শুয়ে আরো অনেক কিছু ভাবি। নিজের জীবনটাকে অভিশাপ বলে মনে হয়। এমন কি এই বাড়ি এই পরিচিত জীবনধারা এর থেকে বুঝি আমি মুক্তি চাই। হ্যাঁ, চাই চাই চাই, চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

দরজায় হঠাৎ কড়া নড়ে উঠল। না, কড়া নয় কয়েকটা আওয়াজ ঠক ঠক ঠক করে।

কে? হিংস্র চোখে অন্ধকারে দরজার দিকে তাকালাম। দরজা খুলে গেল।

কে? ফিসফিস করলাম আমি।

দরজায় যার চেহারা দেখা গেল তাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, কি কি চাই? সময়-অসময় চাকরগুলো এত বিরক্ত করে। আমি বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে দরজার দিকে গেলাম। করিডরের অস্পষ্ট আলোতে যা দেখলাম তাতে অবাক হওয়াই স্বাভাবিক। দেখলাম আমার তরুণ শিক্ষক মশাই ভিজে খড়ের মতো জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ভয়ে কি কিসে জানিনে কথা বলতেও ভুলে গেছেন।

একি আপনি? যতোখানি বিস্মিত হতে পারা যায় ততোখানি বিস্ময় প্রকাশ করলাম।

একটু অপ্রভিত হয়ে বললেন তিনি—হ্যাঁ পথের মাঝখানে বৃষ্টি নেমে গেল।

তাব আগে তো ঝড় উঠেছিল।

তা' উঠেছিল।

না এলেই তো পারতেন।

ভাবলাম একদিন কামাই করব।

একদিন না পড়ালে ক্রোমব্রোম গীর্জার চূড়োটা বুঝি ভেঙ্গে পড়বে?

আমতা আমতা করেন শিক্ষক মশাই।

ঘবে আসুন। ভিজে একেবাবে জুবড়ি হয়ে গেছেন।

আমি তাড়াতাড়ি অন্য ঘর থেকে বাবার পোষাক এনে দিলাম। শিক্ষক মশাইকে হাতে দিয়ে বললাম, জামাকাপড় ছেড়ে এগুলো পরে ফেলুন। আমি দরজা বন্ধ করে চা-এর কথা বলতে গেলাম। ফিরে এসেও দেখলাম দরজা বন্ধ। পুরোন দরজার ফাটা কাঠের ভেতর চোখ দিয়ে দেখলাম জামা পরছেন আমার তরুণ শিক্ষক মশাই। এমনিতে তাঁকে দেখতে সুন্দর; তারপর অনাবশ্যক মেদহীন তরুণ দেহ আমাকে মুগ্ধ করল। নতুন ফোটা ইয়ক্কার ফুলের মতো যৌবন অনিন্দ্য সৌরভে সেই দেহ জড়িয়ে। ইচ্ছে করছিল সফেন ঢেউ-এর মতো ওই দেহের উপকূলে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

শিক্ষক মশাই এসে দরজা খুললেন। আমি সামনে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে ছিলাম। চাকর চা নিয়ে এল।

তখনো পুরোদমে বৃষ্টি আর ঝড় চলেছে। ভারি মজা লাগছিল। মনে মনে বোধহয় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনাও কবেছিলাম বৃষ্টি আর ঝড় যেন আজ না থামে।

শিক্ষক মশাইয়েব সামনে চেয়ারে গিয়ে বসলাম।

আজকে পড়ানোর মন নেই।

আমারও পড়ার মন নেই।

তবে এসো আজ গল্প করা যাক।

সেই ভালো। আজ এখানেই খাবেন তো?

কেন?

ঝড়ের মধ্যে বাড়ি গিয়ে পৌঁছতে পারবেন ?

ঝড় থেমে যাবে না ?

কি জানি। বোধ হয় না।

একটু চিন্তিত মনে হল তাঁকে।

তা'হলে তো মুশকিল হবে। একজন আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে।

কে মাষ্টার মশাই ?

চিনবে না তুমি। মাথা নাড়লেন তিনি।

আমার মনে হয় আজ থেকে গেলেই ভালো করতেন।

ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম আমি। যাকে মনে মনে প্রত্যাশা করি তার সান্নিধ্যের জন্য উন্মুখ।

বেশ তাই হোক। অনেক হিসেব-নিকেশ করে শিক্ষক মশাই সায় দিলেন। আমি ব্যস্ত হয়ে শিক্ষক মশাইয়ের খাবার কথা বলে এলাম। বাইরে বৃষ্টির সঙ্গে আমরাও পাল্লা দিয়ে দু'জনে অনেকক্ষণ গল্প করলাম। খেয়ে এসে শিক্ষক মশাই শুয়ে পড়লেন। আমিও নিজের ঘরে ফিরে এলাম। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। একঘর অঁন্ধকারে আমি একা। আর মনের ভাবনাগুলো যেন সব সজীব হয়ে উঠেছে। কি সব অদ্ভুত ভাবনার প্রবাহ আমার সামনে বয়ে যেতে লাগল। কিছুতেই ঘুম আসে না। নিঃসঙ্গতার অভিশাপ যেন অসহ্য হয়ে উঠল। বিছানা থেকে উঠে পড়লাম। বাড়ির সব ঘরের আলো নিভে গেছে। আমি নিশি-পাওয়া মেয়ের মতো সেই তরুণ যৌবনের ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। কেন এলাম তাও জানিনে। অথচ যেন আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে এলাম। একটুক্ষণ চুপচাপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কতক্ষণ তাও মনে নেই। কেউ দেখলে কি ভাবত জানিনে। চিন্তার উত্তেজনা এক সময় শান্ত হয়ে এল। নিজের ঘরে ফিরে এলাম। আবার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। এবার বোধ হয় তন্দ্রা এসেছিল।

বাতাসে জানালা খুলে যেতে তন্দ্রা ভেঙে গেল। ঝড় তখন থেমে

গেছে। বাইরে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। অল্পস্বল্প মেঘ ভাসছে আকাশে। আমার কুমারী জীবনের অকাল বসন্তের মন্থর সৌরভ সেই জ্যোৎস্নায় যেন জড়িয়েছিল। কি মনে হল জানিনে। দরজা খুলে দৌড়ে গেলাম সিনর টিচারের ঘরের দিকে। আর দরজায় বোধহয় একবার থমকে দাঁড়ালাম। তারপর দরজা খুলে ফেলে নিঃশব্দ পায়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালাম। শিক্ষক মশাইও বোধ হয় জেগেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে ?

কোন উত্তর দিলাম না।

আবার জিজ্ঞেস করলেন, কে ?

কোন উত্তর দিলাম না। না, দিলাম না নয়, দিতে পারলাম না।

ততক্ষণে শিক্ষক মশাই বিছানা থেকে উঠে এসেছেন। আর আলো জ্বেলে অস্ফুট বিস্ময়ে শব্দ করলেন, তুমি !

আমি একটু অপ্রতিভ বিহ্বলতায় পড়ে গেছিলাম। তাই কোন উপায় না দেখে তাঁর বুকে ঝাঁপ দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লাম।

শিক্ষক মশাই কোন কথা বললেন না। শুধু আমার মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে পরম স্নেহভরে আদর করতে লাগলেন !

আমার কান্না যখন শান্ত হয়ে এল, তিনি বললেন, ভুল করছ লিজি।

মাথা নাড়লাম আমি। না। না। না-না।

দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল শিক্ষক মশাইয়ের—আর আমার মাথার ওপর।

সেই রাত্রি সকাল হল। পৃথিবীকে অন্যভাবে দেখলাম। যৌবনের যে ঘ্রাণ শুধু আমাকে জড়িয়েছিল এখন তা' সমস্ত পৃথিবীকে ঘিরে ফেলল। তারপর বুঝতেই পারছেন সিনর আমার পড়াশুনো সেলফে গেল। যৌবনের দুর্বলতা সব মানুষের থাকে। তা ছাড়া আমার শিক্ষক মশাই কিছু সাধু প্রকৃতির লোক নন। দোষেগুণে সাধারণ মানুষ।

জীবনের সেই সময়টার কথা কিছুতেই ভুলতে পারবো না। হঠাৎ

একদিন আমার প্রাক্তন শিক্ষকমশাই বললেন, না না এ অসম্ভব।

কি? জিজ্ঞেস করলাম আমি।

তোমার সঙ্গে আমার এই সম্পর্ক।

তুমি আমাকে বিয়ে করো।

অসম্ভব। মুখ ফিরিয়ে নিলেন শিক্ষক মশাই।

কেন?

সে অনেক কথা।

বুড়ো এলম্ গাছটার ডালে একটা অস্ফুট মর্মর দু'জনের কথার মাঝামাঝি বিরক্ত করছিল। হঠাৎ উঠে পড়লেন ভদ্রলোক। বললেন, চলো তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

পথে কেউ কারো সঙ্গে কথা বললাম না। মনে মনে আমিও বিরক্ত হয়েছিলাম। বাড়ির দরজার সামনে পৌঁছে দিয়ে তিনি চলে গেলেন। বিদায় সম্ভাষণও জানালেন না। একটা কথা বোধহয় বলেছিলেন, আমি আর আসবো না।

একটা দারুণ অপমানে বোবা হয়ে রইলাম। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। সেই প্রথম পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয়।

শ্লথ পায় আমাদের বাড়ির নির্জন প্রাঙ্গণ পার হয়ে এলাম। তারপর বেশ কয়েক দিন বিষণ্নতা পেয়ে বসেছিল।

একটু একটু করে বিষণ্নতা একদিন কেটে গেল। আবার সহজ হয়ে এলাম। এর মধ্যে বাবার চিঠি পাচ্ছিলাম। আরো কয়েকদিন পরে ফিরবেন। সুইজারল্যাণ্ডে একটা লেকের ওপর তিনি আছেন।

সঙ্গী খোঁজবার জন্যে এবার আমি বাড়ির বাইরে এলাম। নাচের স্টুডিও, চারুকলাকেন্দ্র এসবে ঘুরতে লাগলাম। বাড়িতে শাসনের কেউ নেই। এইখানেই একটি নতুন ছেলের সঙ্গে পরিচিত হলাম। ছেলেটি শিল্পী। সে প্রায়ই বলত, নিগ্রো কয়িষ্ণু শিল্পের সঙ্গে য়ুরোপীয় আধুনিক চিত্রকলার ধারা মিলিয়ে নতুন একটা কিছু করবার চেষ্টা করছে।

ছেলেটা একটু ক্ষ্যাপাটে ধরণের ; প্রায়ই আমার কাছ থেকে পয়সা নিত। আর সত্যি কথা বলতে তার মুখে একটুও আটকাত না। আমাকে যে তার ভালো লেগেছে সে কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলত। আমার বেপরোয়া ভাব দেখে সে ভয় পেত।

সে বলত, আমি ভয় পাইনে। শৃংখলাহীন জীবন যাপন করি। কিন্তু তুমি তো তেমন নয়। তোমাদের সম্ভ্রম আছে। মা-বাবা আছেন।

তাতে কি? আমি উত্তর দিতাম।

তুমি বোধ হয় এসব ব্যাপারের গুরুত্ব বোঝ না।

আমি উত্তর দিলাম না।

সে আরো বলে চলল, এসব ব্যাপারে কিছু একটা ঘটে গেলে তোমাকেই সব দায়িত্ব নিতে হবে। যারা মৌচাক থেকে আহরণ করে মধু নিয়েছে সেই মৌমাছিদের কোন খোঁজ পাবে না।

কিছুদিন পরে সেই ছেলেটিকে আমার নতুন অবস্থার কথা বললাম। শোনা ব্যাপারের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে বুঝতে পারছিলাম দারুণ একটা পরিবর্তন ঘটেছে।

ছেলেটি তার পরিচিত ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। ডাক্তার পরীক্ষা করে যা বললেন তার সংগে আমার অভিজ্ঞতার কোন ফারাক রইল না।

এখন উপায়?

তোমার সেই শিক্ষক মশাই-এর কাছে যাও দেখ তিনি কি বলেন?

ছেলেটি আমাকে পরামর্শ দিল।

সত্যি আমি তখন নিরুপায়।

কিছুক্ষণ ভেবে বললাম, এখনি যাবো?

হ্যাঁ এক্ষুণি যাবে বই কি! এর ফয়সালা করে ফেলা দরকার।

তুমি কি আমার সংগে যাবে?

যেতে পারি যদি দরকার মনে করো।

যদি যাও তো ভালো হয়। একলা নিজেকে কেমন যেন অসহায় মনে হচ্ছে।

বেশ। তবে চলো। একটা চুরুট ধরালো সে।

দু'জনে একটা অটো ক্যাবে করে সেই অপরিচিত বাড়িটার সামনে দাঁড়ালাম।

সময়টা ছিল দুপুরের একটু পরে।

নিজেকে একান্ত অবসন্ন মনে হচ্ছিল। তা'ছাড়া দারুণ একটা অনিশ্চিত সংকট আমার ভবিষ্যতেব সবটুকু গ্রাস করে ফেলেছিল।

আমার সেই সাময়িক বন্ধুটিই আমাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। বাড়িটাব সামনে দাঁড়িযে আমি তার মুখের দিকে তাকালাম।

কি? সে জিজ্ঞেস করল।

বললাম, কি করবো?

সামনেব দিকে এগিয়ে যাও।

ভয় করছে।

প্রচণ্ড হেসে উঠল সে, ভয়! কিসের ভয়? এই লোকটাকে তুমি তোমার দেহমন সব দিয়েছিলে। নিশ্চয়ই সে বাঘ নয়। চলো। সামনের দিকে এগোও—

দু'জনে পায়-পায় বাড়িব একেবারে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর আমি এগিয়ে গিয়ে দরজার পুশিং বেল টিপলাম। তাবপর সরে আগেব জায়গায় এসে দাঁড়ালাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দবজা খুলে একজন মহিলা বাইরে মুখ বের করে দিলেন।

আমাব বন্ধুটি বলল, সিনব বোক্কাচেত্তো আছেন।

না। মাথা নাড়লেন তিনি। কোথা থেকে আসছেন আপনারা?

কাছেই থাকি।

কিছু দরকার আছে?

বন্ধুটি বললেন, সেই জন্যেই তো—

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, উনি আপনার কে হন?

স্বামী। ছোট্র উত্তর কিন্তু আমার পক্ষে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক।

আমার মন আগে থেকেই বোধহয় এই উত্তরই প্রত্যাশা করেছিল। নিজের অপ্রত্যাশিত অশুভ সংবাদের খবর মন আগে থেকেই জানতে পায়। কি করে জানতে পায় মনই জানে।

হয়তো পড়ে যেতাম সেই ছেলেটি না ধরলে। সহজে সামলে নিলাম নিজেকে।

তারপব ফিরে এলাম নিজের বাড়িতে। সন্ধ্যে তখন ঘুরে গেছে। ছেলেটাকে বিদায় দিয়ে একলা ফিরলাম। পথে অনেকক্ষণ ঘুরেছিলাম। একদিনে পৃথিবীর রঙ পাল্টে গেল। একটা দারুণ ভয় আমার অনভিজ্ঞ যৌবনকে ঘিরে রইল। সারা রাত না ঘুমিয়ে কেটে গেল। মনে মনে ভাবলাম এখন কি করি। উপদেশ দেবাব মতো আমার কেউ ছিল না। এ কথা কাকেই বা বলতে পারতাম। এমনিতে আমাদের স্পেনে আধুনিকতার আলো একটুও ঢোকেনি। প্রাচীন সংস্কার, মন্ত্রপড়া তুক্‌তাক্‌ ঝাড়ফুঁকে সবাই বিশ্বাস করে। এ রকম গুরুতর ব্যাপার সেখানে কেউ সহজ চোখে দেখবে না। তার ওপর বাবাব চেহারাটা মনে করে আরো ভয় পাচ্ছিলাম।

নতজানু হয়ে ক্রশের সামনে বসে পড়লাম, হে প্রভু ক্ষমা করো।

জীবনের পরিচয় যখন অগভীর থাকে তখন জীবন সম্পর্কে কোন সংশয় থাকে না। সেই পরিচয় গভীর হলে জীবনকে চেনা যায় বেদনা স্পন্দনের পরিমাপে। সকাল হল কি করে সে আমি শুধু জানি। সকালে মায়ের ঘরেব কাছে একবারও গেলাম না। নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে রইলাম। বাইরের পৃথিবী তার সুখদুঃখের বিচিত্রপ্রবাহ নিয়ে বয়ে চলেছে। ওর সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ নেই। আমি নিজের যন্ত্রণায় অস্থির। দুপুরেব একটু আগে সেই পরিচিত ছেলেটি এল। সামনে একটা চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করল, কি করবে ঠিক করলে?

আমি একেবারেই ভেঙে পড়েছিলাম। বললাম, কিছুই বুঝতে পারছি না।

ওই আমাকে বললে, তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই—

আমাকে ?

হ্যাঁ তোমাকে।

আমি পাপ করেছি। আমি পাপী। আমার কি করে বিয়ে হবে ?

তুমি পাপী একথা আমি বিশ্বাস করি না। তোমাকে বেদনা থেকে উদ্ধার করতে চাই।

সে কি করে হবে ?

তোমাকে এখান থেকে নিয়ে অন্য কোথাও ঘর বাঁধবো। একবার ভুল করেছ বলে তোমাকে নীচে নেমে যেতে দিতে পারিনে।

আমার ছেলে ?

তোমাকে ভালবাসতে পারি আর তোমার ছেলেকে ভালবাসতে পারবো না ! একটু থামলো সে, তুমি রাজি ?

বললাম, দু'দিন সময় দাও—

চলে গেল সে। সন্ধ্যে বেলা কাটিলিনার গীর্জায় গিয়ে হাজির হলাম।

জানালার এক ধারে অন্ধকার, একধারে আলো। মনে মনে ঈশ্বরকে অনুভব করলাম। কিছুটা শান্তি পেলাম। তারপর অন্ধকারেই ফিরে এলাম বাড়িতে। রাস্তায় লোকজনের চলাচল, গাড়ির ঘণ্টার শব্দ, পথচারীদের পায়ের আওয়াজ অস্ফুট সংলাপ আমার মনের সামনে দিয়ে ভেসে যেতে লাগল। আমি নিজের ভবিষ্যতের ভাবনায় মগ্ন ছিলাম।

কতোক্ষণ হেঁটেছিলাম জানিনা. দেখি আমাদের পুরোন চাকর রুডলফো ছুটে আসছে। বেচারা আমাকে দেখতে পায়নি। আমি তাকে থামিয়ে বললাম, এই যে রুডলফো আমি এইখানে—

বেচারা থতোমতো খেয়ে বলল, হাঁ আপনাকেই খুঁজতে এসেছি। চলুন—

বাবা বাড়ী ফিরেছেন নাকি ?

না।

মা ডাকছেন?

না।

তবে?

তাড়াতাড়ি চলুন। কি ব্যাপার জানিনে। একজন লোক একটা চিঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সম্ভব- অসম্ভব অনেক ভাবনাই মনে এলো। কিন্তু বুঝে উঠতে পারলাম না কে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে পারে। জোর পায়ে পথ পার হয়ে বাড়িতে এলাম, বাইরের ঘরের সামনে লোকটা পায়চারি করছিল। জীবনে এই প্রথম লোকটাকে দেখলাম।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। নত হয়ে অভিবাদন জানিয়ে লোকটা আমাকে একটা চিঠি দিল। তারপর আবার অভিবাদন জানিয়ে লোকটা চলে গেল।

খাম খুলে দেখলাম একটা চিঠি। বাবার এক বন্ধু লিখেছেন। একটা হসপিটালের ঠিকানা। যে জায়গাটা আমার চোখে পড়ল তার প্রথম শব্দ মৃত্যু। চোখটাকে আর একটু সরিয়ে সম্পূর্ণ বাক্যটা পড়লাম: পীরেনিজ পাহাড়ে এক মোটর দুর্ঘটনায় তোমার বাবার মৃত্যু হয়েছে। প্রথমে ব্যাপার বুঝতে যেন একটু সময় লাগল। মৃত্যু আর বাবা এই দুটো শব্দের মধ্যে যোগসূত্র যেন কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। হঠাৎ চিঠিটা বুকে জড়িয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলাম। মনে হল পৃথিবী থেকে আমার শেষ আশ্রয়ও সরে গেল।

প্রভু তুমি আমাকে কি ভুলে গেছ! ভিজে চোখের জলের নোনতা স্বাদ লাগল। অনেকক্ষণ কাঁদলাম। কেঁদে নিজেকে সুস্থ মনে হল। মনে হল আর এ বাড়িতে থাকবার দরকার নেই। পৃথিবীর আর কোথাও অন্য কোথাও একটু বেঁচে থাকবার মতো জায়গা খুঁজে নেব।

সেই রাত্রে এক পোশাকে বাড়ি ছেড়ে চলে এলাম। একবারও পিছন ফিরে তাকাই নি।

গভীর রাত্রে সেই ছেলেটির দরজায় এসে টোকা দিলাম। ঘুম-ঘুম চোখে সে দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

এটা মাদ্রিদের বস্তি এলাকা। অনেক রাত্রে এখানে মেয়েদের পক্ষে একলা চলাচল করা বিধেয় নয়। আমার আর ভয় কি! হারানোর সব কিছুই তো হারিয়েছি।

তুমি। ও প্রথমে একটু বিস্মিত হল, এসো, ঘরে এসো—

তুমি চলে আসবার পর অনেক ভেবেছি। ভেবে দেখলাম ভাবনারও শেষ নেই। তা ছাড়া বাবা মারা গেছেন এ্যাকসিডেণ্টে, বাধা দেবার কেউ আর রইল না।

বোস্। বোস্। হাত ধরে আমাকে ওর বিছানায় বসিয়ে দিল। মনে আছে সেই ঘরে কাটিয়েছিলাম প্রায় চার মাস।

একটা মরা ছেলে হয়েছিল আমার।

এর পর ছেলেটি বলল, আমার অবস্থা তো দেখছো কোন রকমে চলে। তোমাকে বসে খাওয়াই এমন সামর্থ নেই। মনে হয় তোমার একটা কাজ জোগাড় করে দি।

মাথা নাড়লাম আমি।

আমার একজন বন্ধুর একটা বার আছে। সেখানে বললেই তোমার কাজ হয়ে যাবে। তুমি যদি রাজী থাকো—

আবার মাথা নাড়লাম আমি।

বেশ চলো আজই তোমাকে তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।

সেখানে যেতেই কাজ হয়ে গেল। ভদ্রলোক বললেন, আজ রাতেই কাজে লেগে যান।

লেগে গেলাম কাজে। অবশ্য দু'চারদিন বাদে। এর মধ্যে অন্য ধরণের কাজের খোঁজ করেছিলাম। যা হোটেলের বারমেডের চেয়ে ভাল। জুটল না। অনেক রকম লোকের সংগে এখানে আলাপ হত। বিচিত্র নেশার বিচিত্র ধরনের মানুষ। কারো কারো প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতাম।

সেই প্রথম বুঝলাম আমার মধ্যে এমন একটা আবেগ আছে যা সংযত করা কঠিন। এ ধরনের আকর্ষণ আমার অচেনা নয়।

কয়েকদিনের মধ্যে একজন ইতালিয়ানের সঙ্গে আলাপ হল। তার টেবিলে মদ রাখতে সে আমাকে নিমন্ত্রণ করল তাকে সঙ্গ দেবার জন্য। কি রকম বাদামি তাব চোখ দুটো মুখেব উপর ভেসে আছে। বয়েসটা বোধহয় পঞ্চাশের কাছাকাছি। মাথার সামনের দিকের কয়েক গোছা চুলে পাক ধরেছে। একটুখানি রহস্যময় নিষ্ঠুরতা তার ঠোঁটে উজ্জ্বল হয়ে আছে। লোকটাকে দেখলে মনের মধ্যে কেমন শঙ্কা উপস্থিত হয় অথচ তীব্র একটা আকর্ষণ অনুভব না করেও পারা যায় না।

তার টেবিলে বসলাম আমাকে পানীয় অফার করল। আমার তেমন অভ্যাস ছিল না। সবিনয় প্রত্যাখ্যান করলাম, তাতে যে লোকটা কিছু অসন্তুষ্ট হল মনে হল না। দ্বিতীয়বার সে আমায় অনুরোধ করল না। জিজ্ঞেস করল' কতোদিন এখানে কাজ করছ।

বললাম তাকে, সামান্য কয়েক দিন।

কেমন লাগছে কাজ করতে?

খুব খারাপ নয়। তবে অন্য কাজ পেলে ছেড়ে দেব।

একটু একটু করে লোকটা আমার সব পরিচয় জেনে নিল। তার জিজ্ঞাসার মধ্যে সহৃদয়তা ছিল। তাই সব কথা বলে ফেললাম। আমি যে নিরাশ্রয় অভিভাবকহীন যুবতী একথাটা ভালো করে জেনে নিলেন।

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তার সঙ্গে দেশ ছাড়তে রাজি আছি কিনা।

কয়েক মাস অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থার মধ্যে দিন কাটিয়ে আমিও ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলাম। বললাম, আমার কোন আপত্তি নেই বাইরে গেলে যদি তেমন কোন সুবিধে পাওয়া যায়।

ভদ্রলোক অনেক সুখ শান্তির আশা দিলেন আমাকে।

একদিন কাউকে কিছু না বলে ভদ্রলোকের সঙ্গে কার্ডিজে যাত্রা করলাম। ছদ্মনাম নিয়ে সেখান থেকে কনষ্টানটিনোপল।

জাহাজে উঠে এমনি আমার বুক দুরদুর করছিল। বুঝতে পারছিলাম না কাজটা ভালো করলাম কি না! এই অপরিচিত লোকটার সঙ্গে কোন্ বিশ্বাসে ভেসে পড়লাম। সেখানে ইতালিয়ানটি আমাকে যে বাড়িটাতে নিয়ে হাজির করল সেটা একটা গণিকালয়।

সেখানকার ভাষা জানিনে। চেনা জানা লোক নেই। টাকাকড়িও কিছু নেই। একবেলা থেকেই বুঝতে পারলাম আমাকে কি করতে হবে। লোকটিকে ধন্যবাদ প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড়ই কিনে দিলে না —নিকটবর্তী পুলিশ ষ্টেশনে নিয়ে আমার নামটা পঞ্জীভুক্ত করিয়ে দিল।

এর জন্য আমার পনেরো কি কুড়ি পাউণ্ড লাগল। সে টাকাও সে দিল। নিজের অবস্থায় নিজে ভেঙে পড়ছিলাম। কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ জানানোর মতো মনের অবস্থাও ছিল না। হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। ভাগ্য যে দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তার বিরুদ্ধাচরণ করবার মতো কোন শক্তিও আমার ছিল না।

ইতালিয়ানটি বলল, মনোযোগ দিয়ে কাজ করো তোমার উন্নতি হবে।

হা ঈশ্বর! নরকে আবার উন্নতি!

তবুও কাউকে অভিশাপ দিইনি। আমার নিজের প্রতিও কোন অভিযোগ ছিল না।

একদিন সকালে একজন গ্রীক ঘরে ঘরে টাকা ধার দিতে এল।

আমি তাকে ঘরে এনে বসালাম বললাম, ষাট পাউণ্ড ধার করতে চাই।

কতো দিনে শোধ দেবে?

মাস তিনেকের মধ্যে।

বেশ। জানোতো এসব ক্ষেত্রে চড়াসুদে টাকা নিতে হয়?

কতো সুদ দিতে হবে?

শতকরা তিন ভাগের এক ভাগ।

বড়ো বেশি সুদ!

তা একটু বেশি।—কি করবে—আমার হাতে কিন্তু বেশি সময় নেই!

মাথা নাড়লাম, নেব।

লোকটি ষাট পাউণ্ড থেকে কুড়ি পাউণ্ড কেটে নিল। তার প্রথম মাসেব স্থদ। তারপর লোকটি বললে, টাকার দরকাব কি তোমার?

কয়েকটা পোশাক কিনতে হবে!

তাব জন্যে টাকা হাতে নেবার দরকার নেই। আমার চেনাশোনা দোকানে যাও তোমার পছন্দ মত জিনিষ নিয়ে আসতে পারবে।

সেই ভালো।

গ্রীকটির কথা মতো সেই দোকানে গিয়ে কয়েকটা পোশাক কিনে নিয়ে এলাম। একটু বোধহয় পছন্দ করে কিনেছিলাম।

পরে বুঝতে পারলাম এর জন্যে আমাকে এত দাম দিতে হবে যার ফলে কোন দিন নিজের স্বাধীনতাকে ফিরে পাবো না।

আমাদেব বাড়ির গৃহকর্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, সেই ইতালিয়ান ভদ্রলোকটি কয়েক দিন আসছেন না। তার কোন খোঁজ পাওয়া যেতে পাবে কি?

সে কনষ্টানটিনোপল ছেড়ে গেছে।

কেন?

নতুন পণ্যের জন্যে। বসে থাকলে টাকা আসবে কো: থেকে?

আমি কি করবো?

তোমাকে তো বাছা আমার কাছে বেচে দিয়ে গেছে।

আমাকে?

হ্যাঁ নগদ কড়কড়ে পাচ হাজার ফ্রাঙ্ক আমার ঘরে টেবিলে বসে গুণে নিয়েছে।

আমি অবাক হবে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

কয়েক দিন ধরে তোমাকে বলবো ভাবছিলাম। এবার থেকে তোমার দৈনিক রোজগারের টাকাটা আমাকে জমা দেবে। আমার

টাকাটা তুলে নিতে হবে তো।

একদিকে গ্রীক পাওনাদার অন্য দিকে আমার গৃহকর্ত্রী। দুই পাওনা-দারের টানাপোড়নে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম।

বেশি টাকা রোজগারের দুঃসহ উপায় আমাকে গ্রহণ করতে হল। বেশি লোককে ঘরে আনতে লাগলাম। এর মধ্যে রুচির কোন বালাই ছিল না। ফলে কিছু দিনের মধ্যে রোগে পড়লাম। হাসপাতালে এ সব রোগের বিনা পয়সায় চিকিৎসা নেই। কাজেই আবার একগাদা ধার করতে হল। হিসেব করে দেখলাম অনেক টাকা। উপায় কি আবার সেই গ্রীকটার কাছে হাত পাততে হল। বুঝতে পারলাম আমি তলিয়ে যাচ্ছি। এর থেকে বোধহয় জীবনে কোনদিন মুক্তি পাবো না। লোকটা বললে, সুস্থ হয়ে ব্যবসা শুরু করলে একটা পয়সাও নিজের হাতে রাখবে না। প্রত্যেক দিনকার রোজগার আমাব হাতে দেবে।

মাথা নাড়লাম, তাই হবে।

লোকটা চিকিৎসার কোন ত্রুটি করল না। তাড়াতাড়ি আমাকে সারিয়ে তুলল।

ডাক্তার বলল, সাবধান হয়ে না চললে আবার ধরবে।

হাসলাম। ধরলেই বা। ক্ষতি কি। কি দাম আমার জীবনের। হসপিটাল থেকে বাড়িতে ফিরে এলাম। বাড়ি মানে আমার সেই কোয়ার্টারে। গৃহকর্ত্রী বলল, মন দিয়ে খদ্দের ধরো। অনেক দেনা হয়ে গেছে তোমার। গ্রীকটার হাত ছাড়াতে না-পারলে কিছুই রাখতে পারবে না। অবশ্য আমি তোমাকে সাহায্য করবো।

পরে জানতে পেরেছিলাম। একজন গ্রীক অন্যজন তুর্কী। আর দুজনের বাড়িই সাইপ্রাসে। একসঙ্গে ব্যবসা শুরু করেছিল পরে ভাগ হয়ে গেছে। কেউ কাউকে দেখতে পারে না। আর সেই ইতালিয়ানটি এদের এজেন্ট। দেশ-বিদেশ থেকে মেয়ে ধরে এদের কাছে বিক্রী করাই তার পেশা, আর আমার ভাগ্যেও তাই ঘটেছে।

এইখানেই মঁসিয়ে রেঁনার সংগে দেখা। তিনি আমাকে গ্রীক

পাওনাদার আর সেই তুর্কী বাড়িওয়ালীর হাত থেকে উদ্ধার করেন। প্রায় দশ হাজার ফ্রাঙ্ক দিয়ে কিনে নিলেন আমাকে। তিনিই আলজিয়ার্সে নিয়ে আসেন।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, তুর্কী বাড়িওয়ালী তার পাওনা সত্তর পাউণ্ড চেয়ে নিতে ভুলে গেছিল। মসিয়ে রেঁনা এখানে জায়গা পাবার ব্যবস্থা করে দেন। তারজন্যে তাঁর কাছে ঋণী।

কখনো মনে হয় আমি যেন একটা আন্তর্জাতিক পণ্য। পৃথিবীর বাজারে বিক্রি হয়ে চলেছি। খদ্দেরের পর খদ্দের আমাকে কিনছে লাভের প্রত্যাশায়। এক দেশ থেকে অন্য দেশ, এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপ, এক হাত থেকে অন্য হাতে ক্রমাগত বদল হয়ে যাচ্ছি।

আলজিয়ার্সে যাবার ষ্টিমারে আমাকে একটা যন্ত্রণাদায়ক অপারেশন করা হয়। অপারেশন হয়ে যাবার পর আমাকে জানানো হয়েছিল। কেন আমাকে অপারেশন করা হয়েছিল সে খবর আমাকে দেন নি। তবে আমি আন্দাজ করতে পারি।

আলজিয়ার্সে এনে মঁসিয়ে রেঁনা আমাকে মঁসিয়ে দঁবের কাছে হাত পালটালেন। আমার দাম কত উঠল সে খবর আমি জানতে পারি নি।

মঁসিয়ে দঁবে ডাক্তারি পরীক্ষার পর আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিলেন। জীবন এখানে খুব খারাপ নয়। জন্মভূমি প্রিয়জনদের থেকে অনেক দূরে আমি এসে পড়েছি। কখনো তাদের দেখতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে আবার স্পেনের নীল আকাশের নীচে ফিরে যাই।

না, আর কোথাও যাবো না। এখানে এই ঘরে নিঃসঙ্গ অবস্থায় মৃত্যুকে পেতে চাই।

এই হোল আমার গল্প মঁসিয়ে।

সত্যি বলছি আমি সুখী। আমি সুখী। আমি সুখী।

মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, তাদের পারিবারিক জীবনে অনেক বিচিত্র ঘটনা ঘটে গেছে। তার একজন কাকা মাতাল

হয়ে জলে ডুবে মারা গেছেন। দিদিমা উন্মাদিনী অবস্থায় পাগলা গারদে মারা যান। ঠাকুর্দাও বিকৃত রুচি ও বিকৃত মস্তিষ্কের লোক ছিলেন। তার এক খুড়তুতো ভাই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে! এ ছাড়া আরো অনেক ছোটখাটো ঘটনার বর্ণনা সে আমাকে দিয়েছিল। বাহুল্যের ভয়ে তার উদ্ধৃতি দিলাম না।

আমি আর আলি সোফায় বসেছিলাম। ও বেচারা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ঘরে টিমটিম করে আলো জ্বলছে। বোধহয় তেল ফুরিয়ে গেছে।

সেই আবছা আলো-আঁধারিতে মেয়েটিকে আশ্চর্য সুন্দরী মনে হয়েছিল।

আমি উঠলাম। উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাইরে রাত তখনো আলোর উর্বশী। রাত্রির অভিসার তখনো পুরো মাত্রায় চলেছে।

জানালা থেকে ফিরে এলাম।

টেবিলের ওপর কয়েকটা নোট রাখলাম।

বললাম, তোমার গল্পের জন্যে ধন্যবাদ।

মাথা হেলিয়ে অভিবাদন করল সে।

বাইরে বেরিয়ে এলাম। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের তারাভরা আকাশ। মেয়েটার অতৃপ্ত জীবন বাসনার মধ্যে যে বিষণ্ণ রাগিনীটুকু ছিল মনের মধ্যে তাই গুনগুনিয়ে উঠছিল।

আলির দিকে তাকালাম। দেখলাম ঘুমের ঝোঁকে হেঁটে চলেছে-

ফিরতি বাসে চেপে বসলাম।

বিদায়। বিদায়। হে বরবর্ণিনী রাত্রির নগরী।

সাদা পাঁচিলের আড়ালে একটি নাম:

বৌসবীর।

সুরা ও সুরসুন্দরীদের নগর।

পরদিন হোটেলে এসে সেই সাংবাদিক বন্ধু বলেছিলেন, এতো কাছে যখন এলেন একবার আলজিয়ার্সের অন্ধকার এলাকাটাও ঘুরে যেতে চেষ্টা করবেন। বার্বারি উপকূলের দুর্দ্ধর্ষ মূরদের জীবনের এক বিচিত্র পরিচয় আছে সেখানে।

বলেছিলাম, সময় করে নিতে পারলে নিশ্চয়ই যাবো।

ঝাঁকবাধা কইমাছের মতো সাংবাদিকদের দল মন্ত্রী মশাইয়ের পথ উজিয়ে চললো। টিউনিস তানজিয়ার আলজিয়ার্স। হাঙরের পিছনে যেমন পাইলট ফিস, রাজনীতিকদের পিছনে তেমনি সাংবাদিক।

প্রোগ্রামের ঠাসবুনতে এদিক-ওদিক যাওয়া মুসকিল। ওরি মাঝখানে দুটো তিনটে দিন বিকেলে একটু সময় হয়েছিল। সে আর কোথাও না, খোদ আলজিয়ার্সেই।

একলাই গিয়েছিলাম। একটু আগে আগে। ফরাসি পাড়ার এক রেস্তোরাঁর কোণে বসে এক ফরাসি তরুণের মন্তব্য শুনলাম......

দেখলেন মঁসিয়ে, মূরটা মেয়েটির ওপর কেমন আরবি ঘোড়ার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। কথাগুলো বলল তার সঙ্গীকে।

ওদের প্যাশন একটু বেশি। উত্তরটাও আমার কানে ভেসে এল।

আলজিয়ার্সের লা ফ্রাঁস কাফের এককোণে বসেছিলাম। সামনে কফির পেয়ালা। অবাক হয়ে দেখছিলাম। সিগারেট পুড়ে যাচ্ছে। আমার ভারতবর্ষীয় চোখে মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তৃত ভুখণ্ডের পরিবেশকে রহস্যময় মনে হয়। অথচ জায়গাটা হাবেভাবে যেন প্যারিসের অনুকৃতি। কাফের ভেতরে বসে মনে হবে না প্যারিসের বাইরে আছেন। ইংরেজ ফরাসি ইতালিয়ান মাল্‌টিজ স্পেনিস জু কেউ বাদ নেই। অপরিচিত ও বিচিত্র শব্দের ঐকতান জলতরঙ্গের মতো স্পন্দিত। এই সব বিদেশিরা কেউ কফি খাচ্ছে, কেউ বিয়ার, এদের হাসি ঠাট্টা শপথে কাফে গুলজার।

ওদিকে পথের জনতা আরব মূর বার্বার ক্যাবিল্‌স্। বারনুজ আর কাফতান পরে দৃঢ় পায় হেঁটে চলেছে। জানালার বাইরে আলজিয়ার্স-

এর বিকেলের আকাশ। ফিকে নীল অথচ উজ্জ্বল। হালকা মেঘের ওপাশে একটুখানি চাঁদ। চাঁদ নয় চাঁদের ছায়া। একটু দূরে আটলাস আর জুরড্জুরা পর্বতের চূড়ো। আলোছায়া আর বরফে ঢাকা চূড়ো দুটো অদ্ভুত দেখাচ্ছে। ওরই তলায় মিটিডজার উর্বর ক্ষেতখামার বাড়ি বাগান। দিনের বেলায় সোনালি পীত কমলার ক্ষেত আর দ্রাক্ষাকুঞ্জেব লতায়িত নীল বিস্তারে চোখ রাখা যায়।

অনেককাল আগে জায়গাটাব আরব আটপৌরে নাম ছিল এল্ ডাজেয়ার। এইখানে খাসবার দুর্গে বসে বিদেশি সিন্ধুদস্যুরা জাহাজের ওপর লক্ষ্য রাখতো। সে সব দুবৃত্তের দল কবে অতীত হয়ে গেছে।

ইতিহাসেব পাতায় একটু উঁকি দিলে এখানকাব মুসলমানদের বোঝা সহজ হবে।

মরুভূমিব অবশেষ থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত আফ্রিকার এখানে সেখানে ছড়ানো কতো রোমান স্পর্ধার চিহ্ন। এককালের যে সভ্যতা গর্বিত দর্পিত পদক্ষেপে দিগদেশে পা ফেলেছিল। এখনকার আলজিয়ার্স টিউনিস আর টানজিয়াব সেই অতীতেব বুক থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। অতীত রোমেব সেই সব বিবর্ণ বিস্মৃত শহরের বিলাস আভিজাত্য আব সম্পদের সংগে এখনো পাশ্চাত্যের খুব কম সহবের তুলনা হয়। রোমেব প্রতিদ্বন্দ্বী কার্থেজ, থাইস্ড্রিস্—যার এম্ফি-থিয়েটারে ষাটহাজার লোক বসতে পারত, ক্যাইসারিয়া—প্রাচ্যের এথেন্স বলে যার পরিচিতি—প্রত্নতত্ত্ববিদের দল খোঁড়াখুঁড়ি করলে এখনো মাটিব তলা থেকে তাব কংকালের অবশেষ খুঁজে বের কবতে পারেন।

এখানেই অতীতে ভিনিসিয়রা এসে পত্তনি করে। এখানেই বল্ মোলোচ-এব আগুন জ্বলে উঠেছিল—এখানেই এস্টারথ্-এর পূজোর গম্ভীর ঘণ্টা বাজিতে শোনা গেছে। এই পৌত্তলিক পৃথিবীর মন্দিরে পুরোহিতের শ্লোকসংহৃত মন। ধ্বনি উচ্চারিত হত সমুদ্রের অনাদি প্রার্থনার মতো।

সে সব অনেককাল আগেকার কথা। তারপর এল আরবরা। কার্থেজ তখন মরুভূমির বালির তলায় ডুবে গেছে। শুধু তার অপরিমিত ঐশ্বর্যের রূপকথা বেদুইন দস্যুদের বিভ্রান্ত করে দেয়।

একদিন আরবদের শক্তিতে ভাঁটা এল। আরবদের জাহাজগুলো পর্তুগীজদের হাতে মার খেয়ে পাল গুটিয়ে বন্দরে এসে ভিড়ল। ইউরোপের চোখে তখন প্রাচ্যের সোনার নেশা। পর্তুগীজ ইংরেজ ফরাসি ডেনিশ ডাচ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে সাগরের বুকে পাল তুলে দিল। ইংরেজের পা ঠেকল ভারতের মাটিতে, ফরাসিদের আফ্রিকার উপকূলে। তারপর দীর্ঘ শাসন আর শোষণ সে তো আজকের ইতিহাস।

কিন্তু ফরাসিরা আরবদের কতটুকু পালটাতে পেরেছে। জমির অধিকার যদিও ফরাসিদের হাতে, আত্মার অধিকার নিজেদের হাতে রেখেছে আরবেরা। সেই হাজার বছর আগে রক্তাক্ত সংগ্রামের পর আরবরা রোমানদের তাড়িয়ে এ'দেশে বসতি করেছে। দিগন্তে বিলীন মরুভূমির বালির মধ্যে এক ফোঁটা ওয়েসিসের স্বর্গ আর বাদবাকি বন্ধুর পাহাড় বালির স্তূপ মরুঝড় এরই মধ্যে এদের শৈশব কাটে যৌবন উষ্ণ হয়। মরুভূমির বিচিত্র মর্জির মতো এদের মেজাজের মতিগতিও বিচিত্র। মরুভূমির অন্তহীন বিশাল অনুর্বরে শীতল নিষ্ঠুরতা আর অনিবার্য ললাটবাদি হিসেবে পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশের অধিবাসী থেকে এরা স্বতন্ত্র।

মরোক্কোর মূর আর আলজিয়ার্সে'র আরবরা ভালবাসার জন্যে যে কোন মূল্য দিতে পারে। ইপ্সিত নারীর জন্যে এরা ঘরবাড়ী পরিবার পরিজন জন্মভূমি সব কিছুই ত্যাগ করতে পারে। যে কোন অবস্থায় মূর—যতো দরিদ্রই সে হোক না কেন তার বর্বর দেহবিলাসের সুখে, সঞ্চিত সব সম্পদই ত্যাগ করতে পারে। সেই একটু সময়ের সুখে নিজেকে ফৌত করে একদিন-কা-সুলতান সাজতে একটুও আপত্তি নেই।

অথচ এইসব মূর আর আরবরা সমাজে মেয়েদের কি মূল্য দেয়। উটের মত একটি প্রয়োজনীয় সম্পত্তি বলে মনে করে। মুসলমানী

আইনই এই। সাধ্যে থাকুক আর না থাকুক হারেমের সংখ্যা এরা বাড়িয়ে যাবে। দৈহিক আনন্দের বহু রকম উপায় এরা পরখ করে। এমন কি জীবিত ও মৃত পশুদের সঙ্গে ব্যাভিচারেও এরা আনন্দ পায়। এদের দেখলে বিস্ময় জাগে। নজরুল ইসলাম কোথায় যেন জিজ্ঞেস করেছেন, "রমণী রমন-রণে কে পাবে জিনিতে?" এদের না-দেখলে বলতে হত, কেউ পারে না।

দেহের অত্যাধিক ব্যবহারের ফলে শক্তি ক্রমশ ক্ষয় হয়ে আসে। তখনই নৈরাশ্য থেকে নিষ্ঠুর আনন্দে পথ খুঁজে পায়। আর সেই জন্যে আলজিয়ার্সে'র কি মূর কি আরব এলাকায় খুনোখুনি তো নিত্যিকার ব্যাপার।

যে কোন বিদেশির পক্ষে আলজিয়ার্সে' এসে সমঝে চলা উচিত। এখানে লোভ তোমাকে বারবার উতলা করে তুলবে। ক্ষণিকের বিভ্রান্তি রক্তে খরতা এনে দেবে। সাবধান, মরুভূমির মঞ্জরীর পিছু নিও না। তাহলে তোমার ভাগ্যে হয়তো অপঘাত লেখা থাকতে পারে।

অনেক জেনেশুনে আমিই কেমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। কালকে ঠিক সন্ধ্যেবেলায়—শুধু একবারই সেই হাওয়াটা উড়ে এসেছিল ধূসর সমুদ্র থেকে আর একবারই সরে গেছিল তার মুখের অবগুণ্ঠন। বিকেলের নিষ্ট রূপকথার শেষে সন্ধ্যার অস্পষ্ট মুখের তন্দ্রাতুর বাতাসের দীর্ঘশ্বাস আমাকে উন্মনা করে দিয়েছিল। সেই অস্পষ্ট মুখরুচি একবার মাত্র দেখা দিয়ে জলাবিয়া অবগুণ্ঠনের তলে ঢাকা পড়ে গেল। আমার মনে হল বাতাসের হাত বুঝি নিজের কৌতুহলের স্বাদ মেটাল।

আকাশে চাঁদ! না চাঁদ নয়, চাঁদের আলো। আলো! না আলো নয় আলোর লাবণ্য। সেই মুহূর্তের অবসরে অনিন্দ্য মুখরুচি দেখলাম। দেখে আশ্চর্য হলাম। বিপন্ন বিস্ময়ে টলমল করে উঠল চোখের পাতা। কিসের আকর্ষণ এল চোখের কানায় কানায়। জানি না। ক্ষণকালের জন্য বিবশ বিহ্বল হয়ে গেল হৃদয়। চারিদিকে তাকালাম। তাকিয়ে দেখলাম কেউ আমার দিকে দেখছে কি না।

কাফিখানার হাতায় দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম। চোখ ছুটো সামনের দিকে অপলক মেলে দিয়েছিলাম। কাফিখানার আধ খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে আলোর আভাস আসছে। আলোর সঙ্গে কাঠের বেড়ার ছায়া। ভেতরের দিকে তাকাতে চেষ্টা করলাম। প্রায় অন্ধকার। হাতের ওপর মাথা রেখে একটা আরব বসে আছে। দীর্ঘ দেহ ঘিরে রাবনুজ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

দূরে কোথায় মসজিদের শিখরে মুয়াজ্জিনের আজান। মনে হল যেন সমুদ্রের ওপার থেকে ভেসে আসছে।

চাতাল থেকে নেমে পড়লাম। মেয়েটি ততক্ষণে সেই শূন্য নগরীর বিধ্বস্ত পাঁচিলের গা বেয়ে চলতে সুরু করেছে। তার সরটা ভাল করে বোঝা যাচ্ছে না। শুধু নরম সাদা বারনুজের ইশারা চোখের সামনে ভাসছিল। অনুমানের ওপর ভর করে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। তার খালি পায়ের নিশানার মাঝে মাঝে পথের হদিশ দিচ্ছে।

পথ জনহীন। আঁধারে বিলীন। ছু' পাশের স্থবির পথঘাট গৃহ সমাবেশের মাঝে চলমান ছুটি ছায়া। পথের মাঝে মাঝে তালজাতীয় গাছের জনপদ। স্বল্প বাতাসে তাদের পাতায় নিসর্গ সঙ্গীতের উচ্চারণ। কখনো ছোট ছোট বাগিচা পার হয়ে যাচ্ছিলাম। ওর সঙ্গে আমার পথের পার্থক্য যেন অন্তহীন। মনে হচ্ছিল কোন দিন ওর কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারবো না।

একটা বাজারের কাছাকাছি এসে পৌঁছলাম। একদল কুকুর ঘেউ ঘেউ করে অভ্যর্থনা জানালো। মেহেদি রঙের দাড়ি ভরা মুখ নিয়ে আরব ফলব্যবসায়ীদের দল সারি সারি দোকান সাজিয়ে বসেছে। দোকানের সামনে বসে কেউ গড়গড়া টানছে। বাতাসে সুগন্ধি গন্ধ।

কাছাকাছি দেখলাম একদল উঠ মরুতৃণের গুচ্ছ একঘেয়ে ভাবে চিবিয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ উদাস হয়ে দূর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে। হয়তো এই সব মরুজাহাজের দল আজ রাতেই বন্দর থেকে নোঙর তুলবে।

বাজার থেকে সরে একটু দূরে বালির মধ্যে ডুবে গেল সে। দু'পাশে পাথরের দেওয়াল। একটু যেন স্যাঁতসেঁতে। জলের জন্য নয়। গন্ধের জন্যে। আর সেই গন্ধ আদিম ও অপরিচিত। ভয় করে। ভয়-ভয় করে। গলির এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে সেই পথের নিরন্ধ্র অন্ধকারের দিকে তাকালাম। কোথাও ঈষৎ আলোর ইসারা নেই। শুধু একটা পায়ের মিলিয়ে যাবার শব্দ পাচ্ছি। তবু পা বাড়িয়ে দিলাম, যাকে দেখতে পাচ্ছি না তার আভাষ তো পাচ্ছি।

গলিটা এঁকেবেঁকে একটা চৌরাস্তায় গিয়ে পড়েছে। দু'পাশের বাড়ীর গায় দক্ষিণ দিককার মূর ব্যবসায়ীদের দোকান। কোথাও অপরিচিত অবয়ব কাফিখানা। দোকানের সামনে মগহার্বের মূররা গুলতানি করছে কফির পেয়ালা সামনে রেখে।

মেয়েটিকে একটু দূরে দেখতে পেলাম। কখনো থেমে যাচ্ছিল বুঝি। হয়তো আমাকে ঠিকানা দিতে। পা চালালাম। দু'পথের দেওয়ালে গা ঠেকে যাচ্ছে। মৃতের শরীরের মতো ঠাণ্ডা। বৃষ্টিহীন অঞ্চলের সেই পরিচিত গন্ধ পাথরে জমে আছে। এখানে কিছুটা বুঝি বা উগ্র। মাঝে মাঝে দু' একটা লোকের সন্ধান পাচ্ছি। পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। এত অন্ধকার যে ঠাহর পাচ্ছি না। কোথাও কোন বাড়ির চত্বরে গাধা ডাকছে। সেই একঘেয়ে কর্কশ ওঠানামা। হঠাৎ একটা মিষ্টি গন্ধ পেলাম। পরিচিত ফরাসি পুষ্পসারের গন্ধ। জিলাবিয়া বোরখার আড়ালে একটি নারী। পাশ দিয়ে সরে গেল।

এবার একটু বড়ো পরিসরের পথে পা দিলাম। পথের ধারে কাফের সামনে আসর জমিয়েছে অফিসারের দল। কেউ তাস খেলছে। কেউ সিগারেট টানছে। মাথায় উঁচু টুপি। এদের হল্লা পিছনে পড়ে রইল। আবার অন্ধকারে নামলাম। অনেক দূর থেকে আরবদেশি বাঁশির ক্লান্ত বিলাপ ভেসে আসছে। তার সঙ্গে বে-মানান ড্রামের আওয়াজ।

দূরে সমুদ্রের ভেতর দেখা যাচ্ছে আবছা পাহাড়ের সার—হারকিউ-

লিসের পিলারের মত স্তব্ধ।

এখন অন্ধকারে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

আর কতদূর আমাকে নিয়ে যাবে জানি না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ওকে বলতে ইচ্ছে করে :

আর কতো দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরি,
বলো কোন পারে ভিড়িবে
তোমার সোনার তরি ?

উঁচু থেকে নীচে নামলাম। সামনে পিছনে অন্ধকার। বসতি ক্রমশ বিরল হয়ে আসছে। মেয়েটি সোজা একটা আবছা গৃহসমাবেশের দিকে এগিয়ে গেল। আমিও পায়ের জোর বাড়িয়ে দিলাম। ওই বাড়িগুলোর অন্ধকারে পৌঁছবার আগেই ওকে ধরে ফেলতে চাই। প্রায় কাছাকাছি এগিয়েও গেছি। পাঁচিলের আড়ালে সরে যেতে দেখলাম। ভেতরে ঢোকার আগে আমার দিকে তাকিয়ে গেল। তারপর হাওয়ায় মিলিয়ে গেল বুঝি।

দরজার সামনে এসে থমকে গেলাম। সামনে এক বিশাল অথচ কদাকার দেহ মূর। এমনি আলোতে সে তেমন ভয়ের কিছু নয়। সেই অপরিচিত কেরোসিনের শিখার সামনে তার মুখের আকৃতিতে আলো আর অন্ধকার জমে রহস্য ঘনিয়ে উঠেছিল।

আমার পায়ের শব্দ শুনে সে যেন চমকে উঠল। মুখ তুলে তাকাল; তাকিয়ে অবাক হল। সেই বারনুজ কাফতান জিলাবিয়া পরিচ্ছদে ঢাকা দেহের মধ্যে কেবল উজ্জ্বল চোখ দুটোতে প্রেতাত্মার ক্রূর সংকেত।

বুকের কাঁপন বেড়ে গেল। এতক্ষণে খেয়াল হল যৌবনের বেহিসেবি বিভ্রান্তি আমাকে এমন জায়গায় টেনে এনেছে যেখান থেকে জীবন্ত ফিরে যাওয়া মুসকিল হতে পারে। একে দূর অপরিচিত দেশ। চেনা-শোনার বাইরে একলা আমি আলজিয়ার্সের মূর দুরাত্মাদের বিরুদ্ধে কি করতে পারি।

সহরের এটা পরিত্যক্ত পুরোন অংশ বলে মনে হচ্ছে। সমস্ত অঞ্চলে বার্বারি জটিলতা—পাথরে বাঁধানো অন্ধ গলিঘুঁজি—অন্ধকার পথ—বিধ্বস্ত দেওয়াল—পরিত্যক্ত গৃহ যা মানুষের মস্তিষ্কে অনৈসর্গিক প্রভাব আনে।

এ সব কথা যতো সময় ধরে বললাম ভাবতে ততো সময় লাগেনি। নিজের বিমূঢ় মূঢ়তার কথা ভেবে এত্ত আতংকিত হয়ে পড়েছিলাম যে মনে মনে আফশোষ করার মতো সাহসও হারিয়ে ফেলেছিলাম।

লোকটা তাকিয়েছিল আমার দিকে—আমি লোকটার দিকে। চোখে চোখ দিয়ে। সেই জনশূন্য অনালোকিত গৃহ সমাবেশের কোথাও যেন আরবি সুরের গান শুনতে পেলাম। একঘেয়ে বিষণ্ণ কান্নার মতো। অনেকটা উত্তর-মৃত্যুর বিলাপ।

লোকটাই যেন উঠে দাঁড়াল আর স্বাচ্ছন্দ্যের সংগে ফরাসিতে কি বলে এগিয়ে আসতে থাকে আমার দিকে। হঠাৎ কি মনে হল কে জানে। জ্ঞানও বুঝি হারিয়ে ফেললাম। যখন চেতনা হল দেখলাম উদ্দেশ্যহীন হয়ে দৌড়তে সুরু করেছি।

মঁসিয়ে অনুগ্রহ করে আপনার লাইটার—

স্বপ্নচারণা থেকে লা ফ্রাঁস কাফে ফিরে এলাম। ফরাসি ভদ্র-লোকটিকে লাইটার এগিয়ে চারদিকে তাকালাম।

এখনো সন্ধ্যে হতে একটু বাকি। ছোকরা কাগজ ফিরিওয়ালারা মার্সেলিস ও প্যারিস এর কাগজ সুর করে ফিরি করছে। বিদেশিরা সান্ধ্য পোষাক পরে পথে বেরিয়ে পড়েছে। সিগারেট টানছে। অনেকের সঙ্গে স্বচ্ছ দেহাবরণে ঘেরা মহিলাদের দল। কাফের ভেতর অর্কেস্ট্রা বাজছে। বেশ উত্তেজক আবহাওয়া।

পোষ্টকার্ড বিক্রেতা—মানে অশ্লীল ছবি নিয়ে দালালেরা পথে দাঁড়িয়েছে। ফিসফিস করে পথচলতি জনতার উদ্দেশ্যে আহ্বান ছড়িয়ে দিচ্ছে। এরা কয়েকদিন ধরে জীবন অতিষ্ঠ করে দিয়েছে। এরা যেমন অসভ্য তেমনি অভব্য। এদের মধ্যে একজন আমাকে বলেছিল,

যে সব ইংরেজ ও আমেরিকান মহিলা উত্তেজনা চান তাদের আমি মরুভূমির মধ্যে নিয়ে যাই।

ফরাসি ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, কি দেখছেন?

বোরখা পরা মেয়েদের দেখছি।

স্মিত হেসে ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, বোরখা এদের চরিত্রের মতো—সাধারণ লোকের চোখ আকর্ষণ করবার জন্যেই।

ওদের ধারণা, দেহকে ওরা যতো ঢেকে রাখতে পারবে রহস্যময়ীদের জন্যে আমরা ততো চঞ্চল হবো। সিগারেট টানতে গিয়ে থামতে হল ভদ্রলোককে, এটা অবশ্য একেবারে মিথ্যে নয়। আর এইজন্যেই এই সব মেয়েরা তাদের আচরণ সম্পর্কে খুব সচেতন। যদি বুঝতে পারে যে কেউ তাকে অনুসরণ করছে তা'হলে সে তার গতি কমিয়ে দেবে। তারপর হঠাৎ এমন করে তার মাথার ও মুখের আবরণ রাস্তার ওপর ছড়িয়ে দেবে যে আপনি আচমকা তার কাপড় বাঁচাতে গিয়ে গায়ের ওপর পড়বেন। তখনই আলাপের সূত্রপাত। তারপর হোটেল অভিমুখে অভিসার। লবিতে বসে দরদাম ঠিক করা। ঘর সেখানেই পাবেন।

এই সব বারনারীরা চমৎকার ব্যবসা চালায়। আর সত্যি বলতে কি এদের কোন রোগ নেই। মঁসিয়ে যদি ইচ্ছে করেন এমন কয়েকটা জায়গা অনায়াসে দেখাতে পারি যেখানে খুব কম টুরিষ্ট গেছেন বা যেতে পারেন। মঁসিয়ে কি আমাদের সহরে নবাগত?

মাথা নেড়ে সমর্থন করলাম।

সেই রোদেপোড়া নীলচোখো ফরাসি অফিসার বললেন, যাবেন নাকি? চোখের কোণে কেমন একটা ইসারা টেনে আনলেন, অবশ্য শুধু দেখতে।

আঃ, কি যে বলেন! আমি উল্লসিত হই, শুধু দেখতে নরকেও যেতে আমার আপত্তি নেই! মঁসিয়ের বোধ করি অনেকখানি সময় নষ্ট হবে।

তা হোক। অফিসারটি বিগলিত হাসলেন, সময়ের টানাটানি না থাকলে এখুনি যেতে পারি।

তার মুখের দিকে চোখ ফেরালাম। সিগারেট এগিয়ে দিয়ে দেখি কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। তারপর মোম দিয়ে মাজা প্রজাপতির শুঁড়ের মতো গোঁফে দু'এক বার পাক খেলিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, চলুন—

কাফে থেকে বেরিয়ে পড়লাম। হেঁটে চললাম ফরাসি পাড়ার ভেতর দিয়ে। চারিদিকে খোলা মেলা! রম্য বিলাসবিপণি। বুলভাঁর দু'পাশে ঝলমল করছে। মোটর গাড়ির স্বচ্ছন্দ বিহার। মিষ্টি ফরাসি প্রণয় সংলাপ। সব মিলিয়ে প্যারিসেই আছি মনে হচ্ছে।

একটু পরেই পথ নির্জন হয়ে এল। আমরা একটা মূরীয় কাফে পার হয়ে গেলাম। দরজাটা একটু খোলা। ভেতরে গণ্ডোরা আর বারনুজ পরা আরবরা জমায়েত হয়েছে। তাদের অনেকেই গড়গড়া টানছে। কিন্তু চোখ রয়েছে যেখানে অর্ধনগ্ন হুরী নাচের মতো অঙ্গভঙ্গী করছে। ওরা বোধহয় নাচই বলবে।

আমরা আলজিয়ার্সের পুরোন এলাকায় এসে ঠেকলাম। অনেকটা দুর্গের মতো। এ যেন রূপকথার বাগদাদ। যে মুহূর্তে আমরা খাড়া পাহাড়ি পথ বেয়ে দুর্গের ওপর এলাম, হাল আমলের আলজিয়ার্স কোথায় তলিয়ে গেল!

পথ বলতে যা বোঝায় এখানে তা নেই। পায়ে চলা পথের রেখা ধুলোয় ধূসর হয়ে লুটিয়ে আছে। পথে কোন গাড়ি কি ঘোড়া নেই। অশ্বতর এমন কি কোন পথিকও নেই। শুধু মাত্র ভারবাহি গাধাদের এখানে সেখানে দেখছি। ক্লান্ত হয়ে দার্শনিকের চোখে কোন দিকে তাকিয়ে আছে কে জানে।

দু'ধারে উঁচু পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে কখনো আকাশ দেখা যাচ্ছে। মরুভূমির সূর্যাস্ত দিগন্তে লাল। অন্ধকার হয়ে আসছে। দু'পাশের বাড়িগুলো প্রেত সমাবেশের মতো অলৌকিক। দেওয়ালের গায় অসংখ্য

দোকান। শুকনো ফলে বোঝাই। এগুলোর মালিক অধিকাংশ ক্ষেত্রে মোয়াবাইট বা দূর দক্ষিণের গোঁড়া মুসলমানের দল। এ ছাড়া বাবার উপজাতির ঋজু দেহ একহারা চেহারার ক্যাবাইলদেরও দেখা যাচ্ছে। কখনো দীর্ঘকায় নিগ্রোদের মুখ।

ফলের দোকানে কালো জলপাই, প্রবাল রক্তের আঙুর আর স্তূপীকৃত এগ্‌প্লান্টস্‌।

পথের মানুষদের মধ্যে আরবদের শরীরী আভিজাত্য দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। বণিক, ধনী বা দরিদ্র যেই হোক না, ভাগ্যকে এরা একান্ত করে মানে।

দূরে মুয়াজ্জিনের অনৈসর্গিক কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, ঈশ্বর পরমেশ্বর—মহম্মদ ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ। এসো, তাঁর কাছে নিজেকে নিবেদন করি।

আশপাশের মসজিদের মিনার থেকে সন্ধ্যেবেলার প্রার্থনার শব্দ ভেসে আসছে।

অবশেষে আরব পল্লীর ভেতর এসে পৌঁছলাম। নরকের মতো অন্ধকার। বিষণ্ণ এবং কটুগন্ধ। ভিখিরিদের ভিড়। আবর্জনায় ভরা। দিশি কুকুরের পথসভা।

অত্যন্ত সংকীর্ণ আর জটিল পথ পার হয়ে একটা কাফের সামনে এসে পৌঁছলাম। অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। দোকানের ভিতর স্তিমিত আলো। বেঞ্চে আরবরা ঠাসাঠাসি করে বসে আছে। সামনে নাচের পোষাক পরে একটি মেয়ে নাচছে। ডারবুকো আর টমটম নাচের তালে তালে বেজে চলেছে।

আমার সঙ্গী একজন আরবকে ঠাট্টার সুরে বলল, এখানেই জমে গেছ? মাথা হেলিয়ে কি যেন বলল সে। বোঝা গেল না।

যে মেয়েটি নাচছিল তাকে সুন্দরী বলা যায়। বয়েস পনেরো—হ্যাঁ পনেরোর বেশি কিছুতেই নয়। প্রাচ্য দেশিয় লাবণ্যের সঙ্গে মরুভূমির রুক্ষতার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। চোখে কামনার মায়া কাজল। টিউলিপের মতো ছোট্ট নাক। দাঁতগুলো আশ্চর্য সফেদ। সঙ্গী

বললেন, মেয়েটিকে চিনি।

মেয়েটিও দেখলাম নাচের মধ্যে মৃদু হাসিতে তাকে অভ্যর্থনা করল।

আরো কয়েকটি মেয়েকে সেখানে দেখলাম। তাদের পায়ে সস্তা ফরাসি মোজা আর জুতো। অবশ্যই আরব্যোপন্যাসের গল্পের মতো সুন্দর।

আমরা ভেতরে ঢুকলাম। আমি একটা বার্বার উপজাতিয় মেয়ের পাশে বসলাম। গায়ে তার আঁটসাট সিল্কের পোষাক। বুক ফেটে পড়ছে। গাল দুটো মস্কটের দানার মতো লাল। মেয়েটির দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিবিয়ে নিলাম।

আমার সঙ্গী মেয়েটিকে একটি ফ্রাঙ্ক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কোথায় তোমার দেশ—হে বিদেশিনী ?

বিস্‌ক্রা। মেয়েটি ঘনিষ্ঠভাবে হেসে উত্তর দিল, নাম শোননি সূর্যের দেশ—মরুভূমির রাণী—সাহারার এক সেরা মরুদ্যান।

চারদিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। একজন বয়স্ক বার্বার উপজাতির মুসলমান পাশবিক ক্রুরতা নিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। বোধহয় মেয়েটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তার পছন্দ হচ্ছিল না। একটু শংকা বোধ করলাম। রু্য সিদি বার্বাবুসির মতো এমন কুখ্যাত রাস্তা বোধ হয় পৃথিবীতে নেই। পথের এখানে সেখানে দুর্বৃত্ত আর খুনেদের দল ওৎ পেতে আছে। সঙ্গী বন্ধুকে বললাম। খেয়াল করলেন না। বরং বললেন, একটু অপেক্ষা করুন—আমার চোখের দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসল। কোন ইসারা ছিল বোধ হয় তার চোখে।

আগের নাচ অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে। তবু আসরে বসে একটি মেয়ে কেটজা বাজাচ্ছে। বেড়ালের ডাকের মতো অদ্ভুত শব্দ। সঙ্গে অন্য দু'জন ডারবুকো বাজিয়ে চলেছে। ডারবুকো দেখতে অনেকটা বোতলের মতো কিংবা বোতলের মতো দেখতে ফুলদানির মতো বলাই বোধহয় সঙ্গত। একঘেয়ে গম্ভীর আওয়াজ। কোন সুষম ছন্দ খুঁজে পাওয়া কঠিন। হয়ত আমার অনভ্যস্ত ও অপরিচিত কানে কোন সার্থকতা

খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

হ্যাঁ—হঠাৎ—একেবারেই হঠাৎ আসরে নগ্ন নিগ্রো নর্তকীদের আবির্ভাব হল। চমকে উঠলাম। পিছনে সাদা পর্দা হাওয়ায় কাঁপছে।

উত্তেজনায় পাগল হয়ে উঠেছে আরব দর্শকের দল। তারা দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছে। কি সব দুর্বোধ্য শব্দ উচ্চারণ করছে! এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ডারবুবো জিম্বব্রি আর বাঁশি বেজে চলেছে। সমস্ত জায়গাটা জুড়ে একটা আদিম কামনার আগুন উল্লাসে উত্তরোল হয়ে উঠেছে।

নাচ সুরু হয়ে গেছে। নিগ্রো মেয়েরা তাদের জিভ বাইরে ঝুলিয়ে রেখেছে। চোখের তারা এক কোণ থেকে অন্য কোণে ফিরছে। ওদের এক-একজন লম্বায় প্রায় ছ'ফুট। এমন উদ্দীপক নাচ নাচতে সুরু করলো যে দর্শকরা চঞ্চলতায় ভেঙে পড়ল।

এরা যেন কামনার কষ্টিপাথরে তৈরি। বাঘিনীর মতো প্রাণ প্রাচুর্যের সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য সারা দেহের অনায়াস হিল্লোল।

তৃতীয় জন এবং এই বোধহয় জনতার সবচেয়ে প্রিয়। স্তন আবুধের মতো উদ্ধত। সুঠাম পদদ্বয় তরুণ মেহগ্নি গাছের মতো রেখা-দীর্ঘ অথচ সবল। নাচের সময় স্তনদ্বয় অশ্বতরের পিঠে ঝোলানো জলের ব্যাগের মতো দুলছিল।

নাচের আনন্দ ক্রমশ ঘন হয়ে উঠল। দ্রুত তালে ডারবুকো ড্রাম আর কেটজা বেজে চলেছে। মেয়েগুলো নাচের ছন্দে হাওয়ার মতো ঘুরে চলেছে। ঘূর্ণি হাওয়ার মাতন লেগেছে ওদের শরীরে। এত দ্রুত লয়ে নাচছে কি করে! বোধহয় হাসিসের মাদক প্রভাব।

সেই কালো নিগ্রো মেয়েটি এখন দর্শকের মনপ্রাণ উতল করে তুলেছে। আরবরা আর নিজেদের সংযত রাখতে পারছে না। তাদের উত্তেজনাকে নাচিয়ে শেষ স্তরে নিয়ে গেছে। ডারবুকো ড্রাম কেটজা আর বাঁশি এর সঙ্গে আশ্চর্য ভাবে সঙ্গতি রাখছে।

সমস্ত আয়োজন শেষ পর্যন্ত বীভৎস নৃত্যাচারে পারণত হল। চারদিক থেকে কাগজের নোট উড়ে আসরে গিয়ে পড়তে লাগল। আমরাও উড়িয়ে দিলাম। এটাই নিয়ম।

নিগ্রো মেয়েগুলো নাচ শেষ করে দর্শকদের একটুখানি হাসি উপহার দিয়ে ষ্টেজ থেকে সরে গেল।

বেশ নাচলে কি বলেন? .. সঙ্গী ফিসফিস করলেন।

এর থেকে ভালো আর দেখিনি। উত্তর দিলাম।

আমার উত্তর শোনবার আগেই সঙ্গী দেখলাম একজন আরবের সঙ্গে চুস্ত আরবিতে আলাপ করে যাচ্ছেন। তরুণ ভদ্রলোক। ধবধবে সাদা জোব্বায় চমৎকার মানিয়েছে তাকে। পরিচ্ছন্ন ঘন দাঁড়িতে হাত বোলাচ্ছেন। মাথায় ফেজের সঙ্গে পাগড়ি জড়ানো রয়েছে। তার হাত দুটো কোলের উপর এলিয়ে আছে। তার তীক্ষ্ণ অথচ ভারী কণ্ঠস্বর এবং কশ্চিৎ হিংস্র দৃষ্টি বেশ একটা রাজকীয় সম্ভ্রমের সৃষ্টি করেছিল।

সঙ্গী আমার দিকে ফিরে ভদ্রলোকটির সংগে পরিচয় করিয়ে দিলেন, মুস্তাফা কামাল আমেদ। উত্তর তাঞ্জিয়াসের অধিবাসী। মরক্কো যাবার পথে আলজিয়ার্সে এসেছেন।

আরব ভদ্রলোক আমার সঙ্গে ভাঙা ফরাসিতে কথা বলছিলেন যাতে আমি বুঝতে পারি। তা সত্ত্বেও খুব অল্পই আমি বুঝতে পারলাম। তবে এটা বুঝতে পারলাম কোথাও একটা যাবার ব্যবস্থা করতে চাইছেন। আরব ভদ্রলোকই সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।

মুস্তাফা আমেদ বললেন, চলুন না নতুন কিছু দেখবেন। সাধারণতঃ রউমিরা (সাদা লোক) এসব কখনো দেখতে পায় না।

আবার পথে নামলাম। কয়েক মিনিট হাঁটবার পর আমরা একটা বাজারে এসে হাজির হলাম। ঘন অন্ধকার। জিম্‌ব্রির মৃদু শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। মৃদু আলো। অনেক দোকানে ঝাপ পড়ে গেছে। মাঝে মাঝে সাদা জোব্বা পরা দু'একজন শরীরী হেঁটে যাচ্ছে।

মাসা—এল্—খির্ (শুভসন্ধ্যা)। মুস্তাফা কামাল কাকে অভিবাদন করলেন।

আলাকুম্—এস্—সালাম্। প্রত্যাভিবাদনের ফিসফিস শব্দ হল।

ম'সিয়ে আপনার টুপির উপর নজর রাখুন। ফরাসি সঙ্গী আমাকে সাবধান করলেন।

আমার টুপি! বিস্মিত হলাম।

হ্যাঁ আপনারই। হঠাৎ দেখলেন আপনার টুপিটা উড়ে যাচ্ছে। টুপিকে ধাওয়া করে হয় তো এমন জায়গায় গিয়ে হাজির হলেন যেখানে গলাকাটার দল ওৎ পেতে বসে আছে।

আমি ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাতে থাকলাম। দু'পাশের বাড়ি রাস্তার উপর ঝুঁকে পড়েছে। এমন ঘন অন্ধকারে দুর্বৃত্তের দল যে কোন সময় হামলা করতে পারে এই ভেবে একটু বুঝি আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। অথচ জানি এতে কোন ফল নেই। কিছু হলে ঠেকানো যাবেনা।

কখনো বোরখা পরা মহিলারা পাশ দিয়ে যাচ্ছে। কখনো একটি দুটি লোক। এরি মধ্যে এমন প্রাণঘাতী আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল যা আমার বুকের রক্ত হিম করে দিচ্ছিল। জানি না আগের দুজনের মনের অবস্থা কেমন!

র‍্যু বার্বারুসি। মুস্তাফা আমেদ বললেন, এর নাম—

আমি কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই প্রত্যাশা করছিলাম ঐ নামের কোন দস্যু আমাদের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। চোখের সামনে গ্যালি জাহাজের নরকংকাল আঁকা এক পতাকা চোখের সামনে পতপত করে উড়তে লাগল।

না। কপাল ভালো আমাদের। রাস্তাটা এখানে এসে পরিসর পেয়েছে। একটু পার হয়ে দেখলাম ভূমধ্যসাগরের সব বন্দর থেকে নাবিকের দল এখানে মজা লুঠতে জমেছে। কে নেই—কারা নেই? মুর, জু, ইতালীয়, মাল্টিজ, সার্ডিনিয়ান, ফরাসি, ডাচ, এমন কি জাপানি

আর আমেরিকান নাবিকেরও দল এসে মৌচাকে ভীড় জমিয়েছে।

অন্ধকার থেকে আলো। কোলহল ঘন হয়ে উঠেছে। বাজনার উচ্চকিত আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। পথের এখানে সেখানে অস্পষ্ট আলো। কোথাও কাল্লে গাধাদের ভিড়। পায়েব কাছে কুকুর এসে পড়লে দমাদম লাথি ছুঁড়ছে।

সামনে একটা মসজিদের মিনার দেখা যাচ্ছে—যেখান থেকে মুয়াজ্জিন সকাল-সন্ধ্যে আল্লার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ছুঁড়ে দেয়। তার ঠিক পাশে গীর্জাব গথিক চূড়ো দেখা যাচ্ছে। তাবপব থেকে কতো রকমের যে গৃহসমাবেশ না-দেখলে আঁচ কবা যায় না। অন্ধকাব আকাশে সিলুয়েট ছবির মতো বোবা।

বাড়ির খোলা দরজার সামনে গলায় রঙীন রুমাল জড়িয়ে আরব মেয়েরা ঘোরাফেরা কবছে। তাদেব গায়ে সিল্কেব ব্রোকেড। আর চলচলে লম্বা প্যাণ্ট। একটি বাড়িব সামনে একটি বার্বার মেয়ে আমাকে প্রায় জড়িয়ে ধরেছিল। মুস্তাফা কামাল আমেদ এমন হিংস্র ঘৃণাব সঙ্গে তাব দিকে থুতু ছুঁড়লেন যে ছিটকে সবে গেল মেয়েটা। এ ছাড়া ওরান আব কনষ্টানটাইনেব উজ্জ্বল চোখ ইহুদি মেয়েদের দেখছি। মরুস্থান থেকে প্রচুর পরিমানে নিগ্রো মেয়েদের আমদানী করা হয়েছে। আঁটসাট পোষাক পরেছে। বুক ফেটে পড়ছে। খাটো প্যাণ্টে ওর নিতম্বেব পরিধি বিস্ফারিত। যখন হাসছে সাদা দাঁতগুলো ঝকঝক করে উঠছে। আমদানী কবা সাদা মেয়েদেবও ভিড দেখছি।

বার্বারি সংগীতের তীক্ষ্ণ আওয়াজ উচ্চকিত হাসিব শব্দে মাঝে মাঝে ব্যাহত হচ্ছে। অবশেষে আমাব গন্তব্যে এসে দাঁড়ালাম। একজন কদাকার দর্শন আরব এসে দরজা খুলে দিল।

ভেতরে আসুন। গুরুগম্ভীব অভ্যর্থনা জানালো সে।

বিচিত্র এবং চিত্রিত পোষাক পরা আরবকে তার অভ্যর্থনার জন্য ধন্যবাদ জানালাম।

একটি নিগ্রো মেয়ে অনেকখানি এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত

রেখেছিল, এসো না সন্ধ্যেটা দুজনে একসঙ্গে কাটাই—

তার হাত থেকে কোন রকমে রেহাই পেয়ে দরজার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। আরব দালালটি আমাদের অন্ধকার অভ্যন্তরে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। দু'পাশের ছোট-ছোট ঘর দেখে বোঝা যায় ভেতরে লোক থাকে। পর্দা ঢাকা। ভেতরটা অন্ধকার। নিরুত্তাপ শীতল একটা আবহাওয়া যেন থাবা পেতে বসে আছে।

কিছুক্ষণ ধরে আমরা অদ্ভুত এক শব্দ ও গন্ধের জগৎ পার হয়ে এলাম। পাথরে আমাদের পায়ের শব্দে অনধিকার প্রবেশের সংকোচ। দীর্ঘকালের পুরোন বাড়ির দেওয়ালের ছোঁয়া প্রেতের স্পর্শের মতো। সামনে পিছনে তাকিয়ে কোন আলোর নিশানা পাচ্ছিলাম না। ফরাসী সঙ্গীটি বারবার তার পিস্তলে হাত রাখছিলেন। একেবারে পিছনে আমি। ভয়ে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠছিল।

হঠাৎ মুস্তাফা কামাল আমেদ নিজে থেমে গেলেন। আমাদেরও থামিয়ে দিলেন। বোধহয় ভাবলেন আর এগোন যুক্তিযুক্ত কি না। একটা নিরন্ধ্র ভয়ের শিহরণ আমাদের বুক পর্যন্ত উঠে এল। যাই হোক তিনি আবার এগোলেম। আমরাও তাকে অনুসরণ করলাম।

আরো এগিয়ে একটি দরজা পেলাম। আরব পথপ্রদর্শক সাংকেতিক শব্দ করতে দরজা খুলে গেল। আব দবজার ওপাশে যাকে দেখলাম তেমন চেহারার মানুষ আগে কখনো দেখিনি।

দীর্ঘ কংকালের ওপর চামড়ার আস্তর। দরজার রঙ আর গায়ের রঙে কোন পার্থক্য নেই। অস্বাভাবিক উজ্জ্বল ভৌতিক চোখের মৃত আলোকে পৈশাচিক ছোঁয়াচ। সে বোধহয় আমাদের দেখে একটু আশ্চর্য হল। সেই জীবন্ত প্রেতাত্মাটি আমাদের ভিতরের পথ দেখিয়ে কোথায় সরে গেল।

দরজার এপারে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বললাম, খুন হবার মতো জায়গা বটে।

ঠিকই বলেছেন মনামি। মুস্তাফা আমেদ মন্তব্য করলেন, এ

জায়গায় বোজ কত খুন খারাবি হয় তার ইয়ত্তা নেই। জানিনে ঝোঁকের মাথায় এখানে এনে ভালো করলাম কি খারাপ করলাম।

ফরাসী বন্ধুটি বিষণ্ণ হাসলেন।

আরব দালালটি তাড়া লাগিয়ে বলল, দরজা বন্ধ হয়ে গেলে আর ভেতরে ঢোকা যাবে না।

মুস্তাফা আমেদ চৌকাঠে পা রেখে আমাদেব দিকে তাকালেন।

আমি ভাবছিলাম যে রাস্তাটুকু পার হয়ে এলাম তার মধ্যে কোথাও আমাদের পাযেব শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ পাইনি। এখন এখানে অন্ধকাবাচ্ছন্ন শীতল রহস্যময় ত্রস্ত্য আবহাওযার রাজ্য। নরক বোধহয় এমনি।

আসুন মঁসিয়ে। মুস্তাফা কামাল চৌকাঠের ওপাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমরা চৌকাঠ পার হয়ে যাবাব সঙ্গে সঙ্গে পিছনের দবজা বন্ধ হয়ে গেল। আলোও নিভে গেল। তাড়াতাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে আলোকিত ঘরের সামনে হাজির হলাম।

ঘরে ঢুকেই দেখি সামনে একজন দিগঙ্গনা নাবী। অত্যন্ত নোংরা। উচ্ছৃংখল জীবনেব অবশিষ্ট অপচয় ক্লেদে পবিপূর্ণ। মুখে বিমূঢ় হাসি।

মুস্তাফা আমেদ বোধহয় এ সবে অভ্যস্ত। সাদা চোখ তাকিয়ে হাসলেন।

ঘবেব কোণে বাদ্যযন্ত্রীরা বসে আছে—সংখ্যায় অন্তত আট-দশজন হবে। তাদের পাশব মুখে মাঝে মাঝে আলো পড়ছে। দিশি ঐক্য-তানেব বিলম্বিত সুরের তালে মেহগ্নি রঙের একটি ডাকিনী ষাঁড়ের মতো একটি পুরুষের সঙ্গে নাচছে। বাজনার তালে তালে তাদের শরীর এক-একবার কাছে ঘনিয়ে এসে আবাব সবে যাচ্ছে।

বাজনার তালে অপরিচিত উন্মাদনা। পিপাসা যেন উতরোল হয়ে উঠছে। আরব দালালটি বলল, আসুন—ভেতরে আসুন। আপনারা ফরাসীরা যে ধরণের দেহ-কৌশল পছন্দ করেন এদের সে সব জানা আছে।

আরব দর্শকের দল চারপাশে এলিয়ে আছে। কেউ গল্প করছে। কেউ নার্গিলি টানছে। স্বভাবতঃই নার্গিলিতে হাসিস্ দেওয়া আছে। হাসিস্ বোধহয় চরস জাতীয় কোন বস্তু। কড়া আর কটুগন্ধ অন্ধকারে ধোঁয়ার মেঘ ঘন হয়ে উঠছে। উল্লসিত দর্শকের দল মাঝে মাঝে নাচিয়েদের দিকে পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছে।

আমরা একটা ডিভানে গিয়ে বসলাম।

চারদিকে কৌতুহলী চোখ ফেলে দেখলাম কতকগুলো অর্ধনগ্ন আরব নুবিয়ান মেয়েদের সঙ্গে ঘন হয়ে বসে আছে।

ক্ষুধিত পাষাণের হাবসি প্রহরীর মতো একটা হাবসি পরিচারক আমাদের কফি আর তামাক জোগাচ্ছে। সে দাঁড়িয়ে আছে আদেশের প্রত্যাশায়।

আমার পাশেই অন্য একটা ডিভানে একজন আরব বৃদ্ধ শুয়েছিল। তার গায় একটা কাপড় ছড়িয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। লোকটি বোধহয় অত্যন্ত নেশাগ্রস্থ হয়ে পরেছে।

মুস্তাফা তার নিজের হেক, বারনুজ, কাফতান, ফেজ এমন কি পায়ের জুতো মোজা পর্যন্ত খুলে ফেললেন। এটা বোধহয় 'রাকি' পানের ফল। হঠাৎ মুস্তাফাকে চেঁচিযে উঠতে শুনলাম, নরকে স্বর্গ নামুক—

সঙ্গে সঙ্গে একটি রক্তচক্ষু পাংশুমুখ আরব দৈত্য নিজেকে একটি নুবিয়ান মেয়ের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নাচতে সুরু করল। নাচ নয় ঠিক—বীভৎস অঙ্গভঙ্গি। পা দিয়ে জোরে জোরে বাজনার সঙ্গে তাল ফেলতে সুরু করল। প্রথমে একই ধরণের দেহবিন্যাস। খুব আস্তে তারপর ক্রমশ দ্রুত এবং দ্রুততর লয়ে।

আমার কাছে অপ্রাকৃত কিছু মনে হল। নাচের সঙ্গে ডাববুকো দ্রুত তালে বেজে উঠেছে। জিমব্রির গম্ভীর আওয়াজ এবং বেহালা জাতীয় ভাওলার বিলম্বিত কান্নার সুরে নারকীয় জীবটি অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে নাচছে।

একমুঠো কয়েন ছুঁড়ে দিলেন মুস্তাফা।

কোন সময় নাচিয়ের পা দুটো স্থির থাকতে অথচ দেহে হিল্লোলের অন্ত নেই। কখনো দেহের পেশিকে স্থির রেখে দ্রুততালে নেচে যাচ্ছে। এই সময় বাজনা যেন আনন্দছন্দে অলাতনৃত্যের ব্যঞ্জনায় ক্ষিপ্রসঙ্গী হয়ে উঠল। নর্তকের মুখের ভঙ্গী অত্যন্ত ক্রুর এবং নিষ্ঠুর। ঠোঁটের ভিতর থেকে মাম্বা সাপের ক্রুদ্ধ হিস হিস শব্দ বেরিয়ে আসছে।

এর পর যা দেখলাম তা একেবারেই আদিম এবং অরণ্য সুলভ। হঠাৎ নাচিয়েটি লাফ দিয়ে সুবিযান মেয়েটির ঘাড়ের ওপর পড়ে মাটিতে দুজনে গড়াগড়ি খেতে লাগল। এও বোধহয় নাচের অঙ্গ।

আরব দর্শকরা কর্কশকণ্ঠের উল্লাসে ফেটে পড়ল।

আমার ফরাসী বন্ধুটি জিজ্ঞেস করলেন, আর বসবেন কি?

চলুন ওঠা যাক। উত্তর দিলাম।

বন্ধু মুস্তফাকে ডেকে বিদায় নেবার কথা জানালাম। মুস্তাফা নার্গিলি টানছিলেন। নীলচে ধোঁয়ায় তার সামনেটা আবছা। বললেন, আর একটু থাকুন না। আমাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, খুব অসুবিধে হচ্ছে কি?

দু'জনেই বললাম, না।

ফরাসী ভদ্রলোক বললেন, আপনার মেহেরবানিতে আমাদের কোন তকলিফ হচ্ছে না।

তবে বসুন না। একটু গল্প করা যাক।

আমরা তিনজনে উঠে এককোণে গিয়ে বসলাম। হাবসি পরিবেশকটি সুগন্ধি কফি দিয়ে গেল।

মুস্তাফা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আলজিয়ার্স সম্পর্কে তো আপনার বেশ জানাশোনা। কি বলেন?

সত্যি বলতে কি। মুস্তাফা কফিতে চুমুক দিলেন, এমন কিছু ভালো করে জানিনে। তবে অনেক বছর ধরে যাতায়াত করছি। অবশ্য আলজিয়ার্স'ই আমার যাওয়াআসা বেশি। কিন্তু সেখানে আগে আমার লোক বেচাকেনার ব্যবসা ছিল। কিন্তু হরবকৎ শাসনব্যবস্থা

পাল্টানোর ফলে আমাকে আরো দক্ষিণে সরে যেতে হয়েছে। অনেক দক্ষিণে মানে মারাকেশেরও দক্ষিণে। সেইখানেই এখনো ব্যবসাটা কোন রকমে বেঁচে আছে।

ফরাসি বন্ধুটির দিকে তাকিয়ে মুস্তাফা বললেন, আপনি তো এখানে কিছু নতুন নয়। মুস্তাফার চোখের আলোয় কেমন একটু ইতস্তত ভাব ছিল, আমার ধারণা আপনি আমাদের ট্রেড সম্পর্কে মোটেই অজ্ঞ নন।

তা সত্যি। কিন্তু লোকের মুখে যেটুকু শোনা যায় তার চেয়ে কতোটুকু আর জানতে পেরেছি। আপনার আপত্তি না-থাকলে কিছু বলুন না আমার বন্ধুও খুব আনন্দিত হবেন।

নার্গিলির নল হাতের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে-করতে মুস্তাফা বললেন, অত্যন্ত আনন্দের সংগে আপনাদের জানাবো। তারপর পকেট হতে একতাড়া কাগজ বের করে আমাদের সামনে ধরলেন। দেখলাম উত্তেজনায় তার হাত কাঁপছে।

কি লেখা আছে এতে কে জানে। সম্ভবত আরবসুন্দরীদের নাম। দাসব্যবসা পরিচালকদের তালিকাও হতে পারে।

দেখুন। কাগজগুলো আমাদের সামনে ভালো করে তুলে ধরলেন তিনি, মারাকেসের বিখ্যাত দাসব্যবসায়ীদের নাম এতে লেখা আছে। আপনারা অবশ্যই জানেন যে আগেকার দিনে মারাকেশে বার্বারি জলদস্যুদের আমলে খৃষ্টান মেয়েদের ধরে এনে নীলামে চড়ানো হত।

অবশ্যই জানি। ফরাসি বন্ধু মন্তব্য করলেন, অনেক কার্সেশিয়ান সুন্দরীদের প্রকাশ্য কোন সভাস্থানে পিলারের সঙ্গে বেঁধে তাদের সৌন্দর্য দেখান হত!

কতো ভালো ব্যবস্থা ছিল বলুন তো? মুস্তাফা খেদোক্তি করলেন, হায়রে সেসব দিন কবে অতীত হয়ে গেছে। এখন যদি কেনাবেচা করতে যাই কতো সাবধানে এগুতে হবে। যে সব জায়গায় বেচাকেনা করবো অত্যন্ত গোপনে রাখতে হবে তার নাম। গলার স্বর নামিয়ে

এনে মুস্তাফা কামাল বললেন, আল্লা রসুল আল্লা তাই দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসাটা এখনো টিকে আছে। তাইতো বেঁচেবর্ত্তে আছি।

কত ঝকমারি এই ব্যবসা চালাতে গিয়ে। নিজেদের পুলিশ রাখতে হয়। অসুবিধা বুঝলে তারা আমাদের আগে সাবধান করে দেয়। দরকার মতো সরকারী ফৌজের সঙ্গে লড়াইও করে।

আগে কেমন করে দাসব্যবসা চলত সে বিষয় যদি কিছু বলেন। আমি মুস্তাফার দিকে তাকালাম।

নার্গিলি মুখে নিয়ে মুস্তাফা সুরু করলেন, অতীতে মুররা গাঁয়েব অভ্যন্তরে খোঁজ খবর নেবার জন্যে তাদের লোক রাখত। সেই সব লোকেরা যখনই খবর পেত কোন ধনীর হারেম নিলামে চড়ানো হবে অমনি তাবা কেন্দ্রে খবর পাঠাত। আব সেই খবর পেয়ে মুররা দল বেঁধে রওনা হত।

সাধারণত খোলা জায়গায় বাজার বসত।

গাঁয়ের খোলা পথে গম্ভীর চালে হাঁটতে দেখা যেত মুব ব্যবসায়ীদের। তারা দল বেধে আসত। সঙ্গে থাকত অশ্ব আর অশ্বতরের দল।

নীলামদার প্রথমে গলা চড়িযে খোদাতাল্লার গুণগরিমা ব্যাখ্যান করবে। তারপর নতজানু হযে বাবংবার তার কাছে প্রার্থনা জানাবে। অবশেষে মাবাকেশ আব সিদি-এল-আব্বাস-এর তাবৎ ফকিরের কাছে প্রার্থনা জানিযে মাল নীলামে তুলবে।

ক্রীতদাসীদের অনুক্রমিক সাজিয়ে ক্রেতাদের সামনে ঘুরিয়ে দেখান হবে। নিলামদার তখন চেঁচাবে ঃ সুন্দরী যুবতীরা মুখের পর্দা তোল— যাদেব বয়স অল্প—তখনো আস্বাদন যোগ্য নয়—এই ধরুন, চার কি পাঁচ বছর বয়েস তাদের ডাক খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়।

এত অল্প বয়েসি মেয়েদেব কি কাজে লাগানো হয়? আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি।

দু'বছর পর্যন্ত তারা সঙ্গিনী হিসেবেই বিক্রি হত। বারো বছর

হলেই হারেমের কর্তার কাছে নিষিদ্ধ ফলের পশরা সাজিয়ে হাজির হওয়ার রেওয়াজ। এদের গড় দাম ছিল ষাট ডলার। একটু দম নিলেন মুস্তাফা। তারপর আবার স্থরু করলেন, রউমিদের জন্তে দাসব্যবসা চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। অবশ্য এখনো যা চলে তা ধরার মধ্যে নয়। আগে নীলামদারদের কাছ থেকে নিশ্চয়তা পেয়ে ক্রেতারা ক্রীতদাসী কিনত যদি কথিত গুণের কোন সন্ধান পাওয়া না যেত তবে ক্রীতদাসীকে ফিরিয়ে দেওয়া হত।

স্থন্দরী যুবতীদের ডাক সব সময় চড়া দাম। যদি তার বুকের গড়ন হত উড্ আপেলের মতো আর লাবণ্যে হত শুক্লা একাদশির চাঁদ তবে তো কথা নেই। নীলামের হাঁকডাকে বাজার সরগরম হয়ে উঠত। স্থন্দরী না-হলে আঁটসাট গড়নের মেয়েদের দিকেও ব্যবসায়ীদের চিরকালের নজর। এদের দিয়ে সন্তান প্রসব করানো যেতে পারে আর তার ফলে লাভের অংকও হু-হু করে বাড়ে। বুড়ি হলে সত্যি বলতে কি কোন দাম থাকে না। কতো রকমের মেয়েরা এসে এক জায়গায় জমে। কেউ খুসিতে ঝকমক করছে, কেউ উদাসীন। কারো নির্লিপ্ত চোখের তারায় বিষাদের ব্যঞ্জনা। তবে দাসব্যবসায়ীরা শক্ত-সামর্থ্য গড়নের মেয়েদের দিকে প্রধানত নজর দেয়। তাদের চেহারা না-থাকলেও যৌবন থাকে। আর যৌবন থাকলেই নতুন করে বারবার ফসল তোলা যায়।

আর মুস্তাফা দাসব্যবসা সম্বন্ধে এমনভাবে আলোচনা করে চলছেন যেন মাংসের দর ওঠা-নামা কি মরুস্থানের আবহাওয়া পাল্টানোর সাদাসিদে গল্প করছেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও অভিলাষে বিশ্বাসই এদের জীবন-দর্শন। এঁর কাছে খুন-জখম, বলাৎকার, নৃসংশতা এসবই অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। কেননা আল্লা পরমদয়ালু এবং পরম কারুণিক। মানুষের দোষ-গুণ সব কিছুই তিনি ক্ষমা করেন। মানুষের নিজের ব্যাপারে মানুষের কোন হাত নেই। ফলে এই সব অশিক্ষিত ও আচ্ছন্ন মানুষেরা নির্বিবাদে খারাপ কাজ করে যায়।

তবে ব্যাপারটা অত্যন্ত লজ্জাজনক। ফরাসী বন্ধু মন্তব্য করলেন।

কেন মঁসিয়ে ? মুস্তাফা সাগ্রহে ফরাসি ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন আমরা ক্রীতদাসদের সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করিনে। অনেক পরিবারের লোকেরা নিজেদের খাদ্য জোগাতে না পারলেও ক্রীতদাসদের সময়মত খাদ্য জুগিয়ে যায়।

দুর্ভিক্ষ হোক আর যুদ্ধ হোক ওদের বাঁধা বরাদ্দ ওরা পায়।

পয়গম্বর বলেছেন, যে ক্রীতদাসের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করে স্বর্গের দ্বার তার কাছে রুদ্ধ। তুমি যে বস্ত্র পরিধান করো ক্রীতদাসকে সেই কাপড় দেবে। যে খাদ্যে তুমি তৃপ্তি লাভ করো সেই খাদ্য তাদের দেবে। যদি দেখ তারা অবাধ্য তাদের বিক্রি করে দাও—অন্যায় অত্যাচার করো না, তারাও তোমার মতো ঈশ্বরের সৃষ্টি।

মঁসিয়ে নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন এর চেয়ে সহৃদয় বাণী আর উচ্চারিত হয় নি। মুস্তাফা সামনে রাখা পাত্র থেকে মদজাতীয় তরল পদার্থ পান করলেন।

আসর তখন পুরোদমে চলছে।

মুস্তাফা অন্যমনস্ক হয়ে সেদিকে চেয়ে রইলেন ? অনেকক্ষণ দু'পক্ষের স্তব্ধতার মধ্যে কেটে গেল।

আবার দেখা হবে। এই বিদায় বাণী জানিয়ে উঠে পড়লাম। মুস্তাফা আমাদের একেবারে সদর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

মাসা-এল-খির। মুস্তাফা উচ্চারণ করলেন।

আলেকুম-এস্-সালাম। আমরা উত্তর দিলাম।

কয়েকদিন পরে র‍্যু দ্য বার্বারোসিতে কাউন্টেস—হ্যাঁ, কাউন্টেস কি যেন নামটা কাউন্টেস বার্দো তার ম্যানসনে গিয়ে হাজির। আলজিয়ার্সে কিন্তু সবাই তাঁকে কাউন্টেস বলেই জানে। কোথাকার কাউন্টেস সে খবরটুকুতে লোকের প্রয়োজন নেই। মহিলাটির রাজকীয় চালচলনের জন্যেই এই নামে লোক-প্রসিদ্ধি।

আলজিয়ার্সের পথে প্লেনে ওর সঙ্গে আলাপ। নেমন্তন্ন করে-

ছিলেন। অকৃত্রিম সৌহার্দের পরিচয় ছিল সেই আহ্বানে। সাড়া না দিয়ে পারিনি। আলজিয়ার্সের কাজ চুকিয়ে রওনা হবার আগে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

কাউন্টেস এমন একটি চরিত্র যা বাস্তবে ফরাসি দেশ আর উপন্যাস ফ্লবার্ট কি বালজাক সৃষ্ট চরিত্র ছাড়া অন্য কোথাও হদিশ মেলে না। পরিণত বয়স। হালকা সোনালি চুল। ওরই মধ্যে একটু যেন পলিত আকাশের ছায়া। স্মিত মুখে উজ্জ্বল দীপ্তির সাহচর্য।

অনবদ্য ভঙ্গীতে বসে অনবদ্য ফরাসিতে গল্প করছিলেন। হাতের আঙুলে ডুমুরের মতো বাদামি-লালচে পাথরটায় আলো পড়ে ঝিকমিক করছে। আবছা সোনালি রঙের সোফায় তাকে অনেকটা সম্রাজ্ঞীর মতো মনে হচ্ছিল।

দেহব্যবসার ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য সাফল্য পেয়েছেন। তিনটে বাড়ির ছত্রিশটা ঘরে তার ব্যবসায়ের সাম্রাজ্য। তিন বছর কারাবাস করে এই সবে ফিরেছেন।

ঘরের নির্জন কোণে ফিলিপাইন দ্বীপের রঙীন টিয়া। মিষ্টি শিস্ দিচ্ছে। আমি মগ্ন।

স্মৃতি-বিস্মৃতির বিচিত্র রোমন্থন কাউন্টেসের মুখে।

আলজিয়ার্সে কাউন্টেস এখন একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা। যে কোন ধর্মসভায় তিনি যোগদান করেন। প্রয়োজনে দরাজ হাতে সাহায্যও করেন। তিনি যে-ই হন আর যা-ই করুন তাতে আমার মনোযোগ ছিল না।

এই অনাবৃত মুহূর্তে তার গোপন কাহিনীর যে মঞ্জুষা খুলে ধরেছিলেন তাতেই আমার চিত্তের বিমোহ ছিল বেশি।

উন্মেষিত যৌবনে কতোকাল নিঃসহ হয়ে থেকেছেন অন্য একটি হৃদয়ের অন্বেষণে। অথচ অবয়ব বসন্তকুসুমের মঞ্জরীতে রক্তাক্ত। দিশেহারা আনন্দে উৎভ্রান্ত কুরঙ্গীর মতো তিনি সচকিত। আবার অবস্থাও এমন নয় যে যৌবনে নিবিড় হয়ে থাকেন। সেই বিহ্বল

অবস্থার এক হোটেলের কক্ষ পরিচারিকার কাজ নিতে হল। যৌবনের অসামান্য স্বপ্নের নীচে সামান্য সেই কাজটুকু ঢেকে রেখেছিলেন।

সেই খানে প্রথম দেখা। প্রথম পরিচয়। প্রথম প্রণয়।

পরিণয় অবশ্য দূরের কথা। স্মৃতির সেই সৌরভটুকু জুনের প্রথম গোলাপ।

ছেলেটি কি কাজ করত কে জানে। কখনো বলতো মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ, কখনো বলত য়্যুনিভার্সিটির ছাত্র। কাউন্টেসের কাছে সে সবের মূল্য ছিল না। তার একজন দোসর দরকার যার হাতে হৃদয়ের ভার তুলে দিতে পারে। তা ছাড়া ছেলেটির এমন মেয়েলি চার্ম ছিল বিশ-বাইশ বয়সের মেয়ের মনের সাম্রাজ্যে জুলিয়াস সিজার হবার পক্ষে যথেষ্ট।

স্বপনে দোঁহে মগ্ন হল। ছেলেটাকে প্রায়ই হোটেলে দেখা যেতে লাগল। আর মেয়েটিও প্রতিবারে তার কক্ষের পরিচারিকা হতে লাগল। কাউন্টেসের চোখে তখন ঘর বাঁধার স্বপ্ন। ছেলেটি বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিল। তারপর কয়েকটা দিন যেন গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন কাউন্টেস। টিমবাক্টুর পুরু ঠোঁটের দাঁঘল-চেহারার নিগ্রোমেয়ে আমার জন্যে একপ্লেট সোফ্লা নিয়ে এল। সঙ্গে কফির পেয়ালা।

সোফ্লা উপাদেয় খাদ্য বিশেষ। ডিমের সাদা অংশ, চকোলেট, চীজ আর ভ্যানিলা দিয়ে তৈরী।

আমাকে খাবার অবসর দিয়ে কাউন্টেস সিগারেট ধরালেন। গল্পটা এইখানে থেমে গেছিল। আমি মুখ তুলে তার দিকে তাকাতে তিনি আবার খেই ধরলেন।

একদিন ছেলেটি কাউন্টেসকে আগামী দিনের ক্ষেতভরা ফসলের মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে উধাও হল। জেগে উঠে কাউন্টেস দেখলেন মা হতে চলেছেন।

হোটেল মালিকের স্ত্রী অত্যান্ত সম্ভ্রান্ত মহিলা ছিলেন। বিন্দুমাত্র সামাজিক ক্রুটি তাঁর বরদাস্ত হত না। তা ছাড়া তাঁর নিজের সন্দেহ ছিল অপদার্থ স্বামী বোধহয় কাউন্টেসের সংগে রাত কাটায়। অনেক-দিন থেকে সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন। এবার সুযোগ পেয়ে হোটেল থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

একটি সৎ মেয়েব বিপন্ন হবার ইতিহাস এইভাবে সুরু। এ টি মেয়ে হল শেষে। মেয়েকে প্রতিপালনের উপায় না দেখে কাউন্টেস মেয়েকে অনাথ আশ্রমে রেখে আলজিয়ার্স যাত্রা করেন। তারপর দীর্ঘদিন কঠিন জীবন সংঘাতের পর দেহপশারিণী থেকে দেহ ব্যবসায়েব পরিচালিকার পদে উত্তীর্ণ হলেন —কুড়ি বছর আগে এসব ঘটে গেছে। কাউন্টেস যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠলেন, অথচ মনে হয় এই তো সেদিনকার কথা।

আপনার মেয়েটি এখন কোথায়? একটু যেন আগ্রহ বোধকরি।

প্যারিসেই থাকতো। তার শিক্ষার জন্য পয়সা খরচের কোন কৃপণতাই করিনি। পয়সা হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে অনাথ আশ্রম থেকে ছাড়িয়ে প্যারিসের সেরা অভিজাত স্কুলে দিয়েছিলাম। বিষণ্ণ হাসলেন কাউন্টেস, কপাল আমার—পাপের পয়সা বোধহয় স্বর্গের কাজে লাগে না।

বছর তিনেক আগে ব্যবসার প্রয়োজনে তিনটে মেয়ের দরকার ছিল। কোথায় লিখব ভেবে প্যারিসেই এজেন্টের কাছে চিঠি লিখলাম। ওরা চিঠির উত্তর দিল 'বাল্টিমোর মুনে' মেয়ে তিনটে পাঠাচ্ছে। চিঠি পেয়ে আশ্বস্ত হলাম। কেননা এত তাড়াতাড়ি এ ব্যবসায়ের মেয়ে পাওয়া মুস্কিল

এদিকে ক'দিন ধরে মনটা একটু খারাপ ছিল। প্যারিসে মেয়ের কাছে টাকা পাঠিয়েছি সে টাকা ফিরে এসেছে। কেন ফিরে এল কিছুই বুঝতে পারলাম না।

ভাবলাম মেয়ে বোধহয় নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে। তাই

মায়ের এই পাপের পয়সা ছোঁবে না। হাসলাম মনে মনে। কার জন্যে সোনার স্তূপ জমা করছি।

নতুন একটা বাড়িতে ব্যবসা সম্প্রসারিত করবার কাজে কয়েকদিন ডুবে থাকতে হল। মেয়ের ভাবনা মনের কোণে নিস্তেজ হয়ে রইল। খুব খাটতে হল কয়েকদিন। ক্লান্ত হয়ে ফ্লাটে এসে আশ্রয় নিলাম।

দুপুরের দিকে তৃষ্ণার্তদের জল দিচ্ছিলাম—এমন সময় মেয়ে তিনটি হাজির। একটিকে দেখে চোখ আর ফেরে না। অপলক হয়ে রইলাম। এ যেন আমার যৌবনের প্রতিবিম্ব !

সন্দেহ হল মনে। এজেণ্টের প্রতিনিধিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, এই মেয়েটিকে কোথা থেকে আনা হয়েছে।

খাস্ প্যারিস থেকে। স্কুল থেকে পালিয়ে মোমার্ত-এর একটা ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। বোধহয় ব্যবসা পাতবে বলে এসেছিল।
বুঝতে পারলাম আমারই মেয়ে। এমনি বোধহয় হয়। লোকটাকে ব্যাপারটা গোপন রাখতে বললাম। সুযোগ বুঝে মোটা হেঁকে বসল।

বলল, এ সব ব্যাপার চাপা রাখতে গেলে কিছু ছাড়তে হয়।

তার মানে ?

আমার এমন কিছু দায় পড়েনি বিনা পয়সায় এমন মজাদার গল্প—

কত চাই তোমার ?

লোকটা হাতের চাবির গোছা নাচাতে নাচাতে বলল, হাজার দশেক ফ্রাঙ্ক দিলেই হবে—চোখের কোণাটা একটু চেপে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ঠোঁট ওলটালো লোকটি।

কম হবে না ?

আমার দোকানে একদর। লোকটা মুখ ফিরিয়ে দরজা পর্যন্ত গেছিল। পিঠে গুলি লেগে মুখ থুবড়ে দরজার ওপরেই ভেঙ্গে পড়ল।

কোর্টে একটা কথাও বলিনি। তিন বছরের জেল হয়ে গেল আমার। মাসখানেক হল ফিরেছি। এসেই একবার প্যারিসে গেছিলাম মেয়ের ব্যবস্থা করতে। তারপর তো একই সঙ্গে আলজিয়ার্সে ফিরলাম।

কাউণ্টেসের ব্যবসাটি বড় ধরণের—ছাড়াইবাছাই করা সুন্দরীদের তার ব্যবসার প্রয়োজনে জোগাড় করা হয়েছে। ফরাসী, স্পেনীয়, গ্রীক, জু সব জাতের মেয়েরাই আছে। আর সবাই শ্বেতাঙ্গিনী।

আমার মনে হয় এখানকার দিশি কোয়ার্টারগুলো আপনি দেখেছেন, কাউণ্টেস একবার থেমে নিলেন, অত্যন্ত সহৃদয় এখানকার কর্তৃপক্ষ। তাবা আমার ব্যবসার প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। কর্তৃপক্ষ আমাকে সাহায্য করেন, কারণ তারা জানেন তাঁদের উদ্দেশ্যের অনেকখানি আমাকে দিয়ে সফল হবে। উদ্দেশ্য তো আমাদের এক। আর সেটা শোষণ। কাজেই এখানে ব্যবসা চালানোর কোন ঝুঁকি নেই। অবশ্য প্রচলিত নিয়ম-কানুন আমাকে মেনে চলতে হয়।

মেয়েবা আসে এখানে নিজেব দায়িত্বে। যতোদিন না ভালো প্রাকৃটিস জমাতে পাবে ততোদিন নজব রাখতে হয়। একটু সপ্রতিভ হলে মাব নেই।

আমি কাউন্টেসের মুখের দিকে তাকালাম।

তিনি জোর দিয়েই বললেন, মেয়েদের আমি এমন খাটাইনে যাতে তাবা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। এখানে ওদের নিজেদের সমিতি আছে। ওরা ছবি আঁকে। সাহিত্যসভা কবে। কখনো ছুটিব দিনে পিকনিক কবে। ছুটি অবশ্য সপ্তাহে একদিন। বঝতেই পারছেন শনি-রবি বাদ দিয়ে।

সব মেয়েকেই নিজের নাম বেজিস্ট্রি কবতে হয় আর সপ্তাহে একবার বাধ্যতামূলকভাবে ডাক্তারি পরীক্ষার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। আমি একুশ বছবের নীচে কাউকে জায়গা দিই না। এখানে গলা নামিয়ে আনলেন কাউণ্টেস, আপনাকে বলেই বলছি—দুটি মেয়ে এখানে আছে একুশ বছরের কম। দালালরা যখন তাদের জোগাড় করে এনেছিল কাগজে কলমে একুশের বেশিই ছিল। এমন মুসকিল যে রাখতেও পারিনে—ফিরিয়ে দিতেও পারিনে। একগাদা খরচের ভোগান্তি।

প্রত্যেক মেয়ের কাছে একটা রেড্ কার্ড থাকে। এটা রেজিস্ট্রেশন

ও ডাক্তারী পরীক্ষার প্রমাণ। যদি কর্তৃপক্ষ কখনো দেখতে পান কম বয়সের মেয়ের কাছে লাল কার্ড আছে তাকে তখনি পুলিশ ষ্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তাকে গ্রীন কার্ড দেওয়া হয় আর ডাক্তারী পরীক্ষার তারিখ লিখে রাখা হয়।

যে সব মেয়ে আমার তত্ত্বাবধানে থাকে তারা সবাই সন্তুষ্ট ও সুখী। যেখানো পাঠাবো সেইখানেই যাবে। আর এক জায়গায় থাকতে ওদেরও ভালো লাগে না। বেশি দিন এক জায়গায় থাকলে ওরা ষ্টেল হয়ে যায়। চার্মও থাকে না।

আমার মার্সেলিস ছাড়া আর সব জায়গায় ব্যবসা আছে। যেখানে চাহিদা বেশি সেখানে পাঠাই।

আরব মেয়েরা এখানে ভালো ব্যবসা পায় না। শ্বেতাঙ্গরা কেউ-ই তাদের চায় না। আবাব ফ্রান্সে এদের চাহিদা খুব বেশি।

সুজেতের কথাই ধরুন না, মার্সেলিস থেকে ওকে এখানে আনি। এ ব্যবসার যা মূলধন সবই ওর আছে। প্রথমে সুবিধে করতে পারেনি। এখন রেট চারশ' ফ্রাঙ্ক। আপনি কি ওকে দেখবেন ম'সিয়ে, ডাকবো?

ধন্যবাদ। আর একদিন এসে ওর ব্যাঙ্কের হিসেবটা বাড়িয়ে দিয়ে যাবো। আমি সঙ্কোচের সঙ্গে উত্তর দিলাম।

আমার সঙ্গে প্যারিস এভির্গ বোর্দে মার্সেলিসের যোগাযোগ আছে। মেয়েরা এক জায়গায় যখন বাসি এবং বিবর্ণ হয়ে যায়—হাওয়া ও জায়গা পালটানোর ফলে দেখেছি আবাব ঠিক হয়ে গেছে। যতক্ষণ না কাউন্টেসের কাছ থেকে বিদায় নিলাম তিনি একটানা বকবক করে চললেন।

ওঠার সময় কাউন্টেস বললেন, আপনার সময় মতো যে কোনদিন আসুন।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। সেদিন কাউন্টেস বোধহয় আমার কাছে অন্য কিছু প্রত্যাশা করে থাকবেন।

বাজার পার হয়ে হোটেলের দিক চললাম। আমার হোটেলটির

অবস্থান খুব মনোরম। চারদিকে খোলামেলা। উন্নত পামের মেখলায় মনোহর।

রু্য ক্যাটারগিলে এসে পৌঁছলাম।

আলজিয়াসের ব্রথেলগুলো সবই এই রাস্তার উপরে। দেহ-পিপাসুদের তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে তাদের দরজা সব সময়ই খোলা।

আমার পাশ দিয়ে সোনার মস্কট পরা মেয়েরা যাচ্ছে। তাদের শিথিল কথার সংলাপ অনেকটা যেন অলস গ্যানের গুঞ্জনের মত।

কখনো হঠাৎ ফিরে আমার দিকে ইসারা করছে। দেখলেই চেনা যায়। এখানে খোলাখুলি ব্যবসা চলছে। খদ্দের কেবল আরবদেশীয়রা। দু'পাশের ব্রথেলের সারি পার হয়ে একটা বাড়ির দরজার সামনে থামলাম। একদল লোক সেখানে জমায়েত হয়ে গুলজার করছে। দালালরা তাদের ঘিরে দরদাম চালাচ্ছে।

ব্রথেলের ভেতর ঢুকতে দশ ফ্রাঙ্ক লাগবে। এরপর বিভিন্ন রেটের তারতম্য।

খোদাতাল্লার রাজ্য। কি বিচিত্র!

কাছেই মসজিদ। সেখানে একটাও লোক নেই। মসজিদের মিনারে মুয়াজ্জিন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

আরবের আকাশে সেই সূর্যাস্ত। রক্তাক্ত মস্কোটের মধ্যে আলো দানা জমে রয়েছে।

গতকাল কি ঈশ্বরের মৃত্যু হয়েছে! তা'হলে কেউ তার মসজিদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নেই কেন? কেউ তার উদ্দেশ্যে উচ্চারিত প্রার্থনায় কান দিচ্ছে না কেন! যারা এখানে আছে তারা সবাই ব্রথেলের সামনে ভীড় করেছে। দুটো লোক ব্রথেলের কোন ঘরে যাবে তাই নিয়ে কুৎসিত তর্ক করছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মেয়েরা তাই শুনে নির্লজ্জ হাসছে। মসজিদের মিনার থেকে সূর্যের সোনালী আলোর মতো মুয়াজ্জিনের কণ্ঠও বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে:

আল্লাই আল্লা। রসুল আল্লা। মোহাম্মদ তার প্রেরিত পুরুষ।

পৃথিবীর সমস্ত শক্তির ঐশ্বর্য ক্ষমতার দম্ভ তার কাছে মিথ্যে।

এ্যায় খোদা, তুমি আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করো। তোমার অন্তরের করুণা আমাদের জন্য উন্মোচিত কর। আল্লা—র—সু—ল—আ—ল্লা—

সেই খাঁটি-মুসলমান দুজন গণিকালয়ে ঢুকে গেল। যারা ভীড় করে আছে তারা সবাই যাবে। কেননা ঈশ্বর সব পাপ ক্ষমা করেন।

আকাশের দিকে তাকালাম। এখনো সন্ধ্যে হয়নি। তারা উঠেছে। এক। দুই। তিন।

অন্ধকার। অপরিচিত অন্ধকার।

কোন দিকে—কোন পথে? আমার গাইডকে জিজ্ঞাসা করলাম

সে তার অপরিচিত চোখ দুটো আমার দিকে অদ্ভুতভাবে হেলিয়ে বলল, মসিয়ে এমন জায়গায় যাচ্ছি যেখানে আপনি এখানকার সেরা নাচিয়েদের দেখতে পাবেন। সারা তানজিয়ার্সের কোথাও এমনটি নেই।

জায়গাটার নাম?

একটা নয়, দুটো জায়গা। বারা মার্সান। ক্যাসা ব্রেহা।

আলজিয়ার্স ছেড়ে তানজিয়ার্সের পথে নেমেছি। যেখান দিয়ে যাচ্ছি সে জায়গায় পৃথিবীর অদ্ভুত একটা জাত বাস করে। কতো রকম রক্তের যে মিশ্রণ তাদের মধ্যে ঘটেছে মনে রাখা দায়। ওদের মধ্যে এমন কেউও আছে যাদের রক্তে কোন মিশ্রণ নেই। আবার এমন মানুষও আছে—আর তাদের সংখ্যাই বেশি যাদের রক্তে বিচিত্র মিশ্রণের কল্লোল। কে নেই সেখানে! দুর্দ্ধর্ষ আরব-এসিরিয়, প্রাচীন ফিনিসিয়-গ্রীক-ক্যানানাইট, হাসত্রিস ফরাসী মালটিজ স্পেনিশ। সবার উপরে ইহুদি। কতো রকমের রীতি আর রুচি, আচার আর বিচার, স্মৃতি আর বিস্মৃতি।

পৃথিবীর নানা দেশের যে সব দুঃসাহসী বণিকের দল পেরিপ্লাসের আমল থেকে সমুদ্রের নীলে জাহাজ ভাসিয়েছে তাদের অনেকেই দেশে আর ফিরে যেতে পারেনি। এখানে ঘর বেঁধেছে। বাসর সাজিয়েছে।

সেই ধারা কাল থেকে কালে যুগ থেকে যুগে বয়ে চলেছে।

আসল মানুষগুলো কোথায় হারিয়ে গেছে। নতুন মুখ নতুন ফুল হয়ে ফুটেছে এখানকার মাটিতে।

আমরা আসলে তানজিয়াসে'র জু-দের মহল্লা দিয়ে হাঁটছিলাম। আমার আরবি গাইড সামনে চলেছে। আমি পিছনে। বেচারা যতো জোরে চলতে চাইছে আমি ঠিক ততো আস্তে। ওর চোখ বারবার দেখা এই সব জিনিষের মধ্যে কোন নতুনত্ব খুঁজে পায় না।

ওই আমাকে বলল, জায়গাটার নাম মেলাহ। এখানে শুধু ইহুদিরা, মুখ বিকৃত করে একবার থুথু ফেলল সে, থাকে!

আসল তানজিযার সহরটা আমরা ছাড়িয়ে এসেছি। এটা সহর থেকে একটু দূরে। খাস তানজিয়ারে আরবরাই থাকে।

আর মেলাহে থাকে জু। এখানে কয়েক হাজার বছর ধরে আছে। আর আরবদের হাতে কতোবার যে অত্যাচারিত হয়েছে তার ঠিক নেই। অথচ সে অত্যাচারের কোন প্রতিবাদ করেনি। বারবার মূররা এসে আঘাত হেনেছে। অত্যাচার অপমান অন্যায়ের স্রোত বইয়ে দিয়েছে। ইহুদিরা নীরবে সে অত্যাচার সহ্য করে গেছে।

আশ্চর্য লাগে একই মাটিতে জন্মে একদল মানুষ বেপরোয়া দুঃসাহসের উত্তেজনায় পৃথিবীতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে—আর একদল পোষমানা জীবনের নিরীহ অভিশাপ বহন করে ক্লান্ত যুগ পার হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য পার্থক্য একটু আছে। সেটুকু ধর্মে। একদল মুসলমান, অন্যরা ওল্ড টেষ্টামেন্টের অনুগত।

মূরদের নগরের মধ্যে ইহুদিদের এই নগর কি করে টিঁকে আছে ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। এখানকার পারিবারিক জীবন এবং প্রচলিত নিয়ম নীতিতে অনেক পরিবর্তন এসে গেছে।

এখানকার পুরুষরা সাধারণ নিয়ম অনুসারে মাথা কামিয়ে ফেলে কিংবা কখনো কানের কাছে একগোছা চুল রাখে। চীনেদের মতো মাথার চাঁদির ওপর চুল রাখার নিয়মও এদের মধ্যে চালু আছে।

কিন্তু এরা যখন ন্যাড়া মাথায় ফেজ পরে কালো কুচকুচে দাড়িতে মোম মেজে রাস্তায় বের হয় দেখতে অদ্ভুত লাগে। এইতো চোখের সামনে দেখছি কালো-সিল্কের কাফতান পরা মাথায় ফেজ গলায় রঙীন রুমাল লাগিয়ে যাচ্ছে পথচারি ইহুদীদের দল।

মেয়েগুলো আশ্চর্য সুন্দর। এরা মাথার চুল রুমাল দিয়ে বেঁধে রাখে। চোখে সেই সমুদ্রের নীল। মাথার চুলেব রেশমি বিশৃংখল মরুভূমির সোনালি অন্ধকার! আব শরীর যেন ঝিনুকে মোড়া মুক্তা।

রাস্তাঘাটে সেই মূরীয় শৈলি। সরু গলি। আঁকাবাঁকা। পাশে দোতলা কি তিনতলা বাড়ি। এই সব বাড়িতে যারা থাকে অসাধারণ রকমের দরিদ্র তারা। আব দারিদ্রের জন্যেই দেহকে তাদের পণ্য করতে হয়।

এদেব মধ্যে এক রকমের মেয়ে আছে নাচই তাদের পেশা। এদের বলে 'স্কীচাস্'। তানজিয়ারের এই স্কীচাসদেব সংগে আমেরিকান নাইট ক্লাবেব 'সুইটি'দের কোন পার্থক্য নেই।

এরি মাঝখানে একবার ইতিহাসের দিকে ফিরে যেতে চাই। কেন না যে মেয়েটা দিয়ে আমার তানজিয়ারের এই এলাকার পাপের পরিচয় তার নাম 'কহেনা'। আর এই কহেনা নামটা সে নিয়েছিল সাহারার রাণী কহেনার নাম থেকে—এই এলাকার বার্বার উপজাতির সেই রাণীর ইতিহাস একেবাবে ফেলনা নয়।

সাহারা রাণী কহেনা। মরুভূমির পথ চলতি পথিক বার্বারের কাছে এই নাম ওয়েসিসের শীতল জলের শান্তি দেয়। তাদের দীর্ঘদিনের অপরিচয় ও অগৌরবেব ইতিহাসে একবাব বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠে কবে নিভে গেছে তবু সেই স্মৃতি তাদের স্থবির সময়ে রোমন্থনের তৃপ্তি আনে।

সেই অন্ধকার যুগে যেখানে মেয়েরা মরুভূমির উটের মত সম্পত্তি বলে বিবেচিত হত সেখানে নিজেকে দলের নেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সোজা নয। বিচ্ছিন্ন বার্বার উপজাতিকে এক স্বপ্নে বেঁধে স্বাধীন রাজ্যের

প্রতিষ্ঠা করল কহেনা। আর এটা সম্ভব হয়েছিল তার বেপরোয়া সাহস আর অভিযানের নেশার সঙ্গে দেশপ্রেম মিলে।

কিন্তু, আশ্চর্য আশ্চর্য আশ্চর্য এবং সব আশ্চর্যকে ছাড়িয়ে যে আশ্চর্য সেই আশ্চর্য সুন্দরী রাণী—যার সাহস আর দেশপ্রেমের সঙ্গে সৌন্দর্যের খ্যাতিও ছিল অসাধারণ। পুরুষদের কামনায় জোয়ার এল। উপজাতি সর্দারদের হাত এগিয়ে এল তার হাত হাতে তুলে নেবার জন্যে। সকলকেই তিনি অবহেলা করলেন। বিশেষ করে বার্বারদের এক দুর্ধর্ষ উপজাতির সর্দারকে, শাঠ্য ও লাম্পট্যে যাব উল্লেখযোগ্য প্রসিদ্ধি। যে যে মেয়েকে তার ভালো লাগত তাদের কারো রেহাই ছিল না।

অবহেলা দিয়ে বেহাই ছিল না কহেনার। মরুভূমির সেই মাতাল রক্ত যার কামনায় জোয়ার এসেছে সে মানবে কেন। অহরহ সে তার উদ্দেশ্য নিয়ে ফিবতে লাগল। আর বাববাব সেই একই অবহেলা আব ঘৃণা।

এমনি করেই দিন কাটছিল। কিন্তু এতে কহেনাব মনে শান্তি ছিল না। তার চোখ যে আবো অনেক দূরে। বার্বাবদেব প্রতিষ্ঠা দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে এই নীচাশয় কামার্ত।

একদিন কহেনাব কাছ থেকে দূত গেল সেই সর্দাবেব কাছে—কহেনা তার প্রার্থনা মঞ্জুব কবেছে। "পত্র দিল পাঠান বে সব খাঁবে কেতন হতে ভুনাগ রাজার রাণী—"

বলো কি? চেঁচিয়ে উঠল সেই সর্দাব।

হু'বার নত হয়ে দূত বলল, এই নিন কহেনার চিঠি—

এব মধ্যে কোন ষড়যন্ত্র নেই তো? ভ্রূকুটি করে তাকাল সেই সর্দার।

ষড়যন্ত্র! লোকটা জিভ কেটে বলল, একথা আপনি মনে আনলেন কি করে! কহেনা শুধু তার পানিপ্রার্থীদের যাচাই করে দেখছিলেন।

দীর্ঘদিন ধরে একমাত্র আপনিই শুধু আপনার প্রত্যাশা থেকে সরে যান নি। খাঁটি প্রেমের এ-ই নিদর্শন। বারবার তিনি আপনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, ঘৃণা ছুঁড়ে দিয়েছেন সে শুধু আপনার প্রেমের গভীরতা দেখবার জন্যে।

মনের খুশি মনে চেপে সর্দার দূতকে বলল, তোমাদের রাণীর এই সুমতির জন্যে খুশি হয়েছি। তুমি বিশ্রাম করো। আমি সব ব্যবস্থা ঠিক করে তোমার সঙ্গেই খবর পাঠাচ্ছি।

দূত আড়ালে যেতেই মরুভূমির এই 'কেশর খাঁ' মনের সুখে গোঁফে দিল চাড়া।

আর.

রঙীন দেখে পাগড়ি পরে মাথে,
সুর্মা আঁকি দিল আঁখির পাতে,
গন্ধভরা রুমাল নিল হাতে
সহস্রবার দাড়ি দিল ঝাড়া।

সর্দার তার লোকের সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক করে দূতের সঙ্গে প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে কহেনার কাছে পাঠিয়ে দিল।

দিনের পর দিন পার হয়ে এলো সেই বিয়ের দিন। এদিকে বার্বার উপজাতির মানুষেরা সত্যি অবাক হয়ে গেছিল। কহেনা কি করতে চায়—কী ওর ইচ্ছে? এত সব পানিপ্রার্থীদের মধ্যে কহেনা শেষে এই পশুটাকে পতি হিসেবে বরণ করে নিতে চায়। নিশ্চয়ই ওর বিভ্রান্তি ঘটেছে!

দলবেঁধে দলের গণ্যমান্য লোকেরা ওর কাছে দরবার করতে এল। তাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল কহেনা, কি চাও তোমরা?

আমরা জানতে চাই তোমার অভিলাষ।

আমার ওপর কি তোমাদের বিশ্বাস আছে?

এখনো আছে। সবাই চেঁচিয়ে ওঠে, আর—

তা'হলে। সবাইকে থামিয়ে দিল কহেনা, এইটুকু বিশ্বাস আমার

পরে রেখো তোমাদের অপ্রিয় কোন কাজ আমি করব না।

সত্যি কি আর নিশ্চিন্তে ফিরতে পেরেছিল!

কথায় বলে, নারীচরিত্র দেবতাদেরও— ।

বার্বার উপজাতির প্রধানেরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, তবে কি তাদের আশা আশঙ্কায় পরিণত হবে। ছেলেরা যে কাজ করতে পারে নি একজন মেয়ের মধ্যে সেই সম্ভাবনা দেখে তারা যে উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন। এই পীড়িত অত্যাচারিত জাতি আকাশে মুখ তুলে তাকাবে। তাদের দীর্ঘদিনের ঘুম ভেঙে অস্ত্র হাতে নিয়ে মরুভূমির বালি উড়িয়ে ছুটে যাবে দিগন্ত থেকে দিগন্তে। তাদের সে স্বপ্ন কি কোনদিন সফল হবে না!

মরুভূমিতে বসন্ত নেই সত্যি কিন্তু বিকেলবেলা রঙের খেলা আছে। তেমনি এক বিকেল বেলা সর্দারমশাই দলবল নিয়ে ঘোড়ায় উঠলেন।

'রবি তখন রক্তরাগে রাঙা, সবে তখন ঝিকিমিকি বেলা'

তারপর একটা ধুলোর ঝড় উড়ে চলল সেই বার্বার উপজাতির জনপদের দিকে। সর্দারের মনের অবস্থা তখন কল্পনা করে নেওয়া যায়। মনে মনে উদগ্রীব উৎকণ্ঠা। সময়ের এই সাঁকোটুকু পার হতে পারলেই সেই প্রত্যাশিত হাত। দীর্ঘকাল যার জন্যে অপেক্ষা। অনেক অনাদর। অনেক অবহেলা এই হাতের জন্যে সইতে হয়েছে। উল্লসিত জনতা তাদের তোরণের সামনে অপেক্ষা করছিল। সাদর অভ্যর্থনা জানালো। তারপর সেই রাত্রির নায়ককে তারা কহেনার প্রাসাদে পৌঁছে দিল।

উৎসবের আলোয় ঝলমল করছে পাথরে তৈরি প্রাসাদ। সর্দার অবহেলার সঙ্গে চারপাশে তাকিয়ে এগিয়ে গেল প্রাসাদের অভ্যন্তরে।

বিবাহের প্রাথমিক অনুষ্ঠানের পর অধীর সর্দার কহেনার দেহ দাবী করল।

গভীর চোখ মেলে কহেনা বলল, এটা পাপ তুমি মানো?

পাপ কেন?

বিবাহের আগে তোমার কাছে স্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে পারি না।

কিন্তু আমি আর দেরি করতে পারছি না। তোমার অনিন্দ্য সৌন্দর্য আমায় পাগল করে দিয়েছে।

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল কহেনা। তারপর বলল, তুমি কি চাও আলোতে আমি পাপ করি ?

সন্দিগ্ধ চোখে সর্দার কহেনার দিকে তাকিয়ে বলল, অন্ধকারে আমার আপত্তি নেই।

এসো তবে। নববধূর বেশে সজ্জিত কহেনা দুরু দুরু পায় আলো থেকে অন্ধকারের দিকে এগিয়ে গেল। সর্দার তাকে অনুসরণ করল। হাত দিয়ে কোমরের ছুরিটা একবার অনুভব করে নিল।

চারপাশে নিবিড় অন্ধকার। গভীর অন্ধকার। অন্ধকারের পর অন্ধকার সাজানো।

অন্ধকারের মধ্যে থমকে দাঁড়ালো কহেনা। সর্দার তাকে দেখতে না পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, কহেনা তুমি কোথায় ?

কিছুক্ষণ উত্তর পাওয়া গেল না।

তারপর কহেনা ফিসফিস করে বলল, এই তো, এই যে আমি। তার গলার স্বর গাঢ় আকাংখায় জড়ানো।

বাতাসে একটু সুগন্ধের আভাস। সেটা বোধহয় কহেনার গায়ে ছড়ানো কোন পুষ্পসারের গন্ধ। অন্ধকারে সেই গন্ধের আভাস লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল সর্দার, কোথায়—কোথায় তুমি কহেনা ?

এই যে। অন্ধকারের কোথা থেকে যেন কহেনার কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

হঠাৎ দূর দরিয়ায় নাবিকেরা কূল পেলে আনন্দে যেমন চেঁচিয়ে ওঠে তেমনি আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল সর্দারমশাই, কহেনাকে তার দুহাতের মধ্যে পেয়ে।

সেই উন্মত্ত বর্বর কহেনাকে বুকের মধ্যে টেনে পিষে ফেলতে চাইল। তৈরি ছিল কহেনা। জর্জরিত পশুকে লোভের সুযোগে জালে ফেলে

পাঁজরার নীচে ছুরি বিঁধিয়ে দিল। বিষে নীল

আর্তনাদ করে উঠল সেই পশুটা, বিশ্বাসঘাতিনী!

কহেনা জানত শুধু ছুরি বিঁধিয়ে দিলেই হয়তো মরবে না, তাই সে ছুরিটা পিঠ থেকে পেট পর্যন্ত টেনে দিল।

ততক্ষণে সর্দার ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে পেরে কোমর থেকে ছুরি টেনে নিয়েছে। কহেনা আঘাত করেই সরে গেছিল। কোন অন্ধকারে সে ডুবে রইল বুঝে উঠতে পারল না সর্দার। শুধু অন্ধকারে অসহায়ভাবে কয়েকবার ছুরি চালিয়ে দরজার উপর আছড়ে পড়ল।

ঘরের ভিতর আলো জ্বলে উঠল। ঠোঁট কামড়ে ভ্রূকুটি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল কহেনা। বলল, এতদিনে তুমি আমাকে, আমার জাতকে স্বস্তি দিলে—

এদিকে সর্দারের অনুচরেরা সেই প্রাসাদের গায় আসর পেতে বসেছে। প্রচুর মদ আর মাংসের সঙ্গে মরুভূমির মঞ্জরিত যৌবনের নেশায় বেসামাল। তাদের চাউনির ছুরিতে হৃদয় এফোঁড়-ওফোঁড়, আর পুষ্পিত পদপাতের ছন্দিত হিল্লোলে বুকগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। নেশার রঙ সবে ঘন জ্বালা ধরিয়েছে।

এমন সময় ব্যাপারটা ঘটল। কি-যেন-একটা ভারী জিনিষ উপর থেকে আছড়ে পড়ল সামনে। অনুচরদের মধ্যে সজাগ কয়েকজন উঁকি দিল, কি—রহস্যময় ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে না। উৎসবের আসর থেকে একটা বাতিদান নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, আরে—

মুখ দিয়ে আর কথা বের হল না। ছুটে এসে অস্ত্র তুলে নিল হাতে। তারপর রুখে দাঁড়াল। ধ্বংস করে দিয়ে যাবে বার্বারিদের এই জনপদ।

না, সব কিছুই সম্ভব হল না। তার আগেই বার্বারিদের শিক্ষিত সেনাদল এসে ওদের ঘিরে ফেলল।

ইচ্ছে করলে কহেনা ওদের ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারত। কিন্তু সে সব কিছু করল না। তাকে যে আরো অনেকদূর এগিয়ে যেতে হবে। অনেক কাজ তার হাতে। কোন নিষ্ঠুর খেলা তার সাজে না।

আনুগত্য স্বীকার করতেই সর্দারের সব অনুচরকে মার্জনা করা হল।

এরপর কহেনার সৌভাগ্য-সূর্য আকাশে ভাস্কর হল। মরুভূমির সেই মধ্যাহ্ন সূর্যের সঙ্গীকে হবে?

কহেনা রাণী হলেন। বার্বার জাতির সমস্ত জ্ঞাতিগোত্রকে একত্র করে নতুন এক প্রেরণার সঞ্চার করলেন। আভ্যন্তরীণ বিভেদ ভুলে কহেনার পতাকার তলায় এসে দাঁড়াল তারা।

মুসলিম শক্তি সেই প্রথম এক প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হল।

যে জুলফিকারের সামর্থ্য এই এলাকার মানুষদের উপর মৃত্যুর নির্মম আঘাত হেনেছিল দীর্ঘদিন বাদে তার প্রত্যাঘাত ফিরে এল।

চারপাশের মুসলমানদের নগরের পর নগর অধিকার করে চললেন কহেনা। বার্বার জাতির ঝড় মরুভূমির ঝড়ের সঙ্গে মিলে দুর্বার সাহসে এগিয়ে চলল। এমন কি খৃষ্টান অভিজাতরাও এগিয়ে এসে তাকে সম্মান জানিয়ে গেল।

তাম্রবর্ণ মরুপ্রান্তরে আগুনের শিখার মতো হিরণ্যদ্যুতি কহেনা ঘোড়ায় বসে তাঁর সৈন্যদের উৎসাহিত করে তুলতেন: এগিয়ে চলো সৈন্যগণ, আমাদের সামনে নতজানু নগরী অর্ঘ্য নিয়ে অপেক্ষা করছে। তাকে জয় করে নিতে হবে। যদি মরি, মৃত্যু হবে বীরের সৌভাগ্য। আর বেঁচে থাকলে বীরের সুখ হবে করায়ত্ব।

কয়েক বছর ধরে এই অন্ধকার মহাদেশে শান্তি নেমে এল। উপকূলের দেশগুলোতে সমৃদ্ধি ও সম্পদ উথলে উঠল।

মুসলমানদের অত্যাচারে যে সব এলাকা জনশূন্য হয়ে পড়েছিল আবার ধনেজনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

আরবরা কিন্তু বেশি দিন তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে অপেক্ষা করে নি। বিশাল বাহিনী নিয়ে কহেনাকে আক্রমণ করতে এগিয়ে এল।

খ্রীষ্টান রাজারা কহেনাকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু

বিশ্বাসঘাতকতা করে মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করল।

সে যুগে কোন নারীর এই সাফল্য বোধহয় তাদের অসহিষ্ণু ঈর্ষায় জর্জরিত করে তুলেছিল।

অভিমানে কহেনার হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেল। অসহায় অভিমান থেকে ক্ষোভ, ক্ষোভ থেকে ক্রোধ। কালাগ্নির মতো দুর্জয় সেই ক্রোধে সৈন্যদের উত্তেজিত করে তুললেন, জাগো—জাগো।

মুসলমান সৈন্যরা যে পথ দিয়ে আসছিল পথের দুপাশে যা কিছু সুন্দর, সৃষ্টি সব ধ্বংস করতে করতে আসছিল। গ্রাম নগর মন্দির পাঠাগার।

পথের মাঝখানে গতি রোধ করে দাঁড়ালেন কহেনা। সমস্ত বার্বার জাত আজ তার সঙ্গে। যদি মরে সে মৃত্যুও হবে সুখের। প্রচণ্ড আঘাত হানল মুসলমানেরা—অরা যেমন নির্মম তেমনি নিষ্ঠুর। মরুভূমির বালির মতো সংখ্যায়ও অসংখ্য।

প্রথম আঘাত কোন রকমের সামলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কহেনা। সর্বত্র সৈন্যবাহিনীর আগে থেকে তাদের উৎসাহ জুগিয়ে চললেন। সমুদ্রের জোয়ারের মতো বার্বার সৈন্যদের কল্লোল আছড়ে পড়ল মুসলমাদের প্রতিবোধের প্রাচীরে। আর কোথায় ভেসে গেল সেই প্রতিরোধ। পরাজিত মুসলমানদের তাড়া করে এগিয়ে গেলেন কহেনা।

পথে যা পেলেন পুড়িয়ে ছারখার করে দিলেন। নগরের পর নগর ধ্বংস হল। উত্তর আফ্রিকার বিশাল এলাকা জুড়ে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করলেন। যে সব উপজাতি বা সামন্ত মুসলমাদের সাহায্য করেছিল তাদের হত্যা অথবা বন্দী করলেন। শস্য নষ্ট করা হল। ফলের বাগান নিশ্চিহ্ন করা হল।

বাধা দেবার মত কেউ আর রইল না।

বিজয়োল্লাসে ফিরলেন কহেনা। প্রাচীন থাইড্রাসের প্রান্তরে তার জয়ের স্মারক নির্মিত হল বিশাল এম্ফিথিয়েটার। যার ধ্বংসাবশেষ

এখনো মহীয়সী সম্রাজ্ঞীর স্মৃতি আঁকড়ে বেঁচে আছে।

তারপর এল সাত শ' তিন সাল। বার্বার জাতির সংকটের বৎসর।

বিখ্যাত মুসলমান সেনাপতি হাসান বিশাল বাহিনী নিয়ে এগিয়ে এলেন। রাণী কহেনা শাসনদণ্ড ফেলে, যুদ্ধাশ্বের বল্গা তুলে নিলেন হাতে।

মগহার্বের থাইড্রাসে দু' দল দু' দলের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল।

কহেনা এখানে তাঁর শৌর্যের শেষ পরিচয় দিয়ে গেলেন।

সামনে দুর্দ্ধর্ষ ধর্মোন্মাদ মুসলমান সৈন্যের দল, কিন্তু কহেনা অবিচলিত। মনে কোন দ্বিধা নেই। দ্বন্দ্ব নেই। 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন'।

তারপর সুরু হল থাইড্রাসের সেই ইতিহাসখ্যাত যুদ্ধ। বারবার আঘাত প্রতিহত করে দিলেন কহেনা। কিন্তু মুসলমানেরা মরিয়া। হয় জয় নয় ক্ষয়।

কয়েকদিন যুদ্ধ চলার পর পরাজয় অনিবার্য হয়ে এল। কিন্তু কহেনা অপরিসীম সাহসে সৈন্যদের প্রেরণা জোগাতে লাগলেন। যুদ্ধে জয় পরাজয় তো অনিবার্য।

একদল মুসলমান শেষ হয়, অন্যদল এসে সেই জায়গা দখল করে। ইউরোপ-আফ্রিকার এপারে ওপারে ধর্মযুদ্ধের কথা শুনে দলে দলে মুসললান ইসলামের অর্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত পতাকার তলায় এসে জমতে লাগল।

কহেনার পক্ষে নতুন সৈন্য সংগ্রহ ও খাদ্য সরবরাহ বজায় রাখা অসম্ভব ছিল। মরুভূমির সব পথ বন্ধ।

শুধু বীরত্ব দিয়ে সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতির উপর রৌদ্রোজ্জ্বল ইতিহাস রেখে গেল বার্বার জাত্।

যুদ্ধের শেষ অবস্থায় কহেনার ছেলে ছুটে এসে মাকে বলল, মা তুমি দূরের ওই পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নাও—

কেন? দৃঢ় হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে কহেনা জিজ্ঞাসা করলেন।

আমাদেব যুদ্ধ জয়ের কোন উপায় নেই।

তুমি কি বলছ আমি পালিয়ে যাবো?

পালাতে বলছি না। যদি তুমি ওখানে গিয়ে আত্মবক্ষা করো। ছেলেব চোখে মিনতি ছলছল করে।

আমি আত্মবক্ষা করবো! এত দুঃখেও কহেনাব মুখে বেদনার হাসি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আব আমাব সৈন্যরা প্রাণ দেবে! একটু থেমে বললেন, যে নিজে আবব বার্বাব রউমিদের উপর আধিপত্য করেছে তাকে যদি মবতেই হয় রাণী হয়েই মবতে হবে।

মা। অশ্রুসজল হয়ে উঠল ছেলের চোখ।

ছেলেব মাথা কাছে টেনে মস্তকেব ঘ্রাণ নিলেন কহেনা। তারপরই ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন শত্রু সৈন্যেব দিকে—দুর্জয় বেগে বাবাববা নতুন কবে গিয়ে পড়ল মুসলসানদেব উপব।

কিন্তু সংখ্যা যেখানে অসংখ্য বীবত্ব সেখানে আত্মহতাব নামান্তব।

মুসলমানদেব দ্বাবা পবিবেষ্টিত হয়ে নিরুপায় কহেনা নিজের তরবারি দিয়ে আত্মহত্যা কবলেন।

'আল্লা হু আকবব'। শব্দের তবঙ্গের তলায় কোথায় তলিয়ে গেল কহেনার দেহ।

তারপর সুরু হল মুসলমানদেব হত্যালীলা। বার্বাবদের কেউ প্রাণ নিয়ে পালাতে পাবে নি। থাইড্রাসের সেই প্রান্তবে বাবার বীরত্ব জ্বলে উঠে শেষ বাবেব মত নিভে গেল।

এইখানেই গল্প শেষ হয়ে গেল। না না। আব একটু বাকি আছে। হাসান কহেনাব আত্মহত্যাব খবব পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, ওকে জ্যান্ত ধরে আনা গেল না?

খোদাবন্দ সে কি সম্ভব! অধস্তনেরা উত্তব দিলেন, আগুনের হল্কা হাত দিয়ে ধরা যায়!

আরক্ত চোখে হাসান অনুচরদের দিকে তাকালেন।

তারা নতমস্তকে বলল, গোস্তাকি মাপ হয় !

শোন। হাসান তাঁর আসনে সোজা হয়ে বসলেন, কহেনার মৃত-দেহ খুঁজে বের করো—তারপর চেঁচিয়ে উঠলেন, বের করা চাই—

এ ওর মুখের দিকে চাইল। সে কি সম্ভব। তবু আদেশ অমান্য করার উপায় নেই। সৈন্যদেব মধ্যে আদেশ প্রচাবিত হয়ে গেল কহেনাব মৃতদেহ উদ্ধার করে দিতে পারলে প্রচুর পুরস্কার মিলবে।

বাত্রিব সাম্রাজ্য লোভী মুসলমান সেনারা মশাল জেলে থাইড্রাসের প্রান্তরে নেকড়ের মতো হানা দিয়ে ফিরতে লাগল।

মিলল। শেষ পর্যন্ত কহেনার মৃতদেহ পাওয়া গেল। হাসানেব তাঁবুতে খবর গেল। ঘুম থেকে তোলা হল তাঁকে। সেনাপতির দরবার সাজানো হল। সেখানে গণ্যমান্যেব দল হল হাজির।

মহামান্য বাগদাদের সুলতানেব দোর্দণ্ডপ্রতাপ সেনাপতি হাসান এসে দাঁড়ালেন।

সৈন্যরা কহেনার মৃতদেহ হাসানের সামনে এনে নামাল। সাহারাব রাণী কহেনার মুখে তখনো এক স্বর্গীয় হাসি। একটু বুঝি বিচলিত হয়ে প'ড়েছিলেন হাসান। সেই মুহূর্তেই তার তরবারিতে হাত রাখলেন। জিঘাংসার নরকাগ্নি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। খাপ থেকে তরবারি বের কবে সামনে ধবলেন। বাঁটে চুনিপান্না পোকরাজের কারুকাজ। চারুসাজ তাঁবুর আলোয় তরবারিটা সকলের সামনে তুলে একবার সপ্রশংস দৃষ্টিতে তরবারির দিকে তাকালেন হাসান। বিধর্মীব রক্তের জন্যে এর দীর্ঘকালেব তৃষ্ণা !

না, আর দেরি নয়। হাসান নতজানু হয়ে বসলেন কহেনার রক্তাক্ত দেহের সামনে।

তাবপর মুসলমানদের চিরাচরিত নৃশংসতার সঙ্গে কহেনার দেহ থেকে মাথাটা সযত্নে কেটে নিয়ে পাশে-রাখা মণি মুক্তোয় চিত্রবিচিত্র মঞ্জুষাতে রেখে উঠে দাঁড়ালেন। আর নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন, বিধর্মীদের কেউ প্রাণ নিয়ে পালাতে পারেনি তো ?

কেউ না। কেউ না। সমস্বরে চিৎকার উঠল।

সেইদিন সকালে সূর্য ওঠার অনেক আগে একদল সশস্ত্র অশ্বারোহী কহেনাব মাথা নিয়ে বোগদাদের দিকে ছুটে গেল। খালিফার কাছে সেনাপতি হাসানেব উপহার।

থাইড্রাসেব প্রান্তরে তখন শ্মশানেব শান্তি।

আসুন না। আমাব ঘরে আসুন। বারো বছরের একটা মেয়ে আমাকে ডাকছে। হাজার বছর আগেকার ইতিহাসের পাতা থেকে বাস্তবে ফিরে এলাম।

অপলক চোখে তাকিয়ে রইলাম মেয়েটির দিকে। কী বলছে ও! না, মেয়েটি বোধ হয় ওর মায়ের হয়ে গ্রাহক ডাকছে। জানালার ওপাশে একজোড়া ধূর্ত চোখ উঁকি দিয়ে সরে গেল।

পশ্চিম দিগন্তে আফ্রিকাব সূয। বাইবেব দিকে তাকালাম। পুরোন বাড়িব ছাযায় আলোছাযার এক আশ্চর্য খেলা।

ও বিদেশি সুলতান, আমাব ঘবে আসুন। এখানে শীতল পানীয় এবং উষ্ণ দেহ পাবেন। ছোট মেযেব মুখে কথা শুনে সামনেব দিকে এগিযে গেলাম। মেযেটা জানেনা ও কি বলছে।

এই বাস্তাটা পাব হতেই দু'পাশের জানালায় ইহুদি দে' বিলাসিনী-দেব মুখ চোখে পড়ল। এতগুলো সুন্দর মুখ এক সঙ্গে খুব কমই চোখে পড়ে। এদেব মুখে দু' হাজাব-আড়াই হাজাব বছর আগেকার রূপকথার স্বাদ। হেলেনেব মুখ। পেনিলোপির চোখ। রূথের বিষণ্ণতা।

অথচ আমি জানি এবা কি কি চায।

সাহেব যান না, ভিতবে গিযে দেখে আসুন। আমাব আবব গাইড গামাল আমাব দিকে তাকাল।

যাবো? যেন ওব সমর্থনেব জন্যেই অপেক্ষা কবছিলাম।

আমি এখানে দাঁড়িযে কাকডাবিছের খেলা দেখছি. আপনি ঘুরে আসুন।

কয়েক পা এগুতেই সে আমার দিকে ছুটে এলো, সাহেব ওই বাড়িতে যান। মা-মেয়ে ছু'জনে থাকে। ছু'জনেই খাপ সুরৎ। আমার দিকে ময়লা দাঁত বের করে হেসে ফেলল।

স্পিরিটে দেশলাইয়ের কাঠি ছোঁয়ালে যেমন জ্বলে ওঠে মন তেমনি জ্বলে উঠল ওর কথা শুনে। মনে-মনে বললাম, অসভ্য ইতর—

তারপর হেসে উঠলাম। সেই মনে-মনে। ও তো গ্রীক দার্শনিক হিপোক্রিটসের শিষ্য নয়। যা মনে এসেছে তাই বলেছে।

ওর দিকে শান্ত চোখে তাকিয়ে এগিয়ে গেলাম সেই বাড়িটার দিকে।

আসুন এগিয়ে। আধবুড়ো ইহুদি অভ্যর্থনা করল।

দরজার গায় একটা মোটা মেয়েমানুষ দাঁড়িয়েছিল। সে এগিয়ে এল। মুখটা অশ্লীল। অথচ সুন্দব। লাস্যের সঙ্গে সৌন্দর্যের নিরুত্তাপ সমীকরণ ঘটেছে। শবীবটা বেঢপ হয়ে গেছে। পেটে ভাঁজ পড়েছে। অদ্ভুত একটা শব্দ কবে ছুটে এল। বোধ হয় জালে মাছি পড়েছে সেই আনন্দে।

পাশের ঘরেব দিকে চোখ ফেলালাম। একটি করুণ মুখ আমার দিকে সতৃষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে। শুধু চোখ ছুটো দেখতে পাচ্ছি। সমরখন্দের তরমুজের বীচির মতো মিসমিসে কালো। ডান দিক দিযে ঘুরে গেলাম।

সোনালি চুল মেয়েটার মুখে একটুখানি হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল। ছু'হাত বাড়িয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করল।

আমি হাত বাড়িয়ে দিতে নিজে এসে আমার হাত ধরল। মুখে মেয়েদের সেই চিরকালের ভুবনবিজয়িনী হাসি।

আমাকে খাটের ওপর নিয়ে বসালো। একটু অসুবিধা বোধ করছিলাম বিছানাব চেহারা দেখে। আমি বসতেই পুরোন লোহার খাট আর্তনাদ করে উঠল।

ঘরের মধ্যে চোখ ফেলে নিদারুণ দারিদ্রের ছবি দেখলাম। দেওয়ালে

কতোদিন রঙ হয়নি। ময়লা পড়ে নতুন একটা কালচে খয়েরি দাগ ধরেছে। দেওয়ালে সারা পৃথিবীর ছবি। আট-ন বছরের পুরোন ক্যালেণ্ডার।

মেয়েটির দিকে তাকিয়েছিলাম। ওর স্পেনীয় চোয়ালে বিশীর্ণ মলিনতা! অনেক দিনের অপরিপুষ্টির। তবু সুন্দর। গায়ে হালফিল সিনেমা প্যাটার্নের পুরুষালি জামা। পরনে খোলামেলা হাফ প্যান্টের মতো এক রকমের প্যান্ট। হাঁটুর নীচে অবধি নেমেছে। যতোটুকু দেখা যাচ্ছে সেই মসৃণ পদদ্বয় নিটোল এবং দেহবিলাসিদের তৃষ্ণা জাগানোর পক্ষে যথেষ্ট। মেয়েটি আধা-ফরাসি আধা-আরবিতে কথা বলছিল। চোখ দেখে বোঝা যায় প্রাণের আনন্দ এখনো পুরোন হয়ে যায় নি।

গাল দুটো আশ্চর্য লাল। আনারকলির মতো। হাসলে টোল খায়। চোখের পলক অপলক হয়ে আছে আমার দিকে।

এই মেয়েটির কথাই আমার গাইড আমাকে বলে দিয়েছিল। ও ঘরের সেই স্ত্রীলোকটি এ ঘরে এলো। কাছ থেকে দেখে মনে হল মেয়েটির মা মায়ের চাউনিতে মেয়ের সৌন্দর্যের দীপ্তি গর্বিত।

আরে একি! মেয়েটা যে বিবসন হচ্ছে। আর বেশি সময়ও নিল না। ওর যুরোপীয় বোনদের চেয়ে ও এ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ। আসলে ফ্রকের নীচে কিছুই পরা ছিল না।

মা এসে হাত পাতল, টাকাটা আগেই দিয়ে দিতে হবে।

বলো কি? আমি অবাক হলাম।

হ্যাঁ, তাই নিয়ম।

এ রকম নিয়ম কোথাও আছে বলে জানিনে!

স্ত্রীলোকটি অবাক হয়ে একবার তার মেয়ের দিকে একবার আমার মুখের দিকে তাকাল। ওর চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল খুব অবাক হয়ে গেছে।

তুমি বোধ হয় এখানে নতুন?

মাথা নাড়লাম।

এখনো পর্যন্ত কারো ঘরেই বোধ হয় যাওনি ?

আবার মাথা নাড়লাম।

গেলেই বুঝতে পারতে, পয়সা না দিলে কেউ তোমাকে নাচ দেখাতো না।

মেয়েটি কিন্তু সেই অবজ্ঞার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে কোন বিকৃতি দেখতে পাচ্ছি না। লজ্জার কোন শিহরণও ওর শরীরে নেই।

একটু হাসলাম, ঠিকে ঠিকে বোধ হয় তোমাদের এই অবস্থা। কাউকেই বিশ্বাস করতে পারো না।

স্ত্রীলোকটা আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে আরো কাছে এগিয়ে এসে হাত পাতল।

আমি তার হাতে একশটি ফ্রাঙ্ক তুলে দিতেই হেসে সরে গেল। তারপর একটু দূরে গিয়ে বলল, নতুন এলেও তোমার যে চোখ আছে মানতেই হবে। আমার মেয়ে এ মহল্লার রাণী। ওর ঘরে সবাই কি আসতে পারে। যা তোমাকে দিতে হল এ দিয়ে তিনটে ঘরে যেতে পারতে।

মা টাকাটা তুলে রেখে আবছা অন্ধকার ঘরে দীপালোক জ্বেলে দিল। বাইরে উজ্জ্বল রাত। ঘরের মধ্যে ফিকে আলো।

মেয়েটা এবার নাচের ভঙ্গীতে হাত তুলে দাঁড়াল। মুখে মোহিনী মায়া। একটুখানি হাসল। অর্ধেক পৃথিবী জয় করে জুলিয়াস সীজারও এমনি হাসি হাসতে পারত না। এ তো সেই একই মুখ যাকে উদ্দেশ্য করে মার্লো তার ডক্টর ফস্টাসে বলেছেন :

Was this the face that launch'd a thousand ships,
And burnt the topless towers of Illium ?

হাসি দিয়ে তার নাচ সুরু করল। চোখে তার মনের কথার রৌদ্র-ছায়ার খেলা। আর শরীরের নরম পেশিতে অন্ধকার সমুদ্র স্নানের

আহ্বান পুরুষের বক্ষোরক্তে অসামান্য দোলা দিয়ে ফিরছে।

নাচতে নাচতে সে আমার কাছে এল। তার গায়ের ছোঁয়া আমার গায়ে লাগে আর কি! কিন্তু সে এক মুহূর্তের মধ্যেই আবার দ্রুত পায় ফিরে গেল নিজের জায়গায়।

মেয়েটির মা খাটের তলা থেকে তারবুকো টেনে নিয়ে বাজাতে বসে গেল। একঘেয়ে এই বাজনাটা শুনে যেটেই সইতে পারি না। তবু নাচের সঙ্গে বাজনাতে একটা নতুন ছন্দ এল।

মেয়েটি নাচবার আগে যে সোনালি ফিতের আড়াআড়ি বোনা জুতো পড়েছিল, এখন তার ওপর আলোর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

সেই অন্ধকার ঘর। ছায়ায় ছন্ন শীতল শৈথিল্যে তার অবারিত বক্ষের পর্যাপ্তপুস্পিত সৌন্দর্য, নিতম্বের কুটিল রেখার ভাঁজে মনে নেশা এনে দিচ্ছিল।

মেয়েটি তার একটা হাত বুকের কাছে এনে বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে আমাকে উত্তেজিত করার যতো রকম বাণ ওর তূণে আছে কোনটাই নিক্ষেপ করতে ইতস্ততঃ করছে না। নাচ যাইহোক না কেন মূলধন তো তার দেহ। সেই দেহ যে খেলা দেখায় পাথর না-হলে পুরুষের মন গলাতেই হবে।

হঠাৎ সে আমার কাছে ছুটে এল। কানের কাছে মুখ নিয়ে কি যেন একটা গান গাইল। অপরিচিত সুর। (তার নিঃশ্বাসের তাপ আমার গায়ে লাগছে।) সেই অপরিচিতের গানের সুরে মনে হল যৌবনের লাস্য বুঝি যন্ত্রণা হয়ে উঠেছে। মুখের ওপর কবোষ্ণ নিঃশ্বাসের মায়া। আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখছে।

এক মুহূর্ত থেমে আমার সামনে সেই বিবসন শরীরী সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দেখে চোখ ফেরে না। সৌন্দর্যের ইন্দ্রানী। সমস্ত অবয়বে সম্রাজ্ঞীর গর্ব। মরুভূমির অনায়ত্ত ও অনুর্বর বিশালতা যেন মরিচীকা হয়ে ছলনার হাতছানি দিচ্ছে।

কি কথা ওর চোখের কোণে!

আমি কি করে বলব। আমি শুধু নিজের কথাই বলতেই পারি অন্যের ভাষায় :

Sweet Helen, make me immortal with a kiss—
Her lips suck forth my soul : see where it flies !—
Come, Helen, come, give me my soul again.
Here will I dwell, for heaven is in the lips.

মেয়েটি আমার সামনে দাঁড়িয়ে হয়তো ভাবছিল আর কতোখানি এগোলে খদ্দেরের কাছ থেকে আরো কিছু বকশিস আদায় করা যেতে পারে।

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়েই মেয়েটি ঘূর্ণিবায়ুর মত ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল! তার শরীর সেই পাথুরে মেঝের পর কেউটে সাপের স্বচ্ছন্দ বিহারে চলা ফেরা করতে লাগল।

এক-একবার ঠোঁটটা আমার ঠোঁটের কাছে নিয়ে আসছে। নিজের চোখেই দেখছি দ্রাক্ষার মতো রসালো।

কী রকম যেন মোহগ্রস্থ হয়ে গেছি। নিজের সমস্ত সংজ্ঞা বুঝি হারিয়ে ফেলেছি।

কিন্তু চেতনা না-হারিয়ে উপায় কি! চোখের সামনে সেই নিটোল পদদ্বয়ের স্বেচ্ছাবিহার, সুনয়নার চোখের সেই ভাষা। হায়রে হৃদয়, কতো কঠিন তোমাকে করা যায়!

আমাকে আরো আনন্দ দেবার জন্যে ছলাকলার সবটুকুই সে ব্যবহার করছে। কেন না ও জানে আমাকে যতো উত্তেজিত করতে পারবে ওকে খুশি করার জন্যে আমি দাক্ষিণ্যে ততোই অকৃপণ হবো।

সেই মুহূর্তে আর হয়তো নিজেকে সামলাতে পারতাম না। ঝাঁপ দিতে হত সেই গভীর গহীন জোয়ারের সমুদ্রে।

কিন্তু হঠাৎ আমার পিঠের দিকের দরজা খুলে গেল। থমকে দাঁড়াল মেয়েটা। আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলাম আমার গাইড আয়ুব। তার ময়লাধরা দাঁত বের করে হাসছে।

আমি ওর দিকে তাকাতে জিজ্ঞেস করল, সাহেব—

বলো ? আমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অনুমতি দিলাম।

আজ যাবেন ? একটু দম নিয়ে ও আবার হাসল. না, সারারাত থাকবেন—

তার মানে ! আমি ওর দিকে ঘুরে বললাম ··

ভালো লাগলে অনেকেই তো—। থতমত খেয়ে গেল আয়ুব, আমি দেখেছি—

মেজাজ বেসামাল হয়ে গেছিল আয়ুবের কথা শুনে। সামলে নিলাম। ওর উপর রাগ করে লাভ ! লোকে তো এখানে থাকতেই আসে। ক'জন আর বেরিয়ে যেতে পারে !

মুখে শুকনো হাসি এনে বললাম, এখুনি উঠবো। আর একটু অপেক্ষা কর।

আয়ুব দরজা বন্ধ করে বাইরে নেমে গেল।

মেয়েটা জিভ দিয়ে মিষ্টি একটা শব্দ করল। কি ভাবলে সে ! আমার মুখ দেখে অনুমান করছিল আমি বোধ হয় আর একটু সময় নেব।

তাই সে তার ছোট অথচ আয়ত চোখে জিজ্ঞাসার কুহক এনে ইশারা করল। তারপর আবার শুরু করল নাচ। আমাকে নিয়ে সে বোধহয় বেশি সময় আর নষ্ট করতে চায় না। তাই তার নাচের প্রতিটি বিক্ষেপ এবার নাভির তলা থেকে শুরু হল।

আমি হাত দিয়ে ইশারা করলাম, থাক।

কেন ? মেয়েটি অবাক হল।

ভালো লাগছে না।

সত্যি ! মেয়েটি অবাক হয়ে আমার খাটের কাছে মাটিতে এসে বসে পড়ল। অনেকক্ষণ নাচার ফলে বুকের ওঠা-নামা দ্রুত হচ্ছে।

সত্যি। এ সবের জন্যে তোমার কাছে আসিনি। আমি তোমাকে জানতে এসেছি।

মেয়েটি ওর মায়ের দিকে তাকাল। মাও বিহ্বল হয়ে মেয়ের দিকে তাকাল।

কী জানতে [illegible] তুমি? মেয়েটির গলায় একটু যেন নৈরাশ্য। যে বকশিস আমার কাছ [illegible] প্রত্যাশা করেছিল সেটা ফসকে গেল বোধহয়।

তোমাকে, ওর মায়ের [illegible] এলে [illegible] সঙ্গে বিশ্বাস করবো তোমাদের জানতে চাই।

আমাকে? মেয়েটি আমার কথা [illegible] করতে না দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

হ্যাঁ তোমাকে—এসো, তোমার বিছানার উপর এসো—মেয়েটি বিছানার উপর উঠে এল। ওর মা এতক্ষণ ডাববুকো থামিয়ে বসে ছিল। এবার ডাববুকোটা খাটের তলায় সরিয়ে দিয়ে উঠে গেল।

তোমাকে একটু কফি দিতে বলবো? মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল।

না।

তবে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করো। তোমার জন্যে অনেক সময় দিয়েছি।

আর একটুখানি দাও। আমার চোখে বুঝি মিনতি ছিল। তোমার দেশ কোথায় সুন্দরি?

কেন, এই সোনালি বার্বারি উপকূল।

বার্বারি উপকূল তো অনেকখানি জায়গা—নির্দিষ্ট করে যদি বলো—

কি লাভ তোমার?

কিছু না। শুধু কৌতূহল—

কুফারা চেনো?

চিনি না। নাম শুনেছি—

কুফারা যাবার পথে। এখান থেকে এক বেলার পথ।

কতোদিন আগে এসেছ?

অনেক দিন আগে এসেছি।

এখানে কেন এসেছিলে ? অবশ্য যদি না কিছু মনে করো—

বিশ্বাস করো তুমি। আজ আমাদের যেমন দেখছ [illegible] অবস্থাতে যাবার জন্যে আমরা আসিনি।

তবে ?

বড়ো গরীব ছিলাম আ[illegible] কিছু জোটাতে পারতাম না। তাই আমি আর [illegible] একবার দেশ হয়ে কি[illegible] গাড়ি দিয়ে তারপর [illegible] এসে ঠেকলাম। সে কতো দ[illegible]কার কথা। আমি তখন ছোট। ভালো করে মনেও নেই। আমাদের সেই খেজুর গাছে ছাওয়া গ্রামখানার কথা অস্পষ্ট মনে আছে।

গ্রামে আমাদের কেউ ছিল না। কিছু ছিল না। গ্রামের সবাই গরীব। কে কাকে সাহায্য করবে। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে আমরা একদিন একদল বেদুইনের দলের পিছু নিয়ে চলে এলাম।

এখানেও সেই একই অবস্থা। কয়েকদিন ধরে অনশন চলল। তুমি জানো বোধ হয় আমাদের ক্ষিদে বড়ো ভয়ানক। সেই ক্ষিদেই মাকে এ পথে টেনে নিয়ে এল। ছোটবেলায় বাবা মারা গেছে। গরীব ছিলাম আমরা কিন্তু বাবার স্মৃতির কখনো অসম্মান করিনি।

সেই প্রথম একটা মূব এল মায়ের কাছে। আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। মূরটা মাকে টেনে নিয়ে চলল। আমি [illegible] কাঁদতে মায়ের পিছনে চললাম। লোকটা বোধ হয় আমাকে আসতে নিষেধ করেছিল। বুঝতে পারিনি। লোকালয় একটু নিভৃতে ইতে আমাকে লাথি মেরে গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে গেল। অন্ধকার রাত্রি। প্রথমে অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম। একটু বাদেই জ্ঞান ফিরে এল। কাঁদতে সাহস হল না। দৈত্যের মতো সেই মূরটার কথা ভেবে চুপ করেছিলাম। কিন্তু মায়ের কথা মনে পড়তেই অভিমানে ছু'চোখ বেয়ে জল আসছিল। আর ছোটবেলার অবুঝ অভিমান সে তো কেবল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেই জানে। এতো ছোট সে কি আর করতে পারে।

অনেক রাত্রে আমার ঘুম ভেঙে গেল মায়ের ডাক শুনে। মায়ের

গলা কান্নায় ভেজা। আমি ভালো করেই জেগে উঠেছিলাম। কিন্তু সাড়া দিইনি। আমার সাড়া না-পেয়ে মা নিজে গর্তের মধ্যে নেমে এসে আমাকে কোলে তুলে নিল। জল আর তখন থামে না। আমার চোখে। মায়ের চোখে।

তারপর থেকে ব্যাপারটা সোজা [illegible] ল। আমিও বুঝে নিলাম। মায়ের কাছে অপরিচিত কেউ এ সময় বিশ্বাস [illegible] যেতাম। সারা রাত এখানে সেখানে কাটিয়ে সকাল বেলায় এসে [illegible] মলতাম।

এমনি করেই দিন কাটছিল। তারপর যারা মায়ের কাছে আসত তাদেরই একজন এই ঘরের ব্যবস্থা করে দিল।

এই সময় মেয়েটির মা উষ্ণ কফি নিয়ে এল, তুমি কফি খাবে ?

আমি কফি খাইনে। মিথ্যে কথা বললাম।

তবে।

চা খাই।

চা! একটু বিস্মিত হল মেয়েটির মা, চায়ের অনেক দাম। আমরা ছুঁতেও পারিনে। মেয়ের সামনে কফির পেয়ালা রেখে ফিরে দাঁড়ালো মা, ভালো লেগেছে তোমার ?

মন্দ কি! উত্তর দিলাম আমি।

একশ ফ্রাঙ্কের নোটে ওকে পাওয়া যায় না। তবে তুমি বিদেশি তাই রাজি হলাম। একবার ভালো লাগলে আবার আসবে। সেইটুকুই লাভ।

এই দৃঢ় অবয়বের মহিলাটিকে তার সুন্দর চেহারা সত্ত্বেও কড়া রকমের স্কুল মিস্ট্রেসের মতো মনে হল।

মা চলে যাবার পর মেয়েটি সেই অস্পষ্ট আলোতে বলল, আমরা আর এখানে থাকব না।

দেশে ফিরবে নাকি ?

দেশে! বিষণ্ণ হাসল সে, কি খাবো সেখানে—

তবে কোথায় যাবে ?

শুনেছি মার্সেলিসে আমাদের বাজার ভালো।

মার্সেলিস! আমি অবাক হলাম।

চেন নাকি?

মাথা নেড়ে বললাম, ওরই কাছে থাকি—

তাই নাকি? মেয়েটি খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠল। আমাকে তুমি নিয়ে চল না!

আমি তো একবার দেশ হয়ে ফিরছি।

ওঃ, মেয়েটি হতাশ হল, তা'হলে—

তোমাদের মার্সেলিসে কে নিয়ে যেতে চেয়েছে!

এখানকার একটা দালাল। কয়েকদিন ধরে মায়ের কাছে ঘোরাঘুরি করছে। বলছে, আমরা দু'জনে নাকি একদিনে সারা সপ্তাহের রোজগার করে নিতে পারি।

তা পারো। শ্লথকণ্ঠে মেয়েটির কথায় সায় দিলাম, কিন্তু—

থামলে কেন? অধীর আগ্রহে মেয়েটি বিছানা থেকে মাথা তুলে আমার দিকে তাকাল, তারপর হাতের উপর মাথা রেখে আবার বলল, থামলে কেন?

তুমি কষ্ট পাবে।

কষ্ট! মেয়েটি চঞ্চল হয়ে উঠল, কিসের কষ্ট?

যে স্বপ্ন তুমি আর তোমরা দেখছ ভেঙে গেলে কষ্ট পাবে না?

তুমি কি মার্সেলিসে গেছ?

অনেকবার। মেয়েটির মুখের সামনে নিটোল শব্দটি উচ্চারণ করলাম।

কি জানো বলো আমাকে।

মার্সেলিসে অনেকবার গেছি। ফরাসিরা তাদের এই বন্দর-সহরকে সাজাতে কোন রকম কসুর করেনি।

বন্দরের অংশটুকু বাদ দিয়ে যেখানে লোকেরা বসবাস করে সেটুকু সত্যি সুন্দর। মার্সেলিস স্বপ্নের মতো না হলেও স্বপ্নের চেয়ে কিছু

কম নয়। পথের ছ'পাশ দিয়ে [illegible]ের সমারোহ। নিওনের বিজ্ঞাপনের রূপকথা। [illegible] রঙীন আয়োজন। পরিচ্ছন্ন পথঘাট। শান্ত জীবন।

যেখানে তোমরা [illegible] সেখানেও গেছি। অসংখ্য গলিঘুঁজির [illegible] নীচের [illegible] আছে। মাকড়সার জালের মতো তার [illegible]। সারা বছরে সেই [illegible] যেতাম [illegible]সে না। সেই [illegible] ছ'পাশে তোমাদের [illegible] বলে অনেকে।

সেই সব ঘরে গতযৌবনা বুড়িরা [illegible] মুখ রঙ করে রঙচঙে পোষাক পরে বসে থাকে। মাতাল নাবিকের দল অন্ধকারে [illegible]তে না পেরে সেই ঘরের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সেই বুড়িগুলো [illegible] অক্টোপাসের মতো হাত দিয়ে তাদের জড়িয়ে অন্ধকারের অতলে তলিয়ে নিয়ে যায়।

সবাই যে বুড়ি এমন কথা অবশ্য বলা যায় না। এদের মধ্যে অনেক অল্প বয়সী মেয়েও থাকে।

কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলতে চাই, মার্সেলিসে পৌঁছবার আগেই দেখবে তুমি আর তোমার মা বিক্রি হয়ে গেছ। আর অন্তত বার চারেক হাত পালটে গেছ। প্রথম বার তোমাদের অজ্ঞাতে যখন বিক্রি হলে তখন তোমাদের দাম উঠেছিল হয়ত চার শ' ফ্রাঙ্ক— মার্সেলিসে গিয়ে যখন পৌঁছলে তখন হয়তো তোমাদের দাম চোদ্দ হাজার ফ্রাঙ্কে গিয়ে ঠেকেছে।

হুঁ [illegible] মেয়েটি শব্দ করল, তারপর—

তারপর সেখানে গিয়ে প্রত্যেকবার মানুষকে আনন্দ দেবার জন্যে যে অর্থ তুমি পাবে তার শতকরা ষাট ভাগ দিতে হবে তোমার মালিককে। বাদ বাকি চল্লিশ ভাগের মধ্যে নেট পঁচিশ ভাগ পাবে তুমি। পনেরো ভাগ যাবে তোমার খরচ-খরচা হিসাবে। আমার নিশ্চয়ই মনে হয়, এত অল্প টাকায় তুমি সন্তুষ্ট হতে পারবে না। আরো বেশি রোজগারের জন্যে তুমি নির্বিচারে নাবিকদের আনন্দ দিতে থাকবে। আর এর জন্যে গড়ে তুমি দিনে কুড়ি বার দেহ দান করবে।

ফলে বিভিন্ন বন্দর থেকে নোঙর তুলে আসা নাবিকেরা তাদের দেহের রোগ তোমার দেহে তোমার অজান্তে নোঙর করে যাবে।

তারপর একদিন সেই রোগ তোমার রূপ যৌবনকে [illegible] খেয়ে তোমাকে কংকালের সাদৃশ্য এনে [illegible] সপ্তাহের শেষে [illegible] পরীক্ষায় যাবার কথা শুনে তোমার হাত-পা [illegible] কিন্তু [illegible], ব্যবসা করতে [illegible] মানতেই হবে।

ডাক্তাববা একটু দশ [illegible] করে সুরাসার হাসপাতালে [illegible] দেবে। আর দিনদুন পক্ষে তিন সপ্তাহ [illegible] হাসপাতালে কাটিয়ে আসবার পব দেখবে কেউ তোমার ঘরে আসছে না।

এমন কি যে সব ভারতীয় [illegible] সাদা চামড়া ছাড়া সৌন্দর্যের কিছুই বোঝে না দেখবে তারাও তোমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেন? তোমার আয়নার কাছেই সেই রহস্যেব সন্ধান পাবে।

কিন্তু তোমার মালিকই বলো আব ইম্প্রেসারিওই বলো অত সহজে হাল ছাড়বে না। তোমাকে রঙ কবিয়ে বাজারে দাঁড় করতে চেষ্টা করবে। ভাগ্য যদি ভালো হয় তবে হয়তো গিনিকোষ্টের নিগ্রো দৈত্য কি ভারতেব খর্বকায় লস্করকে দু'এক দিন জালে ফেলতে পারলে। ব্যস, ওই পর্যন্তই।

রাত্রির অন্ধকারও হয়তো তোমাকে ঢেকে রাখতে পারবে না। এই অস্বাভাবিক দেহাচার আরো কুটিল রোগেব পথ করে দেবে।

নিতান্ত ভাগ্যকে দোষী করে সে বেচারী [illegible] ঘর ছেড়ে দেবার নোটিশ দেবে।

তখন নিতান্ত অপরিচিত দেশ—যেখানে মানুষের হৃদয় মরুভূমির চেয়েও নির্মম যেখানে কি করবে তুমি?

আমি কথা শেষ করে চুপচাপ বসে রইলাম। মেয়েটি অপলক হয়ে আমার মুখের দিখে চেয়ে আছে। কি ভাবছে সেই জানে।

অনেকক্ষণ বাদে সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি বলল, বিদেশি তোমার কথা আমার মনে

থাকবে।

আমি এ কথার কোন উত্তর দিলাম না। অন্ধকার ঘরের বাইরে দেখলাম। জ্যোৎস্না নেমেছে।

কিন্তু মেয়েটি ফিসফিস করল, মাকে বোঝানো দায় হবে। আমার লোভ মায়ের খুব বেশি। নিজেই চুপ করে রইল, আরো একটা উপায় আছে।

আমার অজ্ঞাতসারেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি?

পালিয়ে যাওয়া।

কোথায়?

এল্‌-হাসেমির সঙ্গে তার দেশে।

এল্‌-হাসেমি! তোমার কেউ হয় নাকি?

না-না। মেয়েটি হেসে উঠল, ওতো মুসলমান। তানজিযার থেকে নুন নিয়ে ওয়েসিসে-ওয়েসিসে চালান দেয়। অনেক পয়সা। আমার কাছে আসে। ওই একদিন আমাকে বলেছিল, চল। আমার সঙ্গে, তোকে সাদি করবো—

আমি বললাম, ভালো তো, যাও না—

ও বললে, আমাকে যে ইসলাম নিতে হবে। আমি বললাম, তোমার ধর্ম তোমার থাক। আমারটাও থাকতে দাও—। রহিম রাজি হয়নি। মাথা নাড়ল মেয়েটা, আমিও আমার ছাড়তে রাজি হইনি।

তোমরা দু'জন তো দু'জনকে ভালোবাসো?

তা বাসি!

তবে?

ও যদি ওর ধর্ম না-ছাড়তে পারে আমি ছাড়বো কি করে!

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাত এগারোটা। আমার গাইড বোধহয় ঘুমুচ্ছে। ওকে জাগিয়ে রওনা হওয়া এক ঝামেলা।

উঠে পড়লাম।

উঠলে নাকি?

উঠবো না! অনেক সময় তোমার নষ্ট করলাম। পকেট থেকে আরো একশ ফ্রাঙ্ক মেয়েটির হাতে দিলাম। হাত পেতে নিল। একটুও ইতস্তত করল না। শুধু আমার দিকে একবার তাকাল।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছি মেয়েটি পিছন থেকে ডাকল, একটু দাঁড়াও। তোমাকে এগিয়ে দি।

আমি পথে বার হয়ে আমার গাইডের খোঁজ পেলাম না। কোথাও পড়ে ঘুমচ্ছে। পাশে সেই মেয়েটি। অষ্টাদশ শতকের ইয়োরোপীয় মেয়েদের মতো পা-ঢাকা গাউন পরেছে

সেই রুক্ষ বন্ধ্যা অনুর্বর এলাকার বাড়ি ঘরের উপর হাওয়ায় জ্যোৎস্না চলাফেরা করছে।

আমরা দু'জনেও পাশাপাশি হাঁটছি। মরুভূমি থেকে এতক্ষণে ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। যতোদূর চোখ যায় বালির উপর জ্যোৎস্না পড়ে সজীব এক প্রবাহ ছলছল করে বেজে উঠল। কানে শুনতে পাচ্ছি না। চোখে তো দেখছি।

একলা কি যেতে পারবে?

তা পারবো।

সামনে কহেনার দুর্গের যে ভগ্নাবশেষ, পথটা তো ওরি উপর দিয়ে গেছে—চিনতে পারবে তো?

আমি মেয়েটির দিকে অসহায় ভাবে তাকালাম।

চলো আমি তো এগিয়ে দিয়ে আসছি।

তানজিয়ারের লোকালয় ছেড়ে প্রান্তরের মধ্যে চলে এসেছি। কেউই কথা বলছি না।

দূরে সেই দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখা গেল। ওরি মধ্যে মন্দিরের কিছুটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে। ছাদ নেই। বড়ো স্তম্ভগুলো নিঃসঙ্গ প্রার্থনার আঙুলের মতো; জোৎস্না পড়ে এক আশ্চর্য ব্যঞ্জনা খেলছে।

দু'জনে সেই দুর্গের বিধ্বস্ত অংশের উপর এসে দাঁড়ালাম। এবার আমার পথ নেমে গেছে পশ্চিমের দিকে। মেয়েটিকে এবার যেতে

হবে পূবে ওর মহল্লায়।

জ্যোৎস্নার [illegible]লোয় দুর্গ [illegible] দাঁড়িয়ে কি সব অদ্ভুত ভাব মনে আসছিল। [illegible] দিকে মরুভূমির পরিব্যাপ্ত নির্জনতা। জ্যোৎস্নায় ধূ-ধূ করছে। [illegible]দায় [illegible] কবল, মাঝে [illegible] এসেছে। অথচ কী যে [illegible] লাগছিল [illegible] খুব বেশি [illegible] নিজেই।

[illegible] আমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না। আমি মৃদুস্বরে বললাম।

মেয়েটি বললে, জানি।

বাতাস এসে ওর চুল উড়িয়ে দিচ্ছে। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছি সব পাপ জ্যোৎস্নায় যেন ধুয়ে গেছে। [illegible] যেন পৃথিবীর চিরকালের [illegible] প্রতীক। ওর মুখে সেই একই ভালোবাসার ছবি।

যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছি। মনে হল ওর নামটা তো জিজ্ঞাসা করা হয়নি। ডাকি ওকে। নামটা জানা থাক। সেইটুকু হবে স্মৃতি। ও ততক্ষণে অনেকখানি নেমে গেছে পাথরের গা ঘেঁসে। আমার ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল, কি বলছ?

তোমার নাম?

বাতাসে ভেসে এল, কহেনা—

আমি চেয়ে আছি মেয়েটির দিকে। অনেক দূরে ওর ছায়া মূর্তিটা চলে যাচ্ছে আবার।

কহেনা। নামটা নিঃশব্দে উচ্চারণ করলাম, মরুভূমির বাণী—সাহারার বাণী।

কহেনার গড়ের উপর দাঁড়িয়ে আর এক কহেনার দিকে তাকালাম।

প্রায় দেড়হাজার বছর আগে এক নারী মরুভূমির অজ্ঞাত জনপদ থেকে ইতিহাসে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। আর কতোকাল পরে আরেক কহেনার সঙ্গে পরিচয় হল, যন্ত্রণায় অপমানে ক্ষরিত তার সত্তা।

সেই জ্যোৎস্না রাতে ঈষন্নীল আকাশে যেখানে রুপোলি তারার শস্য ছড়ানো—কহেনা যেন তার উপর দিয়ে দিগন্তের দিকে হেঁটে

যাচ্ছে। সেই পাহাড় প্রান্তরে নির্জনে সে ফিরে তাকালো না।
সেও যেন ইতিহাসের কেউ! আমাদের পাপের ইতিহাসের।
আলতিমিরার গুহা ... যূথবদ্ধ ... কালের
সোনালি পথ ধরে।
সুমেরিয় ব্যাবিলন ... ধূসর সুন্দর সভ্যতার শিল্প।
তারপর সেই শিশু একদিন পরিণত হল।

নিরাকার অন্ধকার একটি নিবিড় হাতে সেই সব সভ্যতার হৃদয়
হাতড়ে কয়েকটি অলৌকিক গানের সমন্বয় আমাদের কৌতূহলকে দিল
উপহার।

কালের পথ থেকে ইতিহাসের পাতায় ফিরে গেল তাদের ফেনাক্ত
অশ্বের দল। পদাতিক। চতুরঙ্গ মেঘবজ্র উৎকীর্ণ পতাকা।

ক্রমশ তার মৃত্যুর নিঃশ্বাস শোনা গেল ক্ষুধার্ত নেকড়ের ধূসর
অবলুপ্তির রোমশ আচ্ছাদনের নীচে।

কিন্তু সভ্যতার মৃত্যুর সঙ্গে পাপের মৃত্যু হয় না। কাল থেকে
কালে নির্বিবল স্রোতের বেগে মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।
পাপের উত্তরাধিকার কি আমাদের সত্তায় চিত্রিত। একদিকে
সক্রেটিসের জ্ঞানে শঙ্করের প্রজ্ঞায় হেগেলের দ্বন্দ্ববাদে মানুষের আত্মার
উজ্জ্বল পরিচয়।

অন্যদিকে একই আত্মার মুখে দেখছি ভয়ঙ্কর পাপের বিচিত্রণ।
ধূসর বালিকাটা তোবড়ানো মুখের খাঁজে পিঙ্গল চোখের কুহকে কুৎসিত
কামনা রাক্ষসের নারীমাংসলুব্ধ ক্লেদাক্ত কলঙ্ক।

হে হৃদয়, আর কতোকাল এই পাপকে বয়ে বেড়াই! মানবীর
অপমান আমাদের আত্মায় মুঠো মুঠো অন্ধকার ছড়িয়ে দিচ্ছে।

তবু আমি বিশ্বাস করি, একদিন পাপের তোরণ পার হয়ে চেতনার
নতুন ঐশ্বর্যের রূপাবলী চৈতন্যের দ্বারে গিয়ে পৌঁছবে। সেই হবে
আমাদের মৃত্যু থেকে অমৃতে উত্তরণ!